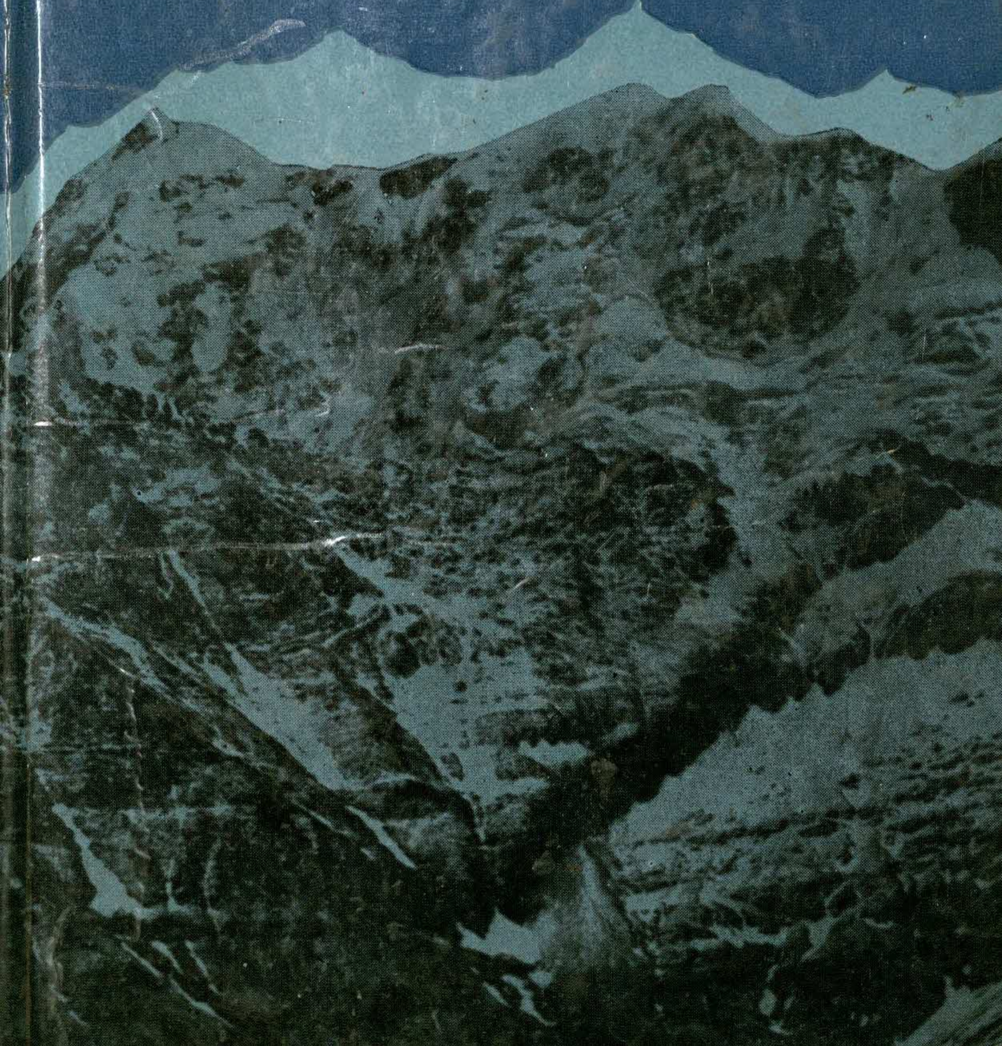
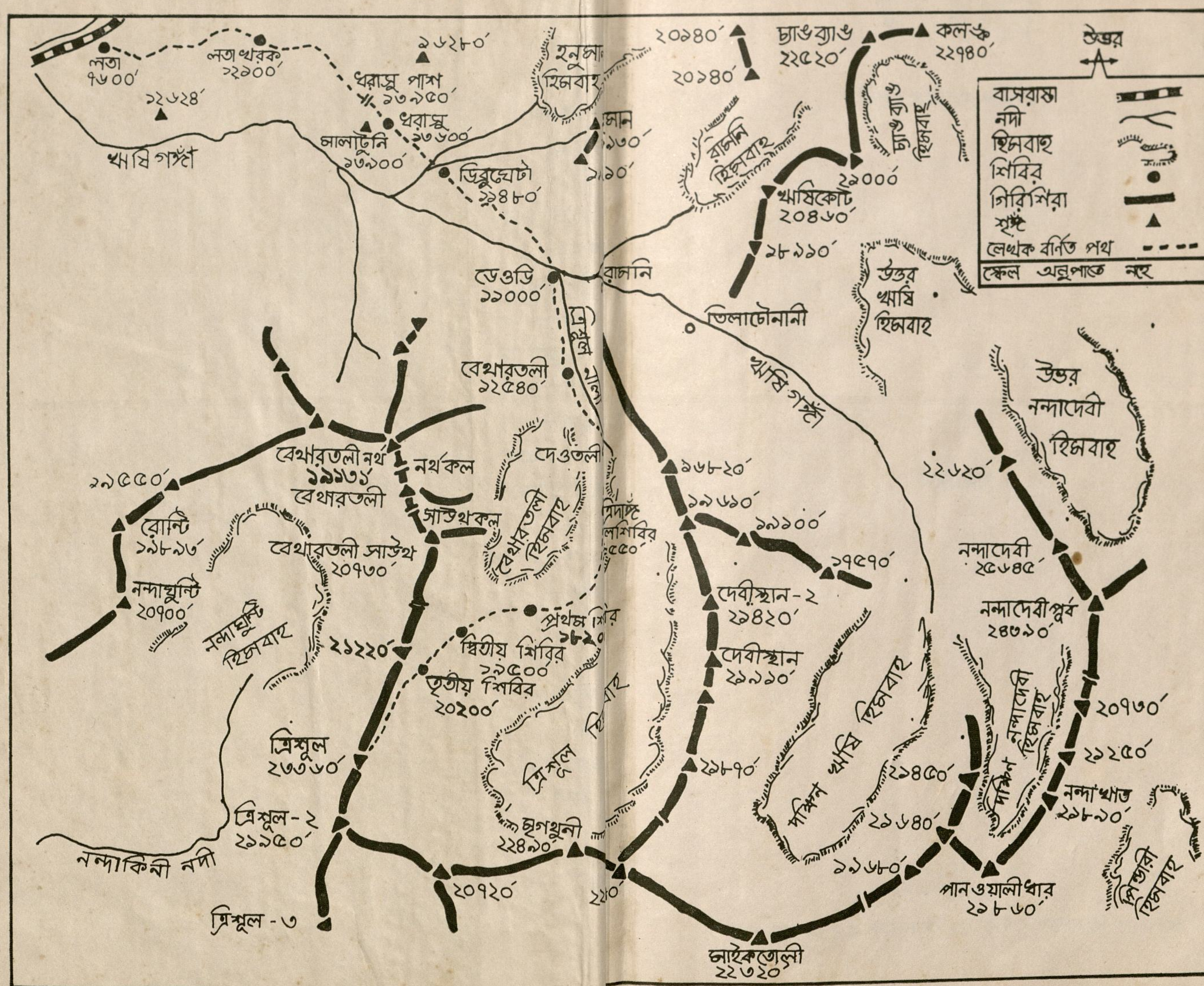
স্বপ্ন শিখরে

বিজয় দত্ত




উত্তর
বাসরাস্তা
নদী
হিমবাহ
শিবির
গিরিশিরা
শৃঙ্গ
লেখক বর্ণিত পথ
স্কেল অনুপাতে নহে
লতা ৭৬০০´
লতাখরক ১২৯০০´
১৬২৮০´
ধরাসু পাশ ১৩৯৫০´
ধরাসু ১৩৬০০´
মালাটুনি ১৩৯০০´
ঋষি গঙ্গা
ডিব্রুঘেটা ১২৪৮০´
হনুমান হিমবাহ
রামনি হিমবাহ
চ্যাঙব্যাঙ ২২৫২০´
কলঙ্ক ২২৭৫০´
চ্যাঙব্যাঙ হিমবাহ
ঋষিকোট ২০৪৬০´
উত্তর ঋষি হিমবাহ
তিলাচৌনানী
উত্তর নন্দাদেবী হিমবাহ
নন্দাদেবী ২৫৬৪৫´
নন্দাদেবী পূর্ব ২৪৩৯০´
দক্ষিণ নন্দাদেবী হিমবাহ
নন্দাখাত
পানওয়ালীধার
মাইকতোলী ২২৩২০´
দক্ষিণ ঋষি হিমবাহ
দেবীস্থান-২ ২১৪২০´
দেবীস্থান ২১৯১০´
বেথারতলী ১২৫৪০´
বেথারতলী নর্থ
বেথারতলী
নর্থকল
সাউথকল
বেথারতলী সাউথ ২০৭৩০´
দেওতলী
রোন্টি ১৯৮৯৩´
নন্দাঘুন্টি ২০৭০০´
নন্দাঘুন্টি হিমবাহ
প্রথম শিবির
দ্বিতীয় শিবির ১৯৫০০´
তৃতীয় শিবির ২০২০০´
ত্রিশূল ২৩৩৬০´
ত্রিশূল হিমবাহ
ত্রিশূল-২
ত্রিশূল -৩
মৃগথুনী ২২৪৯০´
নন্দাকিনী নদী

স্বপ্নশিখরে

[ত্রিশূল অভিযান কাহিনী]

বিজয় দত্ত

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৯২
মার্চ ১৯৮৬

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়
মানচিত্র
দিলীপ বিশ্বাস
হিমাংশু বোস

প্রচ্ছদচিত্র—ত্রিশূল
আলোকচিত্র
সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় ও
শম্ভুনাথ দাসের সৌজন্যে
অন্যান্য আলোকচিত্র
'হিয়া'র ত্রিশূল অভিযান থেকে সংগ্রহিত

মুদ্রক
আর. রায়
সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৫১ ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

কুড়ি টাকা

ত্রিশূল অভিযানের আয়োজক সংস্থা চিত্তরঞ্জনের
'হিয়া'কে (Himalayan Enjoyers' Association)
'স্বপ্নশিখরে' উৎসর্গ করলাম

বিজয় দত্ত

॥ কয়েকটি কথা ॥

এ আমার ভূমিকা নয়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

১৯৭৪ সনে চিত্তরঞ্জনের পর্বতারোহণ সংস্থা 'হিয়া' (Himalayan Enjoyers' Association) আয়োজন করেন ত্রিশূল অভিযানের। সৌভাগ্য-বশত আমি সেই সাফল্যমণ্ডিত অভিযানের নেতা নির্বাচিত হয়েছিলাম।

নন্দাদেবী-ত্রিশূল এলাকা পর্বতারোহীদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হলেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে এর আগে কোন অভিযান ঐ অঞ্চলে হয় নি। স্বভাবতই নন্দাদেবী-ত্রিশূল এলাকার ওপর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কোন পূর্ণাঙ্গ লেখা নেই।

ত্রিশূল অভিযানের কথা লিখতে বসে এ তথ্য নিশ্চয়ই প্রেরণা যুগিয়েছে তবু এ কাহিনীর জন্ম এক ব্যক্তিগত আবেগ থেকে। মনে হয়েছে—আমার অভিজ্ঞতা সকলের হোক, চেয়েছি সবাইকে অভিযানে সামিল করতে, স্বপ্ন-শিখরে পৌঁছে দিতে। স্বার্থকতার বিচার আপনাদের, চাওয়াতে কোন খাদ নেই—এই আমার সান্ত্বনা।

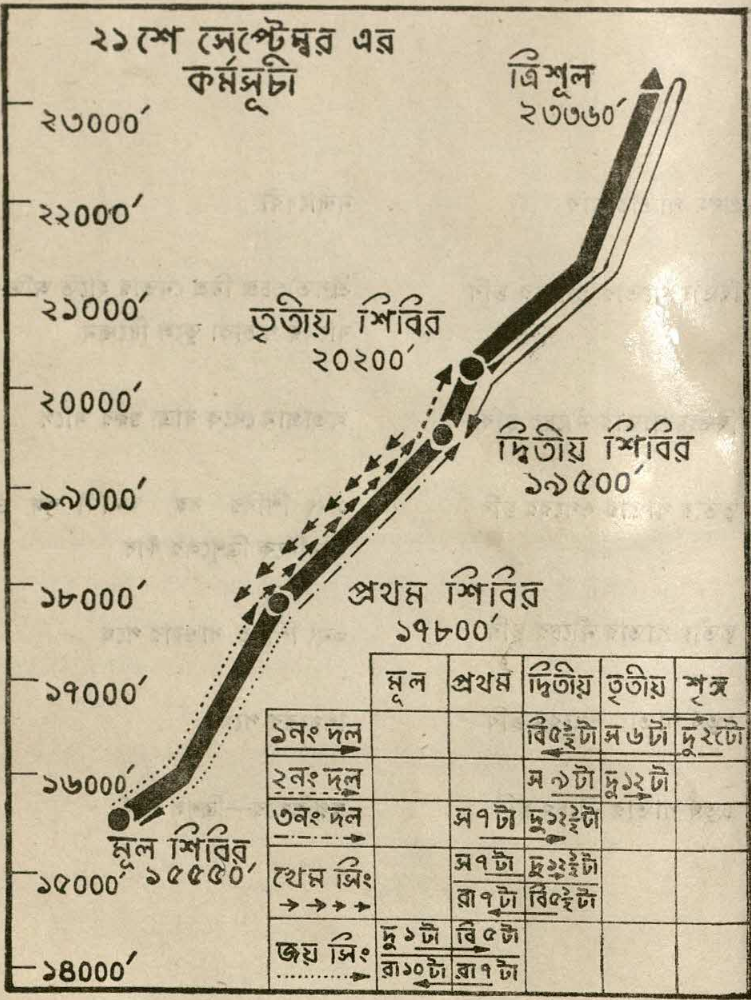
হিমালয়বিশেষজ্ঞ শম্ভুনাথ দাস, আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় শম্ভুদার কাছে ঋণের শেষ নেই। স্বপ্নশিখরে বর্ণিত অতীত ইতিহাসের সবটুকুই তাঁর লেখা। আমি তাঁরই জবানীতে প্রকাশ করেছি মাত্র।

বন্ধুপ্রতিম অনুজ অজয়কুমার দাসের প্রচেষ্টা ছাড়া স্বপ্নশিখরে প্রকাশিত হত না, হত না প্রকাশক সমীরকুমার নাথের সহযোগিতা ছাড়াও। সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

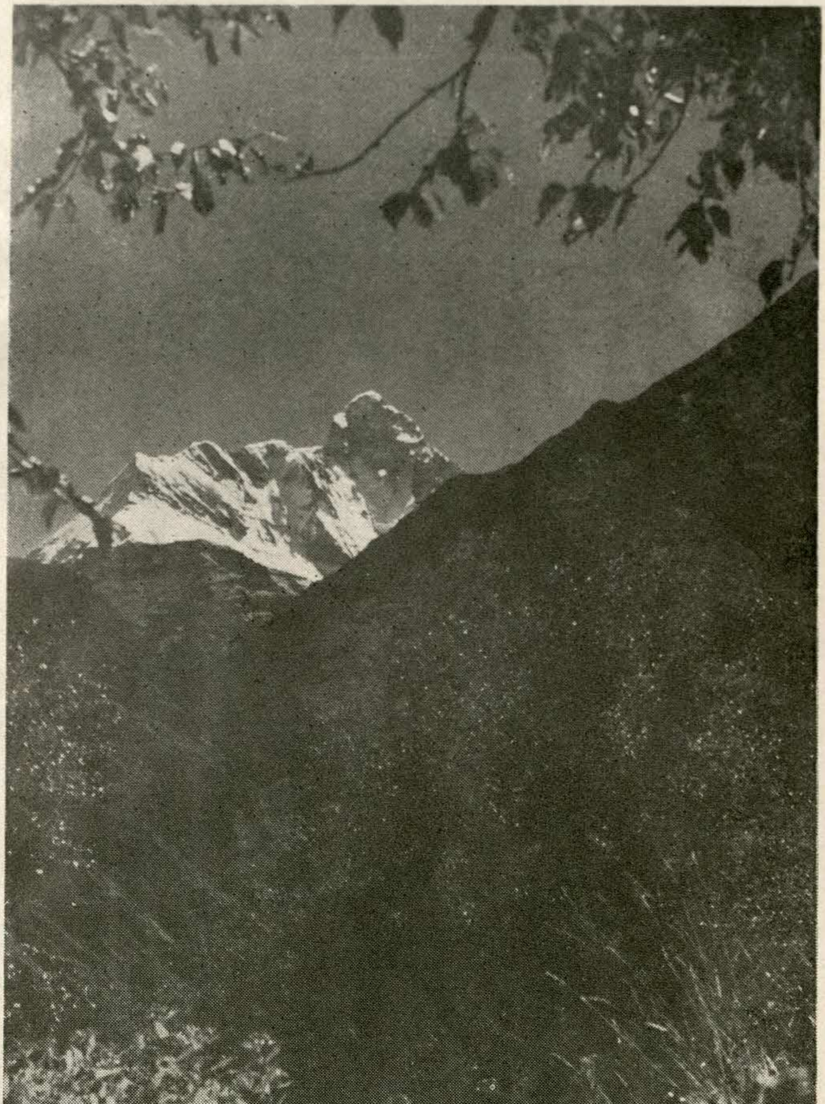
২১শে ফেব্রুয়ারী ৮৬ **বিজয় দত্ত**

চিত্তরঞ্জন

প্রথম পাতার ছবি	নন্দাদেবী
দ্বিতীয় পাতার ওপরের ছবি	শ্রীসতীশচন্দ্র মিশ্র নেতার হাতে অভিযানের পতাকা তুলে দিচ্ছেন
দ্বিতীয় পাতার নীচের ছবি	লতাগ্রাম থেকে যাত্রা শুরুর আগে
তৃতীয় পাতার ওপরের ছবি	১নং শিবির সহ অনামী শৃঙ্গ ও ডানদিকে ত্রিশূলের কাঁধ
তৃতীয় পাতার নীচের ছবি	৩নং শিবির যাওয়ার পথে
চতুর্থ পাতার ওপরের ছবি	শিখরের পথে
চতুর্থ পাতার নীচের ছবি	স্বপ্নশিখরে—ত্রিশূল শীর্ষে



	মূল	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	শৃঙ্গ
১নং দল			বি ৫½টা	স ৬টা	দু ২টো
২নং দল			স ৯টা	দু ১২টা	
৩নং দল		স ৭টা	দু ১২½টা		
থেম সিং		স ৭টা / রা ৭টা	দু ১২½টা / বি ৫½টা		
জয় সিং	দু ১টা / রা ১০টা	বি ৫টা / রা ৭টা			

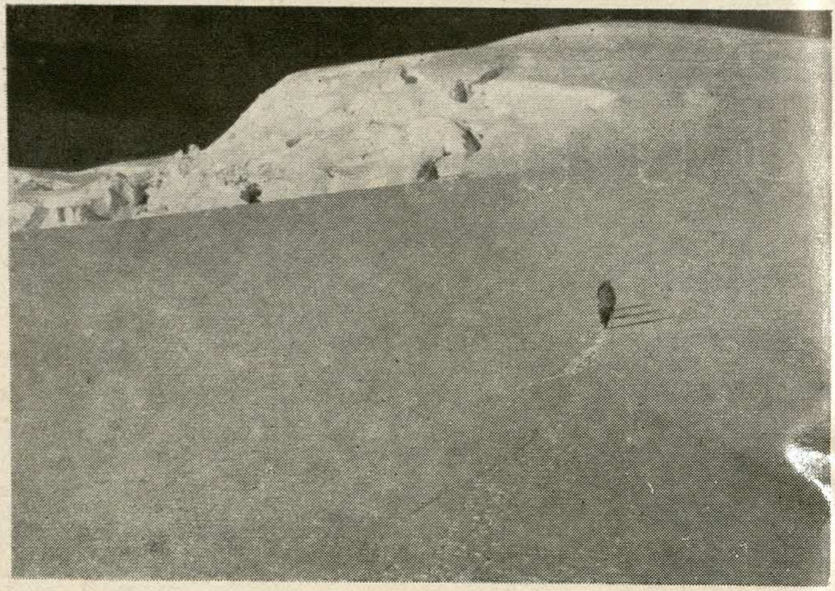



HEA











এক

তখন ভোর ছটা।

বোধহয় শেষ রাতের দিকে একটু চোখ লেগে এসেছিল। আসলে সারারাত অসহ্য ঠাণ্ডার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে কখন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। অত্যন্ত নিম্নমানের স্লিপিং ব্যাগ ও এয়ার ম্যাট্রেস দিয়ে আর যাই হোক পর্বতারোহণ হয় না ; ১৮০০০ ফুট ওপরে মাইনাস ১০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে রাত কাটানো চলে না।

তবু এই আমাদের কপালে জোটে, এই সরঞ্জাম সম্বল করেই আমরা পাহাড়ে আসি বারবার। কেন আসি, না এলে কি হয় তা বোধ হয় নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়।

সদ্য ঘুমভাঙা ঘোর লাগা চোখে এইসব সাতপাঁচই বোধহয় ভাবছিলাম। এরই মধ্যে হঠাৎ মনে পড়ল আজ ২১শে সেপ্টেম্বর।

২১শে সেপ্টেম্বর! মনে পড়তে না পড়তেই বিপুল এক উৎসাহের জোয়ার আমার ক্লান্ত শরীরটাকে চাঙ্গা করে তুলল। মুহূর্তের মধ্যে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলাম।

ঐ দূরে উঁচুতে তিন নম্বর শিবির। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। পুরোপুরি বরফে ঢাকা পাহাড়ের সাদা গায়ে যেন কটি কালো বিন্দু। কাল বিকেলেই লক্ষ্য করেছি, আমাদের প্রথম শীর্ষ-অভিযানকারী দল ২০৫০০ ফুট উঁচুতে ঐ চূড়ান্ত শিবির স্থাপন করে। তারপর থেকেই, অসীম আগ্রহে, অন্ততঃ যতক্ষণ দৃষ্টি চলে তাকিয়ে আছি শেষ শিবিরের দিকে।

ছটা দশ। হঠাৎ চোখে পড়ল তিন নম্বর শিবিরের কিছু ওপরে কয়েকটি কালো বিন্দু। কালো বিন্দু? তার মানে! খুব ভালো করে লক্ষ্য করার পর বোঝা গেল বিন্দুগুলো নড়ছে, যেন একটু একটু করে এগুচ্ছে সামনের দিকে। তিনটি বিন্দু প্রায় কাছাকাছি। পরের তিনটি

একটু পেছনে। তার মানে ঐ তো আমাদের শীর্ষ-অভিযানকারী দল বেরিয়ে পড়েছে। আনন্দে, উত্তেজনায় আমি চিৎকার করে উঠলাম, সুশান্ত, বেরিয়ে এস, ঐ ওরা যাচ্ছে।

এক মুহূর্ত পরে, সুশান্ত আর আমি পাশাপাশি একটা বড় পাথরের ওপর বসে ওদের লক্ষ্য করতে লাগলাম।

আবহাওয়া এই মুহূর্তে ভাল। সামনে সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তৃতীয় শিবিরের ঠিক ওপরেই এক অনামী শৃঙ্গ যার একটু বাঁ দিক ঘেঁযেই আমাদের পথ। সেই পথ ধরে চূড়ান্ত লক্ষ্য সাধনে এগিয়ে চলেছে আমাদের বীর সঙ্গীরা।

তাহলে আর দেরী কেন, আমরাও বেরিয়ে পড়ি।

চটপট প্রস্তুত হয়ে নিলাম। প্রস্তুত আর কি—সর্বাঙ্গ তো ঢাকাই ছিল; শুধু জুতো জোড়া পায়ে গলানো আর উইণ্ডপ্রুফ জ্যাকেটটি গায়ে চড়ানো।

এদিকে খেম সিং-এর ডাক, পাশের তাঁবু থেকে। ওটা কিচেন টেণ্ট, মানে যাকে বলে রান্নাঘর। চমৎকার পরোটা করেছে খেম, সঙ্গে টিনের মাংস। আর কি চাই? এদিকে বাইরে তখন অল্প রোদ্দুরও উঠেছে। অতএব দুগ্‌গা বলে বেরিয়ে পড়া গেল।

এক নম্বর শিবিরের গা থেকেই চিরতুষারের দেশ শুরু। প্রথমেই একটা, একধারে ঝুঁকে যাওয়া মাঠের মতো, বরফে ঢাকা, পার হতে প্রায় আধঘন্টা লাগল। তারপরই সোজা দেওয়ালের মতো উঠে গেছে প্রায় ১০০০ ফুট। তবে বরফের অবস্থা বেশ ভাল। ভেজা বালির মতো। পা ঢুকছে তবে অল্প, ফলে খুব একটা অসুবিধে কিছু নেই।

সারিবদ্ধভাবে চলেছি তিনজন। খেম সিং আগে, মাঝে সুশান্ত। প্রথম জনের পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে চলেছি পেছনের আমরা। গত রাতের তুষারপাতের ফলে আগের দলের চলার চিহ্ন ঢাকা পড়ে গেছে। পথনির্দেশক পতাকাগুলোও চোখে পড়ছে না। নতুন করে রাস্তা করতে হচ্ছে আমাদের।

প্রায় দেড় ঘণ্টা চলার পর ওপরে উঠে এলাম। সামনেই ত্রিশূলের গা থেকে সোজা নেমে আসা হিমবাহ। এটাকে ত্রিশূলের আপার গ্লেসিয়ার বা উচ্চ হিমবাহ বলা যায়। বাঁ দিক থেকে মৃগথুনির বিশাল শরীর থেকেও নেমে এসেছে বরফের স্রোত। এই দুই বরফের স্রোত মিলে আমাদের ১নং শিবিরের কিছু নিচে ডানদিকে ঘুরে ত্রিশূল হিমবাহের মূল চেহারা নিয়েছে।

হিমবাহের ঠিক মাঝখান দিয়ে যেতে হচ্ছে। অসম্ভব ফাটা আর উঁচু-নীচু বরফের বিচিত্র চেহারা নিয়ে এই হিমবাহ। আসলে হিমবাহের এই অংশটিকে বলা হয় ত্রিশূলের আপার আইস ফল (upper ice fall)। ঠিক একটা ধ্বংসস্তূপের মতো। প্রচণ্ড পরিশ্রম হয় এর ভেতর দিয়ে এগুতে। এই দশ ফুট নেমে যেতে হচ্ছে, পরক্ষণেই পুরো উল্টো-দিকে দশ ফুট উঠে যেতে হচ্ছে। অসংখ্য ফাটল। ২নং শিবির এখান থেকে দেখা যায় না। কিন্তু ৩নং শিবিরকে সব সময়ই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কিছুটা কাছে এসে যাওয়ার ফলে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ৩নং শিবিরের দুটো তাঁবুকে।

কিন্তু এ যে এক গোলকধাঁধায় পড়লাম। অনেকক্ষণ থেকেই মনে হচ্ছে একই জায়গায় ঘুরছি। এত সময় তো লাগার কথা নয়। ঐ তো ২নং শিবিরের দল ৩নং শিবিরের দিকে চলেছে দেখা যাচ্ছে। ঠিক যেন সাদা দেওয়ালের গায়ে কটি কালো পিঁপড়ে। প্রায় পৌঁছেও গেল ৩নং-এর কাছে। সাড়ে ১১টা বাজে। মাঝে মাঝেই বরফ ফাটছে। কুলকুল করে বরফের তলা দিয়ে জল যাওয়ার আওয়াজ পাচ্ছি। যে কোন মুহূর্তে যে কোন জায়গায় ফাটল ধরে যেতে পারে। একান্তই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। ক্রমাগত মানসিক উদ্বেগ আরও ক্লান্ত করছে আমাদের। কিন্তু কোথাও বসে বা দাঁড়িয়ে যে একটু বিশ্রাম নেব তার উপায় নেই, কারণ একে তো ঐ বরফে বসা মুশকিল, তার ওপর একটু বসলে বা দাঁড়ালেই মনে হচ্ছে ধ্বসে যাবে। দেখতে দেখতে চারদিক থেকে মেঘ উঠে এসেছে। মেঘের একটা ঘন পর্দায় মনে হচ্ছে সারা আকাশটা

ঢাকা। বারোটা বাজতে না বাজতে এখানেই আবহাওয়ার এই অবস্থা, না জানি ওপরের ছেলেদের কি লড়াই করতে হচ্ছে!

ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠলাম। না, আর তো পারা যায় না। মনে হচ্ছে খেম সিং রাস্তাই চেনে না। সহ্যশক্তির একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে বলেই ফেললাম খেমকে, চল ফিরি। কাঁহাতক আর অন্ধের মতো ঘোরা যায়। খেম বোধ হয় আমার না বলা কথাও বুঝল। কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, সাব, তুমলোগ ইঁহা ঠ্যারো, মুঝে জেরা আগে জানে দো। ব্যস্, দশ মিনিট, অগর রাস্তা নেহি মিলা তো আপস জায়েঙ্গে। সাব, সিরফ দশ মিনিট।

বড় ভালো এই খেম সিং ছেলেটি। বয়স বোধহয় কুড়িরও কম। সুন্দর স্বাস্থ্য। আরও চমৎকার ওর কথাবার্তা, কাজকর্ম। এবারের অভিযানের বিরাট কুলী-বাহিনীর মধ্যে খেমই আমাদের সবচেয়ে ভাল ফল দিয়ে আসছে। তার ওপর আমাদের অনেক ভরসা। কিন্তু আজ আর সে ভরসা রাখতে পারছি কই!

ঠিক ছ মিনিট পার হয়েছে। আমরা তখনও দাঁতে দাঁত চেপে দশ ফিটের একটি সমতল বরফের স্তরের উপর পায়চারি করছি। হঠাৎ শুনি খেমের চিৎকার। তাকিয়ে দেখি মাত্র কয়েক ফুট দূরে বেশ উঁচু একটা বরফের চাঁইয়ের ওপর দু হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে খেম। একগাল হেসে চেঁচাল, সাব, মিল গিয়া, রাস্তা মিল গিয়া। টেণ্ট দিখাই যা রহা হায় সাব, একদম পাশমে।

কিন্তু আর একটু দমও আমাদের আছে কি? না, তা বললে কি চলে! টেণ্ট যে দিখাই যাতা। তবে আর কি, শুনকে আমার চিত্ত তো একেবারে বিগলিত হুয়া। চল্ বাবা, টেণ্ট যব্ দিখাই যাতা তব্ হামভি যাতা।

২নং শিবির।

বেলা ১২টা বেজে ২৫ মিনিট।

আঃ কি আরাম! পৌঁছে গেছি ২নং শিবিরে। এক পলক সামনের

দিকে তাকিয়ে দেখি—না, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। না ৩নং শিবির, না সেই চলমান কালো বিন্দুগুলিকে। আর ৩নং শিবিরের ওপরে আমাদের লক্ষ্যপথ? তার তো প্রশ্নই ওঠে না।

রুকস্যাক্ মুক্ত হয়ে আস্তে আস্তে তাকালাম চারদিকে। বেশ অবস্থানটি শিবিরের। উচ্চতা ১৯,৫০০ ফুট। এ অঞ্চলটিকে ত্রিশূলের আপার আইস ফলের শেষাংশ বলা যায়। এখানেও ফাটল আছে, তবে অত বেশী নয়। সামনে কিছুদূর এই আইস ফল একটা এবড়ো-খেবড়ো মাঠের মতো রয়েছে, তারপরই সোজা শ্বেতশুভ্র দেওয়াল উঠে গেছে ৩নং শিবিরের দিকে। আমাদের তাঁবুর একটু দূরেই দেখতে পেলাম, আগের কোন অভিযানের পরিত্যক্ত কিছু জিনিস পড়ে আছে। ভাল করে দেখতে কটি পথনির্দেশক পতাকা পাওয়া গেল। কিন্তু এতই বিবর্ণ হয়ে গেছে যে ওতে কিছু লেখা ছিল কিনা বোঝা গেল না। পেছন ফিরে তাকালাম—নন্দাদেবী অঞ্চলের বেশ ভাল একটা ধারণা পাওয়া যায় এখান থেকে। ২নং শিবিরের ঠিক পশ্চিমে সেই অনামী শৃঙ্গ, যার অনেকটাই এখন দেখা যাচ্ছে না। উত্তরে বেতারতলী শৃঙ্গের একটি অংশ, উত্তর-পূর্বে দূরে ঋষিকোট (২০,৪৬০´), হুনাগিরি (২৩, ১৮৪´), চাঙবাঙ (২২,৫২০´), কলঙ্ক (২২,৭৪০´) ও আরও অনেক শৃঙ্গ দৃশ্যমান। দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে দেবীস্থান ১নং (২১,৪২০´) ও দেবীস্থান ২নং (২১,৯১০´) আর তাদের পেছন থেকে নন্দাদেবী তার সুতীক্ষ্ণ শিখর দিয়ে যেন আকাশকে বিদ্ধ করে রেখেছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে মৃগথুনি আর তার পাশে আছে ত্রিশূল, আপাততঃ সে মেঘের কালো পর্দায় ঢাকা।

বেলা ১টা।

ক্রমেই হাওয়ার গতি বাড়তে লাগল, বাড়তে লাগল ঠাণ্ডার দাপট। বাইরে আর বসা গেল না। এখানে ২টি সাদা আর্কটিক তাঁবু ফেলা হয়েছে। তারই একটাতে সুশান্ত আর আমি ঢুকে পড়লাম। খেম সিং ঢুকল আরেকটাতে। তাঁবুর মধ্যে ঢুকেই পেলাম একটা চিঠি। প্রবীরের

লেখা। এক জায়গায় লিখছে, আরও রেশন ছাড়া কেউ যেন ২নং শিবিরে না আসে। আরে! আমরা তো ইতিমধ্যেই এসে গেছি ২ নম্বরে। ২ নম্বরে আসতে বারণ করে চিঠি লিখে রেখে দিয়েছে, কিন্তু ২ নম্বরে না এলে তো জানাই যাবে না যে ২ নম্বরে আসা বারণ। আচ্ছা ছেলে যা হোক!

কিন্তু চিঠিটা ১ নম্বরে রাখতে ভুলেই যাক আর যাই করুক, রেশন সম্বন্ধে প্রবীরের যে কোন মন্তব্য যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমি আর সুশান্ত খাতাপত্তর নিয়ে স্টক মেলাতে বসে গেলাম। অনেক হিসাব করার পর দেখা গেল আমরা এই উচ্চতায় আর বড়জোর দুদিন কাটাতে পারব; এবং যে ভাবেই হোক সমগ্র দলকে ২৪শের মধ্যে মূল শিবিরে ফিরতেই হবে।

এরই মধ্যে খেম সিং পাশের তাঁবু থেকে জানাল, সাব, খানা তৈয়ার।

খানা তৈয়ার! বলে কি ছোকরা! এই উচ্চতায় মাত্র ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে বলে কিনা খানা তৈয়ার! কি বাবা খেম, ভানুমতীকা খেল দেখাতা হ্যায়? নেহি সাব,—সদা হাস্যময় খেম জানাল, আগের দল প্রেসার কুকারে অনেক খিচুড়ী ফেলে গেছে তবে তা বিনা নুনের, আধ-সেদ্ধ এবং অখাদ্য। তাকেই ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় খেম গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। অতএব আর দ্বিধা কিসের?

ব্যাস্, আর কোন কাজ নেই।

২টো বাজে।

আমি ডাইরী লিখলাম, গান গাইলাম, চূড়ান্ত জয়ের পর কি রকম কি রকম সব আনন্দ হবে সব ভেবে শেষ করে ফেললাম, কিন্তু ওপরের দলের কোন চিহ্নই দেখতে পাওয়া গেল না।

বেলা ৩টে।

অদ্ভুত একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে সময় কাটতে লাগল। ত্রিশূলের শিখর এখান থেকে দেখা যায় না, বেশ কিছুটা নিচের একটা

ডোম, যাকে আমরা ফল্‌স পিক্‌ (false peak) নাম দিয়েছি তা মূল শিখরটিকে আড়াল করে রেখেছে। এখন অবশ্য ঐ ফল্‌স পিকও দেখা যাচ্ছে না। ঘন মেঘে ঢেকে আছে সব। ৩নং শিবিরটা দেখা যাচ্ছে, আর দেখা যাচ্ছে ৩নং শিবিরের হাজারখানেক ফুট ওপর পর্যন্ত। ফল্‌স পিকের গিরিশিরাটি যেখানে বাঁদিকের অনামী শৃঙ্গের গিরিশিরার সঙ্গে মিলে একটা কল্‌ (call) মতো সৃষ্টি করেছে সে জায়গাটা এক-একবার দেখা যাচ্ছে, আবার পরক্ষণেই মেঘে ঢেকে যাচ্ছে। আমরা জানি ঐ পথেই গেছে আমাদের শীর্ষ-অভিযানকারী সঙ্গীরা। ঐ পথেই তাদের নেমে আসারও কথা। আমরা ৩জন অসহ্য ঠাণ্ডায় তীক্ষ্ণ হাওয়াকে উপেক্ষা করে তাঁবুর বাইরে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি সেই পথের দিকে।

৩টে বেজে ৩০ মিনিট।

আর তো পারি না। একটা উদ্বেগ, একটা আশংকা ক্রমশ চেপে ধরছে আমাদের। নিজের হৃদস্পন্দন নিজেই শুনতে পাচ্ছি। এখনও কারো দেখা নেই। প্রতি মুহূর্তে শিরায় শিরায় রক্তের গতিবেগ বাড়ছে বুঝতে পারছি। কিন্তু এত দেরী হচ্ছে কেন? এত দেরী হওয়ার তো কথা নয়! কোন বিপদ হল না তো?

কথাটা নিজের মনে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ যেন বয়ে গেল শরীরে। সারা মন-প্রাণ দিয়ে যে কথাটাকে ভুলতে চাইছি, যে সম্ভাবনাকে এড়াতে চাইছি, যার দিক থেকে চোখ বুজে থাকতে চাইছি, অমোঘ নিয়তির মতো ক্রমেই থাবা বাড়াচ্ছে সে, ঐ কালো আকাশটার মতো সমগ্র চেতনাকে ঢেকে ফেলতে চাইছে। কত অসহায় আমরা! কিছুই করার নেই। শুধু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অথর্বের মতো নিজের ভেতরে নিজের কবর খুঁড়ে চলা।

৩টে বেজে ৪৫ মিনিট।

নাঃ, আর পারছি না। আর এভাবে বসে থাকা যাচ্ছে না। কিছুই ভালো লাগছে না। নিজের ওপরেই একটা বিরক্তি ধরে যাচ্ছে। গত

প্রায় ছ ঘণ্টা পাশাপাশি বসে থেকেও আমরা নিজেদের মধ্যে কোন কথা বলতে পারিনি। শুধু মাঝে মাঝে বোবা চাউনিতে তাকিয়েছি পরস্পরের দিকে। কি হতে পারে ওদের? কি হতে পারে তা আমি জানি। কিন্তু না, আমি ভাবব না সে অমঙ্গলের কথা, জোর করে আমি নিজেকে ব্যস্ত রাখব ওদের মঙ্গলকামনায়। কিন্তু এত সময় লাগছে কেন? সেই কোন্ ভোরে বেরিয়েছে ওরা, প্রায় ১০ ঘণ্টা হতে চলল।

আর পারলাম না। টেণ্টে ঢুকে পড়লাম। সুশান্ত তখনও বাইরে বসে। এক অব্যক্ত উত্তেজনায় মনে হচ্ছে সারা শরীরে জ্বর এসে গেছে। শুরু হল প্রতি পল অনুপল গোনা। ঘড়িটার দিকেও তাকাতে ভয় করছে। আমার রক্তের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ও যেন ছুটে চলেছে। এ কি!

এ যে ৪টে বাজে!!

তবে কি, তবে কি···

দুই

১৮৯৫ সন।

এপ্রিল মাস।

প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'দাসী' পত্রিকায় এক চাঞ্চল্যকর অভিযান-কাহিনী প্রকাশিত হল।

নদীর কলতানের মধ্যে উৎসের সন্ধান পেয়ে তারই প্রবাহ অনুসরণ করে উৎসের দিকে এগিয়ে চলেছেন সাঁইত্রিশ বছরের এক বাঙালী যুবক। তিনি শুনেছিলেন: 'উত্তর-পশ্চিমে যে তুষার-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়, তথা হইতে জাহ্নবীর উৎপত্তি হইয়াছে। আমি সেই শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া বহু গ্রাম, জনপদ ও বিজন অতিক্রম করিয়া তথায় চলিলাম।' প্রথমে কুর্মাচলে সরযূ নদীর উৎস পরিদর্শন করে যুবক

দানবপুরে আসেন এবং পুনরায় বহু গিরিগহন লঙ্ঘন করে তিনি উত্তরাভিমুখে যাত্রা করেন।

একদিন পথশ্রমে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। চারিদিকে পর্বতমালা, তারই পাদদেশে নিবিড় অরণ্যানী। সামনেই অভ্রভেদী এক শৃঙ্গ তার বিরাট দেহ দ্বারা পশ্চাতের দৃশ্য অবরোধ করে রেখেছে। পথপ্রদর্শক উৎসাহ দেয়। বলে 'ঐ শৃঙ্গে উঠিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।' উৎসাহে সমস্ত ক্লান্তি ভুলে যুবক নতুন উদ্যমে শুরু করেন পর্বতারোহণ। পথপ্রদর্শক হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, সম্মুখে দেখ, জয় নন্দাদেবী, জয় ত্রিশূল! এক উচ্চতর শিখরে আরোহণ করে যুবক বিস্ময়ে হতবাক: 'দেখিলাম অনন্ত-প্রসারিত নীল নভোমণ্ডল। সেই নিবিড় নীলাম্বর ভেদ করিয়া দুই শুভ্র তুষার-মূর্তি শূন্যে উত্থিত হইয়াছে, একটি গরীয়সী রমণীর ন্যায়। মনে হইল যেন আমার দিকে সস্নেহে প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন।···এই মূর্তি সেই মাতৃরূপিণী ধরিত্রীর বলিয়া চিনিলাম। ইহার অনতিদূরে মহাদেবের ত্রিশূল পাতালগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া মেদিনী বিদারণপূর্বক শাণিত অগ্রভাগ দ্বারা আকাশ বিদ্ধ করিতেছে। ত্রিভুবন এই মহাস্ত্রে গ্রথিত।'

উৎস তখনও বহুদূর। আরো দুদিন বহু বন ও গিরিসঙ্কট অতিক্রম করে যুবক তুষার-রাজ্যে উপস্থিত হন। কল্লোলিনীর কলতান ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্র প্রভাবে স্তব্ধ হয়েছে। নদীর তরল ধারা কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে রূপান্তরিত হয়েছে।

'শিখর-তুষার-নিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল এখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। এর মধ্যে ঘন কুজ্ঝটিকা।'

তুষার নদীপথে যুবক ওপরের দিকে উঠতে থাকেন। ধীরে ধীরে বায়ুস্তর ক্ষীণতর হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া বেশ কষ্টকর হয়ে ওঠে। শরীর অবসন্ন। 'অবশেষে হতচেতনপ্রায় হইয়া নন্দাদেবীর পদতলে পতিত হইলাম।···কতক্ষণ পর সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা

দেখিলাম তাহাতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কুজ্ঝটিকা নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আচ্ছন্ন করিয়া ছিল তাহা ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া শূন্যমার্গে আশ্রয় করিয়াছে। নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্বর জ্যোতি বিরাজ করিতেছে। সেই জ্যোতিপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূমরাশি দিকদিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে কি এই সেই মহাদেবের জটা ? জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুষার কণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই কঠিন হীরক-কণাই ত্রিশূলাগ্র শানিত করিতেছে।'

বাংলা ভাষায় রচিত এই লেখাটি প্রথম এক উল্লেখযোগ্য হিমালয়-অভিযান কাহিনী। রচনাকাল ১৮৯৪। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর এটি অভিনব এক হিমালয়-অভিযান। ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু মনে নন্দা ত্রিশূল পরস্পরের পার্শ্বে সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টিকর্তার হস্তের আয়ুধ সাকার রূপে প্রতিভাত হয়।

তিন

হিমালয়ের আহ্বান রহস্যের আহ্বান, হিমালয়ের ডাক অজানার ডাক। হিমাদ্রি হিমালয়ের সুউচ্চ শিখরাবলীর চিরতুষারমণ্ডিত রূপ বিস্ময়-বিহ্বলকর। বিচিত্র সব হিমবাহ নিঃসৃত নির্ঝরিণী ঊর্মিমুখরা। আদিম অরণ্যানী আবেষ্টিত ছায়াঘন নিভৃত নির্জন উপত্যকাগুলি কল্পলোকের স্বপ্নজগৎ।

কোন্ উষাকাল থেকেই মানবশক্তির পদচারণা শুরু হয়েছে বর্ণময় হিমানী হিমালয়ের অঙ্গনে-প্রাঙ্গণে। বিশ্বপ্রকৃতির ভাঙাগড়ার তারা নীরব সাক্ষী। মহাবিশ্বের মহারহস্যের সন্ধানে তারা বারবার চেষ্টা করেছে। প্রলয়-তাণ্ডবে এক দিকে যেমন ভেঙেছে অনেক কিছু, অন্য দিকে তেমনি সৃষ্টির নব নব বিকাশে মানুষ বিস্মিত। পর্বতপুত্র প্রকৃতির

তালে তালে তাল মিলিয়ে আপন চলমান জীবনের গতিরেখাকে নানা কর্মধারায় প্রতিফলিত করেছে, বিকশিত করেছে ভাবজগতের বিচিত্র ভাবধারা। আর নানা ভাবসম্মিলনে সৃষ্টি পেয়েছে নব নব বৈচিত্র্য।

রহস্যঘেরা গাড়োয়াল-হিমালয় মানব কল্পনায় সৃষ্টি করে বিহ্বলকর রোমাঞ্চকৌতুক। দুর্ভেদ্য রক্ষা-প্রাচীরের মধ্যে শুভ্র তুষার-কিরীটিনীর নয়নাভিরাম রূপশোভা, সূর্যকরোজ্জ্বল বৈদূর্যমণির জ্যোতির্ময়তা বারবার চমৎকৃত করে মানুষকে। শ্বেতশুভ্র শিখরাবলী যেন তারই নিত্য প্রহরী। অনন্ত উদার গগনলোকের নীচে রূপমুগ্ধ মানুষ কি এক তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে। বারবার ছুটে চলে তারই পদতলে। দুর্গম বন্ধুর পথ পেরিয়ে, দুস্তর দুরারোহ চড়াই ভেঙে তার কাছে সে পৌঁছুতে পারে না। কঠিন সে বাধা। প্রলয়ঙ্কর প্রাকৃতিক পরিবেশের কাছে প্রতিহত হয় তার সব প্রচেষ্টা। তবুও সে চলার শেষ নেই।

কোন্ সুদূর অতীত থেকে বিবর্তনের বিচিত্র পথে মানুষ আপন চিন্তাধারাকে চিরন্তন করার জন্য, আপন কর্মযজ্ঞের গতিশীল প্রবাহকে অবিরত ধারায় অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াসে সৃষ্টি করে উদ্দীপনাময় এক ভাবলোক। রুদ্রের দারুণ অভিশাপে ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করে মহাশক্তির অনুরণন, চিরনীরব মহাকাশমাঝে অনুসন্ধান করে চিরশান্তির অভয়বাণী। এক বিস্ময়বিমুগ্ধ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে দেবত্ব আরোপ করে প্রকৃতির প্রলয়রূপে, আপন হৃদয়ের মাধুরী মিশিয়ে তাকে আপন করে নেয়। প্রাণময় প্রকৃতির বিচিত্র শোভা আর সমারোহের মধ্যে সৃষ্টি হয় কল্যাণময় মঙ্গললোক। কল্পনার হেমদ্যুতিতে তা লোকোত্তর। প্রকৃতির প্রতিকৃতি অভিনব ভাবমূর্তি ধারণ করে প্রতিফলিত হয় মানব-হৃদয়ে। দেবদেবী কল্পনায় তারা নিয়ে আসে নব নব নবত্ব। মানুষে মানুষে মিলনে এক দিকে যেমন তার ক্ষুদ্র খণ্ডিত সীমা ভাঙতে থাকে অন্য দিকে দেবদেবীরাও বৃহত্তর পরিমণ্ডলে রূপান্তরিত হয় মহাদেব মহাদেবীতে। আঞ্চলিক পরিবেশ সঞ্জাত নানা উপকরণ সংমিশ্রণে দেবলোক হয়ে ওঠে আরো অভিনব, অমৃতময়। আর

ভাব মিলনের অসমতার ফলে আঞ্চলিক প্রভাবও মাঝে মাঝে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হিমবন্তের হিমশিখরাবলীই হৈমবতী উমা কল্পনার ভিত্তিভূমি। নীলাম্বরের নীচে গাড়োয়াল-হিমালয়ের উচ্চতম রজতশুভ্র শৃঙ্গই নন্দা-ভগবতীর সূর্যদীপ্ত অলোকসুন্দর স্বর্ণসিংহাসন। কুন্তলে তার তারার মালা, অঙ্গে তুহিনশুভ্র বসন, পূত ধারায় বিধৌত চরণতল। মহিমায় তার বিশ্বলোক উদ্ভাসিত, অরুণচ্ছটায় মঙ্গললোক নন্দিত, মর্ত্যলোক আনন্দিত। নন্দাদেবী মহাদেবী মহামায়া হৈমবতী উমার সঙ্গে একাত্ম হয়েও আপন বৈশিষ্ট্যে অদ্বিতীয়া। কুমাঁউ-গাড়োয়ালবাসীদের কাছে তিনি মহাশক্তিসম্পন্ন দেবী ভগবতী। ত্রিলোচন ত্রিশূলধারী শিব দেবাদিদেব মহাদেব। শিবানী হিমালয়ের হিমানী শিখরাবলীই তাঁর বিচরণভূমি। মানবীয় ভাবকল্পনায় উভয়েই যুক্ত হয়ে সৃষ্টিরহস্যের দ্বৈত চেতনা পায় পূর্ণতা। দুঃখের তপস্যায়, বিপদে বিজয়িনীর মহিমায় অপরূপ শোভামণ্ডিত এক অলঙ্কৃত চিত্রপটে এই উদ্দীপ্ত যুগলমূর্তি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, অনুপ্রাণিত করে কঠিন কর্মের পথে অগ্রসর হতে। ত্রিশূল-লাঞ্ছিত পতাকা হাতে মানবযাত্রী এগিয়ে চলে মহামানবের মহান তীর্থপথে, সার্থকতার অমৃত-সন্ধানে।

হিমালয়ের এক দুর্জ্ঞেয় প্রহেলিকাময় প্রান্তরে বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নন্দাদেবীর অবস্থান। অন্তহীন রহস্যনিলয়ের মাঝে হৈমবতী হিমানী শিখরটিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে কত কথা, কত উপ-কথা! প্রচলিত হয় নানা আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ। রহস্যের মায়াজালে আবদ্ধ মানুষ চিরকল্যাণময়ীর অন্তর্লোকে প্রবেশের জন্য কঠিন সাধনায় রত। নন্দালোকের মহিমানিলয়ের দ্বার প্রহরায় রয়েছেন স্বয়ং মহাদেব। তারই প্রতীক, প্রধান আয়ুধ ত্রিশূল অনধিকার-প্রবেশ-কারীর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়োয়ালের তাৎপর্যপূর্ণ এক অনুষ্ঠান হল নন্দাজাত। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে নন্দা-ভগবতীকে দোলায় চাপিয়ে তীর্থযাত্রীদল

এগিয়ে চলে ত্রিশূলের দিকে। প্রকৃতির শত বাধার বেড়াজাল ছিন্ন করে ত্রিশূলের পাদদেশে পৌঁছতে পারলে দেবতার উদ্দেশ্যে হোম সম্পন্ন করে ভগবতীর জন্য নানা সৌভাগ্য-দ্রব্যাদি চার-সিংওয়ালা এক ভেড়ার পিঠে চাপিয়ে রওনা করিয়ে দেওয়া হয় ত্রিশূল অভিমুখে। জগজ্জননীর জয়ধ্বনি করে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে আসে পুণ্যার্থীর দল। প্রায় ৫৫০/৬০০ বছর আগে এমনি এক তীর্থযাত্রীদল ত্রিশূলের পাদদেশে হোমকুণ্ডের পথে রূপকুণ্ডের কাছে নিদারুণ তুষার-ঝড় ও হিমানী-সম্প্রপাতের ফলে চির-সমাধি লাভ করে। তাদের অস্থি-অবশেষ আবিষ্কৃত হবার পর থেকে কত মানুষের কত কৌতূহল। ত্রিশূলের পথ এখন তাই উদ্দাম রহস্যে ঘেরা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মহান তীর্থপথ।

নন্দাদেবীকে ঘিরে আছে প্রায় সত্তর মাইল পরিধিযুক্ত এক রক্ষা-প্রাচীর। যার নিম্নতম উচ্চতা আঠারো হাজার ফুটের কম নয়। এই প্রাচীরের ওপর কমপক্ষে উনিশটি একুশ হাজার ফুটের উপর শৃঙ্গ অতন্দ্র প্রহরীর মতো নন্দাদেবীকে বেষ্টন করে আছে। নন্দাদেবীর পাদদেশ থেকে ঋষিগঙ্গার অমৃতধারা ঋজু গিরিখাতের মধ্য দিয়ে দুরন্ত দুর্বার গতিতে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিম দিকে রেনি গ্রামের কাছে ধৌলী-গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। রক্ষাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশের এটাই একমাত্র প্রাকৃতিক প্রবেশ-পথ। ঋষি-উপত্যকার দিকে রক্ষাপ্রাচীর দুই স্তরে সুরক্ষিত। অন্তর-প্রাচীর ছাড়া বহির্ভাগে দুনাগিরি থেকে এক গিরিশিরা নেমে এসেছে এবং ত্রিশূল থেকে অন্য এক গিরিশিরা উত্তর-মুখী হয়ে উপত্যকাটিকে সুদৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত করে রেখেছে।

সপ্তঋষির বাসভূমি ঋষি উপত্যকা আজও অনুধ্যষিত। বছরের মাত্র কয়েক মাস পাহাড়ীরা তাদের ছাগল ভেড়া চরাতে আসে। সঙ্কীর্ণ গিরি-সঙ্কট, গভীর গিরিখাত, গহন গিরিগুহালোক, উন্মাদিনী কলস্বনার দিশা-হারা গতি, উপলাকীর্ণ তটরেখা, তীরে তীরে বন-উপবন, স্তবকে স্তবকে বসন্ত-শোভা, আঁকাবাঁকা আলোয় লতাবিতানের মাঝে ছায়াছন্ন নিভৃত-নির্জন প্রান্তর, নাম-না-জানা রঙ-বেরঙের ফুলের বর্ণসুষমা আর নীল

নভোমণ্ডলের নীচে অভ্রভেদী রজতশুভ্র শিখরাবলীর অনন্ত উদার মহিমা ঋষি উপত্যকাকে এক অলৌকিক মায়াজগতে রূপান্তরিত করে। ভক্ত দূর থেকে প্রণাম জানায়। কিন্তু মানুষের অদম্য কৌতূহল, অজানাকে জানার তীব্র বাসনা, তাকে টেনে আনে নন্দালোকের সিংহদ্বারে। শত বাধার সম্মুখীন হয়েও অপরাজিত মানুষ এগিয়ে চলে আপন জয়যাত্রার পথে। বিফলতায় হৃতোদ্যম না হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে আবার শুরু হয় তার নব-যাত্রা। সংহারের লীলাক্ষেত্রে আপন বিজয়-কেতন উড়িয়ে বিনম্র চিত্তে সে অগ্রসর হয়। অসমসাহসিক মানুষের বিচিত্র কর্মলীলায় দেবতার হৃদয় বুঝি বিগলিত হয়, উচ্চারিত হয় অভয়মন্ত্র....চরৈবেতি....চরৈবেতি....

শম্ভুদা থামলেন।

সারা ঘর শম্ভুদার উদাত্ত কণ্ঠস্বরে, শব্দচয়নের বৈচিত্র্যে, বিষয়ের গভীরতায় এক অনির্বচনীয় মাধুর্যে গমগম করছে। ঘোর লেগে গেল যেন। অদ্ভুত এক তৃপ্তির স্বাদে দু চোখ বন্ধ হয়ে এল আমার। মুহূর্তে পরিবর্তিত হল দৃশ্যপট। চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হল শম্ভুদার খিদিরপুরের ছোট্ট ঘরখানি, মহানগরীর আপন বৈশিষ্ট্যে যেখানে দিনের বেলাতেও আলো জ্বালাতে হয়, পাখা না চালালে মুহূর্তে যেখানে দমবন্ধ অবস্থা। মনে হল, আমি পৌঁছে গেছি সেই বিশালের কাছে, সেই অসীম নীলের নীচে, সাদা-সবুজের পাশে, সেই বিরাটের পায়ের কাছে। মনে হল, সেই চিরশীতলের স্পর্শে আমার সদা-উত্তেজিত মন পেল চিরশান্তির ছোঁয়া, মনে হল, রোজকার জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত আমার দুর্বল ফুসফুস সেই উদারতার সামনে দাঁড়িয়ে গভীর প্রশ্বাসে আরও একবার পেল জীবনের আশ্বাস, পেল অমৃতের আস্বাদ।

শম্ভুদার মতো হিমালয়-প্রেমের অতলান্ত সাগরে আজও আমি ডুবতে পারিনি। শম্ভুদার মতো হিমালয়-সাধনার গভীরতাও আমার নেই, নেই তার মতো প্রকাশভঙ্গীও। শুধু এটুকু বলতে পারি, কেন জানি না, আমার শিরায় শিরায় এক মহাকল্লোল শুনতে পাচ্ছি। সমগ্র চেতনা

শুধু একমুখী হতে চাইছে। দুর্গম ত্রিশূলের হাতছানি আর দুর্জ্ঞেয় ঋষি উপত্যকার আহ্বান এড়ানোর সাধ্য আমার নেই, সাধও আমার নেই।

চার

—'তাহলে এটাই কি শেষ কথা?' প্রত্যেকটা শব্দ কাটাকাটা ভাবে উচ্চারণ করল অনিন্দ্য।

একপলক তাকিয়ে দেখলাম। সবার উজ্জ্বল চোখগুলো আমার ওপর নিবদ্ধ। এক সেকেণ্ড চুপ করে রইলাম, তারপর—

—'হ্যাঁ, এইটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।' আমি কিছু বলবার আগেই পিকে মানে প্রবীর টেবিলে চাপড়ে একতরফা রায় ঘোষণা করে দিল।

—'তবে আর কি, সব আলোচনা তাহলে শেষ হল। তাইতো?' স্বভাবসিদ্ধ ঠাণ্ডা মেজাজে আস্তে আস্তে বলল কিণ্ডো।

—'না, না, এটা আবার কি কথা! আলোচনার তো সবে শুরু। কত দিক নিয়ে আলোচনা করতে হবে এখন, আপনি কি বলেন, বিজয়?' সিরিয়াস গলা সুশান্তর।

আমি একটু নড়েচড়ে বসলাম। ঘরটা এমনিতেই ছোট, তার ওপর এতগুলি লোক। প্রায় সবাই হাজির। চিত্তরঞ্জনের অনিমেষদা, প্রবীর, সুশান্ত, সদা, কিণ্ডো আর কালীসাধন। বার্ণপুরের জিতু, দ্বিজেন, শোভন। দুর্গাপুর থেকে এসেছে দীনেন। ধানবাদ থেকে অনিন্দ্যও উপস্থিত। শুধু শম্ভুদা, ডাক্তার আর হীরালালই আসতে পারেনি কলকাতা থেকে। সংগঠনের জরুরী ডাকে আগামী অভিযানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সবাই জড়ো হয়েছে চিত্তরঞ্জনে, সংগঠনের অফিস-ঘরে। সেই কখন বৈঠক শুরু হয়েছিল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, আলোচনাও বিভিন্ন খাতে গড়াতে গড়াতে চলল। চা চলেছে অনেক, চারমিনার পুড়েছে অঢেল। মনে হচ্ছে আরও চলবে।

—'দ্যাখ,' গলা-খাঁকারী দিয়ে শুরু করলাম আমি, 'আমরা অনেক কথা বললাম, অনেক আলোচনা করলাম। ছাড়া ছাড়া ভাবে, বিক্ষিপ্ত ভাবে, টুকরো টুকরো করে। এই সমস্ত কথার মধ্য থেকে যে জিনিসটা বার হয়ে আসছে তাকে বরঞ্চ একটু সামারাইজ করা যাক, একটু গোছানো যাক।' সমর্থনের আশায় একটু থামলাম।

—'তাহলে, প্রথম কথা হল আমরা আগামী বর্ষাশেষ মরশুমে মানে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে অভিযানে যাচ্ছি। ঠিক আছে ?'

—'আর শম্ভুদার সঙ্গে ঋষি উপত্যকা নিয়ে আলোচনার যে বর্ণনা বিজয় একটু আগে আমাদের কাছে রেখেছেন তা থেকে অন্তত এটা ঠিক যে অভিযানের স্থান হিসেবে এটি চমৎকার।' আমি থামতেই খেই ধরল সুশান্ত।

—'আরও কটা কথা মনে রাখা দরকার,' আমি বললাম, 'মনে রাখা দরকার, হিমালয়ের যে অংশ ভারতবর্ষের ভেতরে তার মধ্যে এই নন্দাদেবী অঞ্চল অর্থাৎ যেখানে এই ঋষি উপত্যকা আর ত্রিশূল, সেই অঞ্চলই সবচাইতে সমৃদ্ধিশালী, অন্তত পর্বতারোহণের দৃষ্টিকোণ থেকে। আবার দেখ, বাংলার তথা ভারতের প্রথম বেসরকারী পর্বতাভিযান এই ত্রিশূলের পার্শ্ববর্তী নন্দাঘুন্টি (২০,৭০০) থেকে শুরু হলেও এত নাম-করা শৃঙ্গ ত্রিশূলে কিন্তু গোটা পূর্ব ভারত থেকে কেউ অভিযান চালালেন না। শুধু তাই বা কেন, এমন যে দুর্গম রোমাঞ্চকর ঋষি উপত্যকা—তার ভেতরেই এই বাংলার কোন দল পা বাড়াননি। অথচ দ্যাখ, ত্রিশূল নামের মধ্যেই কেমন একটা আকর্ষণ বোধ করছি আমরা। প্রতিবছর রাণীক্ষেত কৌশানী অঞ্চলে যে হাজার হাজার লোক বেড়াতে যান তাঁরা তো অত দূর থেকেই ত্রিশূলের রূপ দেখে মোহিত।'

—'আরও আছে,' সুশান্ত বলল, 'এক নম্বর, ১৮৮৩ সনে হিমালয়ে প্রথম পর্বতারোহণ অভিযান হয় এই ঋষি উপত্যকা দিয়েই। দু নম্বর ১৯৫১ সনে গুরুদয়াল সিংয়ের নেতৃত্বে এই ত্রিশূলেই সংগঠিত হয় প্রথম ভারতীয় অভিযান।'

—'হুররে!' একসঙ্গে প্রায় সবকটি গলা হৈ-হৈ করে উঠলো, 'আর কোন কথা নয়। আমরা ত্রিশূলেই যাব। একসঙ্গে এতগুলি ঘটনা আমাদের নির্দেশ করছে ত্রিশূলে যেতে। ত্রিশূল ছাড়া আমাদের গতি নেই।'

—'উঃ সেই কবে থেকে শয়নে স্বপনে জাগরণে শুরু হয়েছে শুধু ত্রিশূল-চিন্তা। অন্য কোথাও যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না,' খুশি-খুশি গলায় বলল দ্বিজেন।

—'কি, সেই আমার কথাই ফলল তো? সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। স্বভাব-সিদ্ধ ভঙ্গীতে সামনে-বসা সুশান্তর দিকে মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুঁড়ে ঘোষণা করল প্রবীর।

—'তাহলে নীতিগত ভাবে ত্রিশূল আমাদের আগামী অভিযানের লক্ষ্য বলে স্থির হল,' সবার দিকে তাকিয়ে বললাম আমি।

—'চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত,' সবার গলার ওপর দিয়ে শোনা গেল প্রবীরের গলা।

একটু থেমে বললাম, 'এবারে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে অনিমেষদাকে নিয়ে, অর্থাৎ ম্যানেজারকে নিয়ে অর্থাৎ কিনা টাকা পয়সা নিয়ে। কি তাই তো?'

সবাই চুপ। এবারেই তো অপ্রিয় প্রসঙ্গটি আসবে।

—'আচ্ছা বিজয়,' সুশান্ত যেন নতুন করে শুরু করল, 'আপনি তো অনেকদিন ধরেই ত্রিশূল নিয়ে ভাবছেন। নিশ্চয়ই বাজেট নিয়েও কিছু ভেবেছেন। একটা এক কথার বাজেট দিন তো। কত টাকা লাগতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

—'দেখ,' আমি বললাম, 'বাজেট নিয়ে কোন কথা বলবার আগে অন্ততঃ ছুটো ব্যাপার আমার জানা দরকার। এক নম্বর, কতজনের দল হবে আর ছু নম্বর শেরপা থাকবে কিনা বা থাকলে কজন?'

—'হ্যাঁ, শেরপার প্রয়োজন হবে বৈকি! মেজর এক্সপিডিশন।' সিরিয়াস গলা জিতুর।

—'আরে এটা একটা রাফ হিসেব তো,' সুশান্ত আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'ধরুন না ১২ থেকে ১৫ জনের দল আর শেরপা—তাও ধরুন জনা দুই।'

—'সবই তো ধরাধরির ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, সময়ও ধরে নিচ্ছি পাঁচ সপ্তাহ। তাহলে বাজেটও ধর গিয়ে মিনিমাম ৩০ হাজার।' আস্তে করে বললাম আমি।

—'তি-রি-শ-হা-জা-র!' আবার একটি কোরাস কণ্ঠ।

—'সেও অনেক টাকা!' দীনেনের কণ্ঠে সত্যিই বিস্ময়।

—'তিরিশ হাজার! ওরে বাবা, অত টাকা একসঙ্গে আমি দেখিইনি।' কিশোর অকপট স্বীকারোক্তি।

—'আরে দেখা তো দূরের কথা—' শোভন খেই ধরল, 'বল তো মোট কত টাকা হলে তিরিশ হাজার হয়?'

—'ডাইলের মজা তলে,' ঢাকার পোলা অনিমেষদার হাতের নাগালের বাইরে গিয়ে মন্তব্য করল কালী।

—'এই আস্তে আস্তে, কি আরম্ভ করেছিস তোরা, কাজের কথা একটাও হচ্ছে না!' সজোরে চেয়ারটাকে পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল অনিন্দ্য। সবাই সঙ্গে সঙ্গে চুপ। সবার দিকে একবার দেখে নিয়ে অনিমেষদার দিকে চেয়ারটা ঘুরিয়ে আবার বসে পড়ল, 'অনিমেষদা, এই বাজেট নিয়ে তোমার বক্তব্যই সবার আগে শোনা দরকার। তোমার কি বলার আছে বল তো?'

'দেখ,' অনিমেষদার চশমা চোখ থেকে হাতে চলে এল, 'বিজয় যে টাকার কথা বলল, আমারও ধারণা ওই রকম পড়বে। বরঞ্চ দু-এক হাজার বাড়লে আমি আশ্চর্য হবো না।'

—'কিন্তু এত টাকা লাগবে কেন?' অনিমেষদাকে থামতে দেখেই বলে উঠল দীনেন।

—'আঃ, থাম তো। শুনতে দে। অনিমেষদা তুমি বলে যাও।' অনিন্দ্য চেয়ারটাকে অনিমেষদার আরও একটু কাছে নিয়ে এল।

—'যেমন ধরো, কয়েকটা হিসেব হাতে হাতে এক্ষুণি করা যায়,' ডান হাত থেকে বাঁ হাত ঘুরে আবার চশমা চোখে চলে এল। এবার ডান হাতে কড় গোনার মত ভঙ্গী করে অনিমেষদা বলতে লাগল, 'যতদূর জানলাম ত্রিশূলের মূল শিবির পৌঁছুতে মোট ৬ দিনের মার্চ। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে কি বিশাল পোর্টার-বাহিনী দরকার হবে। গত অভিযানের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এই বিশাল পোর্টার বাহিনী, হাই অল্টিচ্যুড পোর্টার, শেরপা ইত্যাদিদের পেছনেই ১২/১৩ হাজার টাকা চলে যাবে। তারপর ধরো পাহাড়ে চড়ার ইকুইপমেন্ট ভাড়া— তাও হাজার চারেক। বাস ভাড়া অন্ততঃ দু'হাজার। এতগুলি লোকের ট্রেন-ভাড়া, রাস্তার খাওয়া-দাওয়া অন্ততঃ তিন হাজার। ফটোগ্রাফি হাজার খানেক। এর পর এতগুলি লোক আর পোর্টার বাহিনীর এতদিনের রেশন কোন না ৭/৮ হাজার হবে। এছাড়া অরগানাই-জেশন, প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিকেশন, করেস্‌পনডেন্স ইত্যাদি হাজারটা খরচ তো রয়েইছে। কি যোগ করেছ?' কালীর দিকেই তাকাল অনিমেষদা।

—'মাথা খারাপ! অংকে কোনদিন তিরিশের ওপরে যেতে পারিনি, তায় আবার যোগ!' কালীর নিপাট উত্তর।

—'তাছাড়া,' শোভন কালীকে দলে টানল, 'কালী আর আমি নেহাৎ ছেলেমানুষ, টাকা পয়সা সম্বন্ধে বুঝিও না। আমরা এ ব্যাপারে নেই।' ছোট একটা হাসির রোল উঠল ঘরে।

—'তাহলে,' আবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অনিন্দ্য, 'তাহলে মিটিং শেষ বলে ধরে নিতে পারি?'

—'ও আবার কি কথা! মিটিং শেষ? কেন?' একান্তই অবাক চোখে জিজ্ঞেস করল সুশান্ত।

—'না, টাকা-পয়সার আলোচনা যেখানে এসে পৌঁছল তাতে এ মিটিং আর চালিয়ে যাওয়ার কোন অর্থ হয় কি?' ঠাণ্ডা গলায় বলল অনিন্দ্য।

—'অর্থই অনর্থের মূল।' পেছন থেকে শোভনের উদাসীন গলা।

—'ডাইলের মজা........' অনিমেষদা হাত তোলার আগেই কালী একলাফে শোভনের পাশে।

—'শোন অনিন্দ্য, এত অধৈর্য হলে কি চলে,' চশমা আবার হাতে চলে এসেছে অনিমেষদার, 'এটা ঠিকই যে ৩০ হাজার টাকা আমাদের মতো ছোট সংগঠনের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু তাই বলে একেবারে এক কথায় অসাধ্য বলে দিতে আমি রাজি নই।'

পাশ থেকে প্রবীর অনিন্দ্যর মুখের সামনে দু হাত নেড়ে ওকে ভরসা দিতে চাইল, 'আরে এত নার্ভাস হওয়ার কি আছে! একবার অন্ততঃ চেষ্টা করতে দোষ কি?'

—'না, নার্ভাস আমি হইনি। আর সেই জন্যই আমার খারাপ লাগছিল। কোথায় কিভাবে টাকার ব্যবস্থা করা যায় তার প্ল্যান-প্রোগ্রাম হবে তা নয়, এরা এমন আরম্ভ করল—' কালী আর শোভনের দিকে তাকাল অনিন্দ্য, 'যে মনে হল আমরা দিনের আলোয় স্বপ্ন দেখছি!'

—'আরে, ওদের কথা ছাড়।' হাসতে হাসতে বলল অনিমেষদা, 'ওরা তো দিব্যি আছে, মিটিংএ আসছে, চা-চানাচুর ধ্বংস করছে আর—'

—'পাহাড়ে যামু পাহাড়ে যামু কইর‍্যা নাচতে আছে।' কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই নিরাপদ ব্যবধানে সরে গেল কালী।

—'না, না, শোন,' দু হাত নেড়ে সবাইকে শান্ত করল সুশান্ত, 'let us take it seriously. যেতে আমাদের হবেই। পিকের ভাষায় যাকে বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এর কোন নড়চড় নেই। এখন বল এই টাকা কোথা কোথা থেকে পাওয়া যেতে পারে?'

—'শোন, এক কথায় বলতে পারি অত হতাশ হওয়ার কিছু নেই।' অনিমেষদা একটু সময় নিল। পকেট থেকে রুমাল বার করে বার দুয়েক চশমার কাঁচ পরিষ্কার করল। ঘরের আবহাওয়াও যেন পালটে

গেল মুহূর্তে। সবাই কাছাকাছি ঘন হয়ে বসল। কালীকেও দেখলাম নির্ভয়ে অনিমেষদার পাশেই বসতে। চশমাটাকে চোখের ওপর ঠেলে দিয়ে শুরু করল অনিমেষদা, 'এই রাফ বাজেট নিয়ে অলরেডি আমি আর বিজয় কিছু আলোচনা করেছি। মোটামুটি ভাবে এটা বলা যায় যে দিল্লীর Indian Mountaineering Foundation আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে আমরা ভাল সাহায্য পাব। উত্তরপ্রদেশ সরকারও সাহায্য করে থাকেন। এভাবে দেখা যায় যে সরকারী সাহায্য হিসেবে বারো-তেরো হাজার টাকা আমরা আশা করতে পারি। এর পর আসছে আমাদের মানে যারা এই অভিযানে যোগ দেবেন—তাদের নিজস্ব একটা দান। তা থেকেও হাজার পাঁচেক ধরতে পারি। এ ছাড়া আছে বহু বেসরকারী সংস্থা, যারা এ ধরনের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান, সাহায্য করেন। অতীতেও এরকম অনেক সংস্থার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়েছে। বেশ কিছু টাকা ও জিনিসপত্র আমরা এঁদের কাছ থেকে নিশ্চয়ই পাব। এভাবে দেখা যায় প্রায় হাজার কুড়ি হয়তো আমরা যোগাড় করে ফেলব। বাকী থাকে দশ হাজার। এটার যোগাড়—' কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই আমার দিকে তাকাল অনিমেষদা।

—'এটার যোগাড়—,' সঙ্গে সঙ্গেই বলতে লাগলাম আমি, 'সম্পূর্ণ ভাবেই নির্ভর করে আমাদের সংগঠন-শক্তির ওপর। আমরা রসিদ বই ছাপাব। আমাদের চারপাশের মানুষের কাছে যাব, সব বলব, বোঝাব, সাহায্য চাইব। আমি মনে করি বাকী টাকাটা এভাবেই তুলতে পারবো আমরা।'

—'আমি যাব পাহাড়ে, লোকে দেবে টাকা! কেন?' হঠাৎ বলে উঠল কালী।

—'আবদার আর কি!' গলা মেলাল শোভন।

—'আবার!' বলে অনিন্দ্য ওদের দিকে তাকাতেই দেখল ওদের দু'জনেই জোড়হস্তে উঠে দাঁড়িয়েছে।

—'মাপ, আর বলব না, মনে ছিল না, আমরা টাকা-পয়সার ব্যাপারে নেই।' এক সুরে বলে উঠল কালী আর শোভন।

—'দেখ,' মৃদু হেসে ওদের হাত নেড়ে বসতে বলে বললাম, 'ভাষা আর ভঙ্গিমাটা বাদ দিলে ওদের কথাটা কিন্তু উড়িয়ে দেওয়ার নয়। সত্যিই তো, আমি যাব পাহাড়ে আর পাঁচজনে যোগাবে টাকা এটাই বা কেমন কথা? কিন্তু আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে—হ্যাঁ, লোকে টাকা দেয়। যদি আমরা ঠিক ঠিক বোঝাতে পারি যে আমরা কোথায় কিভাবে ও কেন যাচ্ছি, যদি দেখাতে পারি যে এত বিপুল সংখ্যক টাকা কেন লাগে, যদি এও আমরা বিশ্বাস করাতে পারি যে এই অভিযানের যা-কিছু অভিজ্ঞতা, যা-কিছু আহরণ, যা-কিছু দর্শনীয় সবই প্রকাশের বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা তাদের সামনে উপস্থিত করব তাহলে কেন তারা সাড়া দেবে না? পাহাড়ের টান, পাহাড়ের হাতছানি কে উপেক্ষা করতে পারে, বিশেষ করে যে পাহাড়ের নাম হিমালয়! প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে হিমালয়ের এক বিশেষ স্থান। এই প্রেমই তাকে সাহায্য করতে উদ্বুদ্ধ করবে। মনে রাখতে হবে, এ চাওয়ার মধ্যে কোন লজ্জা বা হীনমন্যতা নেই। শুধু আজ নয়, সেই প্রথম দিন থেকেই হিমালয় অভিযানের সামাজিক মূল্য অনস্বীকার্য।' একটু হেসে আবার বললাম, 'কি, আমি কি খুব বেশী বলে ফেললাম?'

—'না না, বেশী কি, এ কথাগুলির খুবই দরকার ছিল। অস্বীকার করব না এর আগে পর্যন্ত চাঁদা তুলতে গিয়ে কেমন একটা অপরাধবোধে ভুগতাম আমি। তুই আমাকে অনেকটা নৈতিক জোর ফিরিয়ে দিলি।' আবেগের সঙ্গে বলল অনিন্দ্য।

আমি বললাম, 'আমি না, হিমালয়—ত্রিশূল।'

—'হ্যাঁ, ত্রিশূল,' বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলল অনিন্দ্য, 'ত্রিশূল আমাদের লক্ষ্য। আজ থেকে ত্রিশূল আমাদের ধ্যান-জ্ঞান। আর কোন দ্বিধা নয়। কাজে নেমে পড়া যাক।'

—'একটা কথা,' সুশান্ত স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধিদীপ্ত স্বরে বলল,

'অভিযানের সাংগঠনিক কাজ আজ থেকেই আরম্ভ হোক। তার পাশাপাশি আরো অন্ততঃ একটা-ছুটো এরকম বৈঠকের ব্যবস্থা করা হোক যেখানে ঋষি উপত্যকা ও নন্দাদেবী, ত্রিশূল অঞ্চল নিয়ে আমরা ব্যাপক আলোচনা করব। স্বনামধন্য পূর্বসুরী পর্বতারোহীদের যে-সব রোমাঞ্চকর অভিযান-কাহিনী ঐ অঞ্চলকে আরও চিত্তাকর্ষক করেছে তার যতদূর সম্ভব তথ্য যোগাড় করে আমরা আলোচনা করি। নিশ্চয়ই আমাদের অভিযানের প্রস্তুতির দিক থেকে তা যথেষ্ট সহায়ক হবে।'

—'তাহলে—' এবার উঠে দাঁড়াল অনিমেষদা, 'তাহলে এই বর্ধিত সভার মুখপাত্র হিসেবে আজকের বৈঠকের সিদ্ধান্ত সংগঠনের কার্যকরী-সমিতির কাছে উপস্থিত করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের আগামী অভিযানের working plan তৈরী করে কাজে নেমে পড়তে অনুরোধ করছি এবং এই কথা বলেই আজকের বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করছি।' একটু থেমে আবার বলল অনিমেষদা, 'কি এই তো? কারো কিছু বলার থাকলে বল। কি পিকে, চুপ করে রইলে যে?'

—'ভদ্রলোকের এক কথা,' প্রবীর মুষ্টিবদ্ধ হাত ওপরে ছুঁড়ে বলল, 'সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।'

একগাল হেসে অনিন্দ্য বলল, 'সব ভাল তার, শেষ ভাল যার।'

—'অর্থাৎ কিনা ডাইলের মজা তলে—' বলেই বাইরে দৌড় লাগাল কালী।

সবার হাসিতে ভরে উঠল ঘর।

পাঁচ

আবার সেই ঘর।

আবার বৈঠক। আবার চা-চানাচুর-চারমিনার।

ইতিমধ্যে বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। অনেক দিনের স্বপ্ন ত্রিশূল-অভিযান ধীরে ধীরে চেহারা নিচ্ছে।

প্রস্তুতির প্রাথমিক পর্যায়ে যোগাযোগ করা হয়েছে অনেক সংস্থার সঙ্গে, বহু ব্যক্তির সঙ্গে। এছাড়া পুরনো দিনের অভিযান সংক্রান্ত বই ঘাঁটাঘাঁটি তো আছেই। সমস্ত জায়গা থেকেই সাড়া পাওয়া গেছে চমৎকার। বহু বিচিত্র তথ্য হাতে এসেছে আমাদের। সে সমস্তই এক জায়গায় জড়ো করে হাজির করা হয়েছে আজকের এই বৈঠকে।

আজকের বৈঠকেও উপস্থিতির হার খুব ভাল। সম্ভাব্য সবাই হাজির রয়েছে। এমনকি ডাক্তার এবং হীরালালও হাজির। আর শম্ভুদা! শম্ভুদা তো আছেনই। শম্ভুদাই তো আজকের মূল বক্তা।

দীর্ঘমেয়াদী বৈঠকের জন্য প্রস্তুত হয়ে সবাই গুছিয়ে বসল। প্রত্যেকের হাতেই নন্দা-ত্রিশূল অঞ্চলের একটি স্কেচ্ ম্যাপের ব্লুপ্রিন্ট কপি দেওয়া হয়েছে। সবাই প্রায় তাতেই মগ্ন। ইতিমধ্যে এক রাউণ্ড চা-ও পরিবেশিত হয়েছে। শম্ভুদা হাতের কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে নিয়ে পকেট থেকে একটা নাম্বার টেন সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাই বার করে সামনে রাখলেন। নাম্বার টেন শম্ভুদার একান্ত ব্র্যাণ্ড। বুঝলাম শম্ভুদার মুড আসছে। আমরাও তৈরী। প্যাকেট থেকে একটি সিগারেট বার করে ধরিয়ে সজোরে একটা টান দিয়ে একটু থেমে মুখ খুললেন শম্ভুদা ঃ

'তাহলে আজকের বৈঠকের কাজ আমরা আরম্ভ করতে পারি। আজকের এই বৈঠকের উদ্দেশ্য হল ঋষি উপত্যকা ও নন্দাদেবী-ত্রিশূল অঞ্চল নিয়ে আজ পর্যন্ত যত অভিযান ইত্যাদি হয়েছে সেগুলিকে স্মরণ করা এবং তার ভেতর দিয়ে সমগ্র অঞ্চলটি সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব জ্ঞান অর্জন করা। বেশ, আমরা যতদূর জানতে পেরেছি তা এখানে রাখছি আমি। কিন্তু একটা কথা, শুধু যদি আমি বলে যাই তবে ব্যাপারটা সেই একতরফা লেকচারের মত শোনাবে। তার চেয়ে বরঞ্চ সবাই যদি একটা দুটো প্রশ্ন করো তাহলে মনে হয় পুরো আলোচনাটা আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। যাই হোক, শুরু করা যাক।' শম্ভুদা একটু থামলেন, হাতের সিগারেটটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। ওটা

এমনিতেই পুড়ে অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। বাকীটা একটা সুদীর্ঘ টানে শেষ করে সামনের চায়ের ভাঁড়টাতে গুঁজে দিয়ে বলতে শুরু করলেন :

—'ঋষি উপত্যকায় প্রথম কে প্রবেশ করেছিল সে ইতিহাস আজ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। ১৮১৫ সনে ইংরেজ অধিকারে আসার পর এই অঞ্চলে সমীক্ষার কাজ শুরু হয়। ১৮৭৪-৭৭ সনে তদানীন্তন G.T.S.-এর অ্যাসিস্টেন্ট সুপারিনটেনডেন্ট E.C. Ryall ঋষি উপত্যকায় প্রথম পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষক দল পরিচালনা করেন। তাদের বিবরণে 'great exposure and privations in the Rishiganga Valley'-র ভয়াবহ রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই এই অঞ্চলে সমীক্ষা 'perhaps the most formidable undertaking in the whole range of Himalaya, yet accomplished.' বলেই তাদের মনে হয়েছিল। এর পর আসে ১৮৮৩ সন।'

—'১৮৮৩ সন মানে তো সেই যেবার গ্রাহাম এলেন ওখানে,' শম্ভুদাকে দম নিতে দেখেই বলে উঠল দীনেন।

—'হ্যাঁ হ্যাঁ,' পাশ থেকে বলল অনিন্দ্য, 'হিমালয়-অভিযানের সেই তো সূচনা।'

এই ফাঁকে শম্ভুদা আবার দশ নম্বরী ধরিয়েছেন, 'হ্যাঁ, গ্রাহামের সেই বিখ্যাত অভিযান সম্বন্ধে আমাদের বিশদ ভাবে জানা দরকার। সেই অভিযান সম্বন্ধে লণ্ডনের রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির ৯ই জুন, ১৮৮৪ তারিখের সভায় একটি রিপোর্ট তিনি পেশ করেন। এই রিপোর্টটি পরে 'Proceedings of the Royal Geographical Society and monthly record of Geography'-র ১৮৮৪ সনের আগস্ট মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বলা যায় ঋষি উপত্যকায় পর্বতারোহণ নিয়ে এটিই প্রথম লিখিত দলিল। আমরা যদি সোজা সেই লেখাটি পড়ে আলোচনা করি তবে সেটাই হবে সবচেয়ে ভাল। শম্ভুদা এক মুহূর্ত থামলেন, সামনে রাখা কাগজপত্রগুলো থেকে একটা আলগা কাগজ টেনে বার করে পড়তে শুরু করতে গিয়ে দেখলেন ডান

হাতের আঙুলে গোঁজা নাম্বার টেন ইতিমধ্যে নাম্বার ফাইভে পরিণত হয়েছে। একটানে সেটা নাম্বার থ্রিতে পরিণত হল এবং স্থান পেল সামনের চায়ের ভাঁড়ে। নড়েচড়ে বসে শম্ভুদা কাগজটা হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন :

'গ্রাহাম লিখেছেন···সমস্ত রকম প্রাথমিক কাজ শেষ করতে সময় লাগল এবং জুনের শেষের দিকে আমরা নৈনিতাল থেকে গাড়োয়াল পর্বতশ্রেণীর দিকে যাত্রা শুরু করলাম। ক্রমে একদিন আমরা যোশীমঠ এসে পৌছলাম। যোশীমঠ থেকে ধৌলীগঙ্গা ধরে আমরা এসে পৌছলাম রিনি গ্রামে। এই রিনি গ্রাম থেকে নন্দাদেবীর দিকে যাওয়ার জন্য আমরা ঋষি গঙ্গা ধরে অগ্রসর হতে লাগলাম।' শম্ভুদা একবার মুখ তুলে সবার দিকে এক পলক তাকিয়ে বললেন, 'এটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা হাতের ম্যাপটার দিকে তাকাই তাহলে জিনিসটা বুঝতে আরও সুবিধে হবে। যাই হোক, এরপর গ্রাহাম লিখছেন : কিন্তু ব্যাপারটা খুবই কঠিন ও বলা যায় ঐ অপরিচিত অঞ্চলের ওপর দিয়ে একদিন চলে আমাদের একটা অদ্ভুত ব্যাপারের জন্য থামতে হল। আমরা দেখলাম যে একটি উত্তর-প্রবাহিনী হিমবাহ ত্রিশূল থেকে কোন এক সময়ে নেমে এসেছিল। আজ সে হিমবাহ নেই, কিন্তু অন্ততঃ ৫০০ ফুটের যে মসৃণ গর্ত (trench) সেটি করে গেছে তা পার হবার কোন জায়গা নেই। চারদিক ভাল করে দেখার পর আমি মন্তব্য করতে বাধ্য হচ্ছি যে আসল পাহাড়ের কাছে পৌঁছুবার অনেক আগের এই অঞ্চলের এই ধরনের বাধাগুলি 'are among the most formidable obstacles to Himalayan exploration' এবং আমাদের ফিরতে হল।'

—'সে কি!' মাঝখান থেকে বলে উঠল শোভন, 'first রাউণ্ডেই নক্-আউট!'

—'তো ফির! তুম কেয়া শোচা থা, ছেলেকা হাতকা মোয়া,' বলে ফেলল কিশো।

—'আঃ থাম তো। চান্স পেলেই আরম্ভ করে দেবে!' অনিন্দ্য

চিরদিনের সিরিয়াস, শম্ভুদা, 'please carry on.'

শম্ভুদা আবার পড়তে শুরু করলেন : 'আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম, এবার ত্রুনাগিরি হিমবাহ ধরে। বহু কষ্ট স্বীকার করে একসময় ত্রুনাগিরির পায়ের কাছে এসে পৌঁছুলাম। কিন্তু এখানে এক নতুন ধরনের বিপদ আমাদের আঘাত করল। দেখা গেল কুলীদের রেশন নেই। যদিও আমি তাদের অন্ততঃ পনের দিনের রেশন দিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল তারা মাত্র পাঁচ দিনেই সব শেষ করে ফেলেছে। ফলে মাত্র তিনজন কুলী ও একজন গাইডকে রেখে বাকী সব কুলীদের আমি ফেরত পাঠাতে বাধ্য হলাম।'

—'ম্যানেজার, কোয়ার্টার-মাস্টার, এই অংশটার প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।' আবার শোভনের গলা।

—'দাঁড়াও, এইতো সবে শুরু,' একটু হেসে অনিমেষদা বলল, 'কত দেখবে, এ কি কম ঝামেলা!'

—'হ্যাঁ, জানিই তো ডাইলের মজা—' কথাটা শেষ করতে পারল না কালী, সবার হাসিতে ওর গলা চাপা পড়ে গেল।

—'শোন শোন, এরপর কি বলছেন গ্রাহাম,' একটু গলা তুলে বললেন শম্ভুদা, 'গ্রাহাম বলছেন, Nor was this all, for all these peaks are set with rocky aiguilles, all equally black and all equally impossible. I fear I may be taken to task for using the word 'impossible', which should not occur in the climber's dictioonary. Still, the powers of man are limited, whilst those of Nature one hardly so.'

—'Beautiful, চমৎকার বলেছেন,' সুকান্ত বলে উঠল।

—'আর এই কথাটাই তো আমাদের মনে থাকে না,' বলল অনিন্দ্য, 'হিমালয়ে যেতে হলে এই humble attitude থাকা একান্ত দরকার।'

—'আবার কি হল?' বলল কিণ্ডো।

শম্ভুদা বললেন, 'কি আবার হবে, আবার ফেরত। ফিরলেন, কিন্তু হতাশ হলেন না। দ্বিগুণ উৎসাহে আবার তিনি এগুলেন। এবার নদীর উত্তর তীর ধরে ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তৃতীয় দিনে দুরাশী পর্যন্ত পৌঁছুলেন। কিন্তু বিপদও এল সঙ্গে সঙ্গে। তীব্র ডাইরিয়ায় (Diarrhoea) আক্রান্ত হলেন অভিযাত্রীরা—'

—'ও, ডাক্তার কি বলে!' চেঁচিয়ে উঠল শোভন।

—'মাভৈ!' অভয়দানের ভঙ্গীতে হাত তুলে বলল ডাক্তার, 'আমি যতক্ষণ আছি হৈ-হৈ করে যাওয়া আর রৈ-রৈ করে চলা। কোন চিন্তা নেই।'

—'না, আর কোন চিন্তা নয়,' একগাল হেসে বলল শোভন, 'জলটা বড় ঠাণ্ডা হবে তো, তাই আর কি!'

—'আচ্ছা সে হবে খন,' হাসি মুখে বলল ডাক্তার, 'শম্ভুদা, please—'

শম্ভুদা বলতে লাগলেন, 'আরে আসল বিপদ তো ওটা নয়। আসল বিপদ তো হল কুলীদের নিয়ে। একের পর এক বাধার সম্মুখীন হয়ে কুলীরা সব ঘাবড়ে গেল। ওদের ধারণা শূলপানি রুদ্র তাদের এই অনধিকার-প্রবেশকে সুনজরে দেখছেন না। দেবতার ক্রোধকে এড়াতে প্রায় সব কুলিই তাদের ছেড়ে পালিয়ে গেল। তবুও অসমসাহসী গ্রাহাম এগুতে লাগলেন। চতুর্থ দিনে তাঁরা ঋষি ও রহমনি নালার সঙ্গমের কাছাকাছি এলেন। এ জায়গার দুর্গমতা এক কথায় বর্ণনার অতীত। গ্রাহাম লিখেছেন—In many places it was only by holding on for dear life and using rope that we could get on at all. অতএব অবস্থা যে কি তা বুঝতেই পারা যাচ্ছে। গ্রাহামের নিজের ভাষায়···at last we were completely brought to a standstill.' শম্ভুদা থামলেন।

—'তাহলে গোটা ব্যাপারটা কি দাঁড়াল?' বিস্ময়াভিভূত জিজ্ঞাসা

দীনেনের।

—'আর কি। Complete standstill!' শোভনের উত্তর।

—'তাহলে উপায়?'

—'উপায় নিরুপায়!' শোভনের সোজা উত্তর।

—'অবস্থা প্রায় তাই।' শম্ভুদা আবার দশনস্বরী ধরালেন, বললেন, 'অবশ্য এর পরেও গ্রাহাম রহমনি নালার উত্তরে দুনাগিরি ও চ্যাঙব্যাঙ শিখর আরোহণের চেষ্টা করেন। তার শিখর আরোহণের দাবী সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও এবং নন্দাদেবীর রক্ষাপ্রাচীর ভেদ করতে তিনি অসমর্থ হলেও, গ্রাহামই হিমালয়ে পর্বতারোহণের অন্যতম পথিকৃৎ। সেই তখনকার দিনে, যখন হিমালয় সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যই জানা ছিল না, গ্রাহামের অভিযান সত্যিই রোমাঞ্চকর ও বিস্ময়কর। স্বনামধন্য পর্বতারোহী ডাঃ লঙস্টাফ এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাকে তাই the most successful ever recorded in the annals of Himalayan Mountaineering বলেই উল্লেখ করেছেন।'

শম্ভুদা চুপ করলেন। আমরাও সবাই চুপ করে। সবার মনে এক স্মৃতি W. W. Graham. আজ থেকে ৯০ বছর আগে, যখন আজকের মত পর্বতারোহণের আধুনিক সরঞ্জাম ও শীতবস্ত্র কিছুই আবিষ্কৃত হয়নি, তখন সেই একেবারে অপরিচিত দুর্গমতার মধ্যে গ্রাহামের অভিযান—ভাবতেই অবাক লাগে। সেদিনের পূর্বসূরীদের মহান প্রচেষ্টা না থাকলে আজকের আমাদের পর্বতারোহণের কোন স্বপ্নই হয়ত সার্থক হত না।

—'একটু চা হলে হত না?' শম্ভুদাই আবার নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, চা চাই। চা ছাড়া কি জমে! অনিমেষদা—' কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই অনিমেষদার দিকে তাকাল সুশান্ত।

—'হ্যাঁ, এক রাউণ্ড চা হোক। কিন্তু কে আনবে?' সবার মুখের ওপর নজর বুলিয়ে কালীর দিকে থামল অনিমেষদা, 'কালী—'

—'জানি আমায় ধরবে। তোমার নজরে কি আর কেউ পড়ে না?' কালীর গলায় কিন্তু মোটেই বিরক্তি নেই।

—'কি নজরে দেখে বোঝ!' শোভনের মন্তব্য।

সবাই হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই শম্ভুদা বললেন, 'তাহলে পরবর্তী ইতিহাসের দিকে যাওয়া যাক—'

—'না।' শম্ভুদাকে থামতে না দিয়েই চেঁচিয়ে উঠল কালী, 'আমি চা নিয়ে না আসা পর্যন্ত কোন কথা যেন না হয়, অন্ততঃ ত্রিশূলের ইতিহাস নিয়ে। এই বলে গেলাম।'

চা আনতে চলে গেল কালী। শম্ভুদা বললেন, 'ঠিক আছে, আমরা ততক্ষণ বরং organisational দিক নিয়ে কথা বলি। বল কাজ কেমন এগুচ্ছে!'

—'কাজ তো এখনো প্রাথমিক স্তরে,' বললাম আমি, 'আমি বরঞ্চ কি ভাবে পুরো কাজের প্ল্যানটা টুকেছি তার কথা বলি।' সবার দিকে একটু দেখে নিয়ে বলতে লাগলাম আমি, 'সবাই জানো একটা এক্সপিডিশনের প্রথম ও প্রধান কাজ হল একটা প্ল্যান তৈরী করা। সমস্ত খুঁটিনাটি সহ একটা লিখিত প্ল্যান ছাড়া কোন কাজই হবে না। আর এই প্ল্যান তৈরীর ব্যাপারে Indian Mountaineering Foundation এর স্পষ্ট নির্দেশ আছে যে কি ভাবে ওটা তৈরী করতে হবে, কি কি ওর মধ্যে থাকবে। যেমন ধরো যে পাহাড়ে যাব তার ইতিহাস, তার সঠিক অবস্থান ও সম্ভাব্য রাস্তা। একটা রুট-ম্যাপও দিতে হবে। দিতে হবে সব অভিযাত্রীদের নাম, ধাম, বয়স, পর্বতারোহণের যোগ্যতাবলী। শেরপা নেওয়া হবে কিনা তাও দিতে হবে। আর বিশেষ করে যা দিতে হবে তা হলো বাজেট। আবার শুধু বাজেট দিলেই হবে না, কোন্ খাতে কত খরচ হবে এবং কি ভাবে হবে তার বিস্তারিত হিসেব দিতে হবে। যেমন অভিযানে মোট কতদিন লাগবে, তার জন্য কত খাদ্য-সামগ্রী লাগবে এমনকি কোন্ আইটেম কতটা লাগবে, তাও। মোট কত মাল হবে, সেটা বইবার জন্য কত কুলী লাগবে, এই কুলীদের

কোথা থেকে কি ভাবে যোগাড় করা হবে এবং এ বাবদে কত টাকা লাগবে সব দিতে হবে। এ ছাড়াও বিভিন্ন খাতে যেমন পাহাড়ে চড়ার জিনিসপত্র ও তাঁবুটাবু কোথা থেকে পাওয়া যাবে, রান্নার কি ব্যবস্থা হবে, কিভাবে কত ছবি তোলা হবে, ওষুধপত্রের কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে ইত্যাদি সমস্ত কিছুর পরিষ্কার ছবি ঐ প্ল্যানে থাকতে হবে। মানে এক-কথায় প্ল্যানটা পড়লে গোটা অভিযানটা চোখের সামনে ভেসে ওঠা চাই। আর এই প্ল্যানের ওপরেই সব কিছু। একটা ত্রুটিহীন প্ল্যানের ওপর অভিযানের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে।'

—'এ তো এক মহাভারত।' বলল হীরালাল।

—'ওঃ, tough job!' প্রবীর বলে ওঠে।

—'বিশেষ করে খাওয়ার জিনিসপত্রের হিসেব করতে করতে দম বেরিয়ে যায়।' বলল সুশান্ত।

হীরালাল বলে, 'কেন, মাসখানেকের খাওয়াদাওয়ার হিসেব এমন একটা কি কথা! বাড়িতে কি আমরা করি না?'

অনিমেষদা বলে ওঠে, 'ওহে বৎস, এটি তোমার সুখী পরিবার নয় যে আমরা দুই আমাদের দুই করে চটপট যোগে মিলিয়ে দিলুম। ঠাকুরের ইচ্ছেয় ক'টি হচ্ছে খেয়াল করেছ?'

—'তা কুলীটুলি নিয়ে ৫০ পেরিয়ে যাবে মনে হচ্ছে,' মুখে হাসি থাকলেও বেশ চিন্তিত গলায় বলল সুশান্ত।

—'তাছাড়া,' আমি বললাম, 'পাহাড়ে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে অনেক ঝামেলাও তো রয়েছে! এ তো এমন নয় যে একজন লোক এক বেলায় দুশো গ্রাম চালের ভাত খায়, অতএব একমাসে একবেলা করে খেলে তার মোট এত চাল লাগবে বলে একটা সোজা হিসেব করে দিলাম। পাহাড়ে যে পরিস্থিতি ও উচ্চতা অনুযায়ী পুরো খাদ্য-পরিকল্পনাটাই পালটে যায়। যেমন ধরো প্রথম কদিন আমরা হোটেলে মানে তৈরী খাবার কিনে খাব, তার এক হিসেব। তারপর ক'দিন ক'বেলা হয়ত ভাত হবে, ক'বেলা হয়ত খিচুড়ি হবে, তার এক হিসেব। আবার উচ্চতা

বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরো মেনু পালটে ফেলতে হবে। কিছু উচ্চতায় হয়ত দেখা যাবে ভাত খাবার ইচ্ছে থাকলেও ভাত রান্না করার মত অবস্থা নেই আবার আরো উচ্চতায় দেখা যাবে ভাত কেউ খেতেই পারছে না। তা ছাড়া উঁচুতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের খাওয়ার পরিমাণ যায় কমে। সেটা হিসেবে আনতে হবে। আবার সেই উচ্চতায় শরীরকে ঠিক রাখার জন্য এমন সব খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে অন্ততঃ Calorific valueটা বজায় থাকে। এ এক বিচ্ছিরি হিসেব, অবশ্য যথেষ্ট interesting ও বটে।'

—'ব্যাস বাবা ব্যাস,' হীরালাল বলে উঠল, 'একটা কথা বলে ফেলেছিলাম, যা একখানা উত্তর দিলি! তা বলছিলাম কি ঐ বিচ্ছিরি ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটার কতদূর কি হয়েছে?'

আমি হেসে বললাম, 'প্ল্যান হয়েছে এবং IMF ও West Bengal Govt.-কে পাঠিয়েও দেওয়া হয়েছে। আমরা আশা করছি খুব অল্প দিনের মধ্যেই এঁদের approval পেয়ে যাব।'

—'এবং তারপরই আরম্ভ হবে ব্যাপক যোগাযোগের কাজ।' আমাকে থামতে দেখেই জিতু বলল, 'বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, firms, ব্যক্তি-বিশেষ ও চারপাশের সবার সঙ্গেই যোগাযোগ করতে হবে। যত মানুষের কাছে আমরা যেতে পারব ততই আমরা সমর্থন পাব।'

—'অতএব বলা যায় আমাদের কাজ ভালভাবেই এগুচ্ছে,' বললাম আমি, 'এখন আমাদের যেটা করতে হবে তা হলো—'

—'কষ্ট করে এক কাপ চা খেতে হবে.' বীরদর্পে ঢুকল কালী, হাতে চায়ের কেটলি ও মাটির ভাঁড়।

সবাইকে চা দেওয়া হল। এই সুযোগে একটু আড়মোড়া ভেঙে নিল সবাই। শম্ভুদার পকেট থেকে আবার একটা দশনম্বরী প্যাকেট বেরল। হঠাৎ শোভন বলে উঠল. 'আচ্ছা ডাক্তার, এক কাপ চায়ে কত calorie থাকে বল তো?'

ডাক্তার অবাক, 'কেন, হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

—'কিছু না,' নিরীহের মত মুখ করে বলল শোভন, 'last মিটিং
ক'টাতে, total কত calorie শরীরে এল তার একটা হিসেব করতাম
আর কি।'

সবাই হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই শম্ভুদা সিগারেট ধরালেন, বললেন, 'তাহলে নন্দাদেবী-ত্রিশূল অঞ্চলের পরবর্তী ইতিহাস আমরা শুরু করতে পারি।'

সবাই প্রস্তুত হয়ে বসল। সবার দিকে একবার দেখে নিয়ে শম্ভুদা শুরু করলেন, 'নন্দা-ভাবনায় যার জীবন নন্দিত, ত্রিশূল-চিন্তায় যিনি সর্বাধিক চিন্তিত তিনি হলেন প্রখ্যাত পর্বতারোহী ডাঃ লঙস্টাফ। ককেশাশের উষর পর্বতমালায় রূপসী উষবার যুগলশৃঙ্গ তিনি দেখেছেন। কিন্তু গাড়োয়ালের নন্দাদেবীর যুগল শিখর তার কাছে আরো বেশী মনোহারিণী বলেই মনে হয়েছে। হিমালয়ের বর্ণবৈচিত্র্যময় আলোক সাধারণ রূপরাজ্যের তিনি একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী। ভুবনমনোমোহিনীর চিন্ময়ী রূপের আকর্ষণে ১৯০৫ সনে ডাঃ লঙস্টাফ নন্দাদেবীর উদ্দেশ্যে প্রথম এই অঞ্চলে আসেন। প্রথমে মিলাম উপত্যকার দিক থেকে তিনি রক্ষাপ্রাচীরের দিকে অগ্রসর হন। লোয়ান উপত্যকা ছেড়ে ৬ই জুন পাষাণপ্রাচীরের খুব কাছাকাছি পৌঁছে ডাঃ লঙস্টাফ লক্ষ্য করেন শঙ্কাভীত কুলীরা ভীষণ ভয়গ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আরো অগ্রসর হতে তারা দ্বিধাগ্রস্ত। কি জানি কখন হিমালয়-কন্যা হৈমবতীর তাপসীমূর্তি ভীষণা ভয়ঙ্করী কালীরূপে না রূপান্তরিত হয়। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তিনি ৮ই জুন রক্ষাপ্রাচীরের উপর আরোহণ করে সেখানে সে রাত অতিবাহিত করেন। পরের দিন নন্দাদেবীর ভাববিহ্বল রূপসুধায় অবগাহন করতে করতে তিনি নন্দাদেবীর পূর্ব শিখরের (২৪,৩৯০´) দক্ষিণ গিরিশিরা ধরে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হন। তিনিই প্রথম রক্ষাপ্রাচীরের শীর্ষে আরোহণ করে নন্দাদেবীর দক্ষিণ দিক ও অভ্যন্তর ভাগে দক্ষিণী নন্দাদেবী হিমবাহ অবলোকন করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এই উচ্চগিরিবর্ত্মকে তিনি 'নন্দাদেবী গিরিবর্ত্ম'

(১৯,১০০´) নামে অভিহিত করেন, যদিও সাধারণভাবে এটা 'ডাঃ লঙস্টাফ কল' নামেই পরিচিত। লোয়ান উপত্যকায় ফিরে তিনি নন্দাকোটের (২২,৫১০´) দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু বিপজ্জনক তুষার-পরিস্থিতির জন্য ২১,০০০ ফুট থেকেই তাঁকে ফিরে আসতে হয়।

পরে শেরিঙের সঙ্গে তিনি কুমাউর লিপুলেখ গিরিবর্ত্ম (১৬,৭৫০´) অতিক্রম করে তিব্বতে যান এবং শেলশেল গিরিবর্ত্ম (১৬,৩১০´) পার হয়ে গড়োয়ালে ফিরে আসেন। ধৌলির আদিম উপত্যকা-পথে তপোবন-কুয়াঁরী হয়ে অক্টোবর মাসের গোড়ায় তিনি ত্রিশূল-২ (২১,৯৫০´) ও মৃগথুনির (২২,৪৯০´) মধ্যবর্তী বিদালগোয়ার হিমবাহ অঞ্চলে যান। সেখান থেকেও তিনি নন্দাদেবীর রক্ষাপ্রাচীর ভেদ করে মূল ত্রিশূল-শিখরের দিকে যাবার কোন পথ পান না। গোয়লদামে ফিরে রবার্ট হ্যাসের কাছে তিনি ত্রিশূলের পশ্চিমে অবস্থিত এক উচ্চ গিরিবর্ত্মের সন্ধান পান। অতীতে সে পথে নাকি পাহাড়ীরা যাতায়াত করত।' শম্ভুদা একটানা বলে একটু থামতে চাইলেন, 'এই গেল তাঁর প্রথম বারের কথা।'

—'আচ্ছা যা হোক,' অবাক চোখে বলল অনিন্দ্য, 'এমনভাবে একটার পর একটা গিরিবর্ত্ম পার হয়ে চলেছেন যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়।'

—'তা ব্যাপারটা কতকটা তাই বটে। এঁরা যে standard-এর পর্বতারোহী ছিলেন তাতে এগুলো পার হওয়া এঁদের কাছে প্রায় ছেলেমানুষী ছিল।' বলল দীনেন।

সুশান্ত বলল, 'আসলে ব্যাপারটা শুধু তা নয়। এঁরা এক-একবার হিমালয়ে গিয়ে কতদিন ধরে একনাগাড়ে অভিযান চালিয়েছেন সেটা দেখ।'

—'এই তো এই প্রথম বারই লঙস্টাফ জুনে এলেন আর ফিরলেন সেই অক্টোবরে,' বলে উঠল দ্বিজেন, 'পাক্কা ৫ মাস। ভাবতে পার?'

—'আরে ওরা সব গুরু লোক—শুধুই চলত, থামতো না।' বলল

শোভন, 'কিন্তু শম্ভুদা, আপনি যে থেমে পড়লেন।'

—'কতদূর যেন বলেছিলাম?' হাতের কাগজগুলো গোছাতে গোছাতে জিজ্ঞেস করলেন শম্ভুদা।

—'ঐ তো—' অনিন্দ্য খেই ধরল, 'ঐ তো, ১৯০৫ সালে পুরো অঞ্চলটা একটা চক্কর দিয়ে লঙস্টাফ ফিরে গেলেন।'

—'হ্যাঁ, নন্দা-ভাবনা নিয়েই তিনি দেশে ফিরলেন। কিন্তু—' শম্ভুদা একটু থেমে দশনম্বরী বার করলেন। সবাই একটু গুছিয়ে বসল। সিগারেট ধরিয়ে, একটা প্রচণ্ড টান দিয়ে সবার দিকে একবার দেখে নিয়ে শম্ভুদা আবার ধরলেন, 'কিন্তু মাত্র দু বছর পরই নতুন উদ্যমে তিনি এলেন নন্দা-হিমালয়ের কোলে। এবার তাঁর সঙ্গী প্রখ্যাত পর্বতারোহী সি. জি. ব্রুস ও এ. এল. মাস্। রক্ষাপ্রাচীর ভেদ করা ছাড়া এবারের প্রধান উদ্দেশ্য ত্রিশূল শিখরে আরোহণ। গোয়ালদাম হয়ে কুকিনাখাল (ওয়ান গিরিবর্ত্ম) কুয়াঁরী গিরিপথে তাঁরা ১৯০৭ সনের ৫ই মে তপোবনে হাজির হন। মে মাসের গোড়ায় দুরন্ত গতিতে হিমবাহ গলে চলেছে। ঋষি-উপত্যকায় প্রবেশ তখন খুবই বিপজ্জনক। তাই ধৌলি ধরে তাঁরা এগিয়ে চলেন। দুনাগিরি-বাগিনী হিমবাহ অঞ্চল পরিদর্শন করে ২২শে মে ব্রুস ও লঙস্টাফ দুনাগিরি (২৩,১৮৪´) ও চ্যাঙব্যাঙ (২২,৫২০´) শিখরের মধ্যবর্তী এক উচ্চ গিরিবর্ত্ম (২০,১০০´) অতিক্রম করে রহমনী হিমবাহ-পথে নেমে আসেন ঋষি উপত্যকার ডিব্রুঘেটায়। ছায়া-নিবিড়, স্নিগ্ধ-সজল বন-উপবন পেরিয়ে লতা-গিরিপথে (১২,১০০´) পুনরায় ফিরে যান ধৌলি উপত্যকায়। ৩১ মে মাস্ ও লঙস্টাফ আবার প্রবেশ করেন ঋষি উপত্যকায়। ডিব্রুঘেটা ছাড়িয়ে তাঁরা ঋষিগঙ্গার অপর পারে 'বেতাতোলি' হিমবাহের কাছে আসেন। ইতিপূর্বে একমাত্র এ. পি. ডেভিস নামে জনৈক শিকারী এই বেথারতলি হিমবাহের কাছে এসেছিলেন। কুলিরা ডাঃ লঙস্টাফকে ডেভিসের শিবিরের স্থানও দেখায়। পথ এবার উপলাকীর্ণ। ত্রিশূল নালা ধরে ত্রিশূল হিমবাহের গ্রাবরেখার ওপর দিয়ে তাঁরা ৫ই জুন এক

জুনিপার ঝোপের কাছে স্থাপন করেন তাঁদের 'জুনিপার ক্যাম্প' (১৩,১০০´)। পরের দিন ভোর ছ'টায় যাত্রা করে হিমবাহের পার্শ্ব-গ্রাবরেখা ধরে তাঁরা সকলে ৮টার সময় ত্রিশূল নালার উৎস ত্রিশূল হিমবাহের তুষার-গহ্বরের (১৪,০০০´) কাছে পৌঁছান। বেলা আড়াইটের সময় গ্রাবরেখার শেষ ধাপে ডাঃ লঙস্টাফ তাঁর 'মোরেন ক্যাম্প' (১৬,৫০০´) স্থাপন করেন। ৭ই জুন ভোর ৫-৩০ মিনিটে শিবির ত্যাগ করে তাঁরা বেলা ২টোয় ২০,০৫০ ফুটে তৃতীয় শিবির স্থাপন করেন। তারপর শুরু হয় রুদ্রের প্রলয়তাণ্ডব। সারারাত ধরে চলে তীব্র হিমেল হাওয়া। তাঁবু বুঝি বা উড়ে যায়। সকালের দিকে হাওয়ার গতিবেগ কিছুটা মন্থর হলেও শিবির থেকে বার হওয়া সম্ভব হয় না। বিরামবিহীন বরফানি-হাওয়ার মধ্যে তাঁরা তাঁবুর মধ্যেই আটকা পড়ে থাকেন। রাত হয়ে ওঠে আরো ভয়ঙ্কর, আরো ভয়াবহ। ঝঞ্ঝা-ঝড়ের সঙ্গে শুরু হয় তুষারপাত। ত্রিশূলধারীর সংহার-মূর্তি দেখে অশুভ আশংকায় তিনি শঙ্কিত হন। রুদ্রের অভিশাপে মারাত্মক কোন বিপদের সম্মুখীন হবার আগেই তাঁরা ৯ই জুন সকালে ত্রিশূল জয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে নেমে আসেন 'জুনিপার ক্যাম্পে'। পরের দিন আকাশ নির্মল, নির্মেঘ। মাসের সঙ্গে পরামর্শ করে ডাঃ লঙস্টাফ পরবর্তী প্রচেষ্টার রূপরেখা তৈরী করে ফেলেন। ত্রিশূল জয়ের দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে ডাঃ লঙস্টাফ অবিচল প্রত্যয়ে অগ্রসর হন। ১১ই জুন সকাল ৬-২০ মিনিটে 'জুনিপার ক্যাম্প' ছেড়ে বেলা ১০-৩০ মিনিটে তাঁরা তাঁদের পূর্বতন 'মোরেন ক্যাম্পে' পৌঁছান। সেখান থেকে আরো কিছু ওপরে এক পাথরের আড়ালে তাঁরা শিবির (১৭,৪৫০´) স্থাপন করেন। ১২ জুনের আকাশ বেশ পরিষ্কার। নীল চন্দ্রাতপের নিচে ত্রিশূল শান্ত সমাহিত। মহাকালের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে ডাঃ লঙস্টাফ 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন' পণ করে এগিয়ে চলেন। ভোর ৫-৩০ মিনিটে শিবির ছেড়ে বেলা দশটায় তাঁরা পূর্ববর্তী ২০,০৫০ ফুটের শিবিরে পৌঁছান। মাত্র আধ ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু হয় আরোহণ। ঠিক দুপুরে তাঁরা ২১,০০০ ফুটে পৌঁছান।

দৃঢ় পদে, শান্ত চিত্তে, মন্থর গতিতে তাঁরা এগিয়ে চলেন ত্রিশূলের দিকে। শ্রান্তক্লান্ত লঙস্টাফ মাঝে মাঝে শুধু চেয়ে থাকেন দীপ্যমান তীক্ষ্ণ ত্রিশূলের দিকে। ঋত্বিকের কঠোর সাধনায় শান্ত সৌম্য শঙ্কর বুঝিবা তুষ্ট হন। বর্ষিত হয় স্বর্গের আশীর্বাদ। মন্ত্রমুগ্ধের মত তিনি এগিয়ে চলেন। বেলা চারটের সময় দেখেন আর এগোবার পথ নেই। হ্যাঁ, তিনি তখন ত্রিশূল-শীর্ষে। আনন্দধারায় প্লাবিত বিশ্বপ্রকৃতির বিস্ময়কর রূপ, সৌন্দর্য, আবেশে আবিষ্ট তাঁর 'হৃদয় নন্দন বন'। অলক-মেঘের আবরণে নন্দাদেবীর শুভ্র শিখর অবগুণ্ঠিতা। মুগ্ধ বিমুগ্ধ নয়নে তিনি সেই দিকে চেয়ে থাকেন। জানি না তখন তাঁর মনে কি ভাবের উদয় হয়েছিল। আধ ঘণ্টা পর শুরু হয় অবতরণের পালা। সন্ধ্যা ৭টায় তাঁরা ফিরে আসেন তাঁদের ১৭,৪৫০ ফুটের শিবিরে।

শম্ভুদা চুপ করলেন।

আমারও বুঝি মন্ত্রমুগ্ধ।

আমার চোখের সামনে ভাসে এক না-দেখা পর্বতারোহীর প্রোফাইল। যত তাকাই তাঁর দিকে, যত ভাবি তাঁর কথা, শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে আসে আমার মাথা। হিমালয়ে পর্বতারোহণের সেই উষাকালে, আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে, সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে সেই বিশাল পর্বতপ্রেমীর কথা বার বার স্মরণ করি। তাঁদের অকুতোভয় উদ্যম, তাঁদের দুর্বার প্রচেষ্টা, তাঁদের মৃত্যুঞ্জয়ী পণ আজ রাস্তা খুলে দিয়েছে আমাদের। আমাদের পর্বতারোহণের কোন স্বপ্নই বুঝি সার্থক হতো না তাঁদের এইসব স্বর্ণময় ইতিহাস ছাড়া।

ঘরের সবাই চুপ করে ছিল। মনে মনে কেউ বুঝি এখানে নেই। মুহূর্তে বুঝি সবাই পৌঁছে গেছে ত্রিশূল-শীর্ষে, লঙস্টাফের সঙ্গে সঙ্গে। স্বপ্নশিখর-শীর্ষে দণ্ডায়মান সেই বিরাট পুরুষের সেই মুহূর্তের অনুভবের অনুরণন করতে চাইছে সবাই তাদের ছোট্ট পর্বতপ্রেমের অধিকার নিয়ে।

শম্ভুদাই প্রথমে নীরবতা ভাঙলেন, 'কি, কি রকম বুঝছ?'

—'Fantastic,' যেন স্বপ্নের ঘোরে জবাব দিল অনিন্দ্য।

সুশান্তও বোধহয় এতক্ষণে ফিরে এল বাস্তবে। বলল, 'দশ ঘন্টায় ছ হাজার ফুট আরোহণ আর আড়াই ঘন্টায় সেই পথ নেমে আসা! ভাবতে পার?'

—'Really fantastic,' আবার বলল অনিন্দ্য।

—'হ্যাঁ,' শম্ভুদা বললেন, 'হিমালয়ে পর্বতারোহণের ইতিহাসে এটা একটা অভূতপূর্ব ঘটনা।'

আমি বললাম, 'রাশ ট্যাকৃটিক্স পদ্ধতি ছাড়াও লঙস্টাফের ত্রিশূল-জয় নানা কারণে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তাই না শম্ভুদা?'

ইতিমধ্যে শম্ভুদার হাতে একটা নতুন দশনম্বরী চলে এসেছে। আমেজে একটা টান দিয়ে শম্ভুদা বললেন, 'হ্যাঁ, ডাঃ লঙস্টাফ শুধুমাত্র স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় এবং তাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে শিখর-দেশ পর্যন্ত যান। তখনকার দিনে এটা একটা নজীর বলতে পার। ঋষি উপত্যকার রহস্যময়তা সম্বন্ধে সদাশঙ্কিত স্থানীয় লোকের মনে যে ভীতির ভাব ছিল তা এই সাফল্যে প্রভূত পরিমাণে কমতে থাকে। পর্বতাভিযানের মত দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় স্থানীয় লোকজনের সহায়তা যে একান্ত প্রয়োজন তার গুরুত্ব এই অভিযানেই প্রথম স্বীকৃত হয়। এই ত্রিশূলবিজয় তাই এক স্মরণীয় ঘটনা, বরণীয় সাফল্য।'

ছয়

ইতিমধ্যে কিছুদিন কেটে গেছে।

সাংগঠনিক কাজের জাল চতুর্দিকে ছড়ানো হয়েছে। এখন তা গুটিয়ে তোলার পালা। কিন্তু একটা একটা করে দিন চলে যাচ্ছে, কোন কাজটাই শেষ করা যাচ্ছে না।

দিল্লীর Indian Mountaineering Foundation-এর চিঠি এসেছে। আমাদের প্ল্যান তাঁদের মনঃপুত হয়েছে। অভিযানে যাবার অনুমতি পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে এককালীন অনুদানও। দিল্লীর

এই চিঠিখানা অশেষ মূল্যবান। এই সরকারী স্বীকৃতি ছাড়া কোন কাজই হবে না।

ইতিমধ্যে চূড়ান্তভাবে দল নির্বাচিত হয়েছে। প্রত্যেকের কর্মস্থলে সরকারী স্বীকৃতিপত্র সহ ছুটির আবেদন করা হল।

এদিকে শেরপা সংগ্রহ নিয়ে এক কাহিনী। ত্রিশূল ও ঋষিগঙ্গা অঞ্চলের অভিজ্ঞতাপুষ্ট কিছু শেরপার নাম আমরা যোগাড় করেছিলাম। ঐ অঞ্চল জানা থাকলে তাঁরা অনেক বেশী সহায়ক হবেন বলেই আমাদের ধারণা। যোগাযোগ করা হল দার্জিলিং-এ। দার্জিলিং অঞ্চলেই আমাদের দেশের বেশীর ভাগ শেরপারা থাকেন। কিন্তু ক্রমাগত চিঠি-চালাচালি করেও জানা গেল না কাকে কাকে পাওয়া যাবে, তাঁরা আদৌ কোনদিন ঐ দিকে গেছেন কি না। মাস তিনেক পরেও জবাব পাওয়া গেল—চিন্তা নেই, শেরপা পাওয়া যাবে, তবে কাকে পাওয়া যাবে বলা যাচ্ছে না। এ তো আচ্ছা গাড্ডায় পড়া গেল!

পর্বতারোহণের সাজসরঞ্জাম নিয়েও চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা চলছে। ঠিক ছিল, দার্জিলিং-এর হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্স্টিটিউট থেকেই সব মাল নেওয়া হবে। কিন্তু ওঁরা কখনও লিখছেন এতগুলো স্লিপিং-ব্যাগ দেওয়া যাবে না, আবার বলছেন লিস্টমত তাঁবু যোগান দেওয়া মুশকিল, কখনও বা লিখছেন এত রুকস্যাক নেই। কোন ব্যাপারটাই ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না। অগত্যা ঠিক হল কালীকে পাঠানো হবে দার্জিলিং। ও একেবারে শেরপা ও মাউন্টেনিয়ারিং ইন্স্টিটিউটের সঙ্গে কথা বলে দেখেশুনে সব ঠিক করে আসবে।

এদিকে আমাদের মেডিকেল অফিসারও এক গণ্ডগোল বাধিয়ে বসে আছেন। অভিযানের ডাক্তার বীরেন দাস এক উৎসাহী যুবক। এ অভিযানে যাওয়া নিয়ে যেদিন থেকে ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে সে-দিন থেকেই ওর মধ্যে বিপুল উৎসাহ লক্ষ্য করেছি। পাতলা, ছিপছিপে, ছোটখাটো চেহারার মানুষ। পর্বতারোহণের কোন অভিজ্ঞতা নেই। বলতে গেলে এবারেই প্রথম পাহাড়ে যাবে। ওর সুন্দর কথাবার্তা

থেকেই ওর মনোভাবের কিছু পরিচয় আমি পেয়েছিলাম, আর তখনই মনে হয়েছিল ত্রিশূল-অভিযানের উপযুক্ত মেডিকেল অফিসার আমরা পেয়েছি। কিন্তু পাহাড়ে পৌঁছুবার আগেই যে ও আমাদের এমন বিপদে ফেলবে কে জানত!

পাহাড় সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ বলে প্রথম দিন ওকে একটা পর্বত-অভিযানে ডাক্তারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে দু'চার কথা বলেছিলাম। ডোজটা বোধ হয় একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল। সাতদিনের মধ্যেই শুনলাম ও শম্ভুদার সাহায্যে দুনিয়ায় পাহাড়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত যত বই আছে সব পড়ে ফেলেছে এবং তার পরই বীরবিক্রমে একটার পর একটা নির্দেশ জারি করতে শুরু করেছে।

প্রথমেই ডাক্তার সবাইকে জানিয়ে দিল অমুক তারিখের মধ্যে সবাইকে তার কাছে মেডিকেল টেস্ট দিতে হবে। তথাস্তু। পরীক্ষান্তে দেখা গেল তথাকথিত নিক্তি-মাপা আদর্শ পর্বতারোহী হবার দৈহিক মানদণ্ড আমরা প্রায় কেউই পার হতে পারিনি। বাস্, ডাক্তারের মুখভার। একটু হেসে বোধহয় বলেছিলাম, 'ভায়া, ওরকম ভাবে দেখলে যে তুমিও আউট হয়ে যাবে।' কিন্তু দেখলাম এ কথাতে তার মুখের কোনই পরিবর্তন হল না। তারপর সবাই মিলে বুঝিয়ে-টুঝিয়ে কিছু গ্রেস মার্কের ব্যবস্থা করা হল। অতঃপর দেখা গেল একে একে সবাই পাস। যাক বাবা, বাঁচা গেল। নাঃ, কই আর গেল! কদিন পরেই নতুন নির্দেশ—টি.এ. বি. সি. ইঞ্জেকশন ও বসন্তের টিকা তো সবাইকে নিতে হবেই, তার সঙ্গে 'টিটেনাস টক্সিন' ইঞ্জেকশনও সবাইকে নিতে হবে। এ তো আচ্ছা গাড্ডায় পড়া গেল! আরে বাবা, এত সব ইঞ্জেকশন-টিঞ্জেকশন নিতে নিতে সুস্থ শরীরটাই তো অসুস্থ হয়ে যাবে! কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। বোঝালাম, 'দেখ, এত দরকার নেই, ঐ টিটেনাস টক্সিনটা বোধ হয় না নিলেও চলে।' তা ডাক্তার সাফ জবাব দিলে, 'শোন লিডার সাব, তুমি অভিযানের নেতা, কই বাত নেহি, কিন্তু এটা আমার ডিপার্টমেন্ট। এখানে আমি একমেবাদ্বিতীয়ম্ ফুয়েরার, যা বলব মানতে হবে।'

কর্তব্য থেকে এক চুলও হটায় তাকে কার সাধ্য! ঠিক হ্যায় ফুয়েরার, তোমার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু এতেও কি শান্তি আছে! ক্রমাগত ওষুধের লিস্ট করে যাচ্ছে ডাক্তার, এবং ক্রমাগত চিঠিতে, দরকার হলে ফোনে, আর দেখা হলেই ফায়ারিং: 'কি হলো বিজয়, ঐ ওষুধটা তো এখনও এল না,' 'আরে এই ইঞ্জেকশনগুলো যোগাড় করতেই হবে, না হলে চলবে না,' কিংবা 'দেখ পনেরো দিন হয়ে গেল ব্লাড-ট্রান্সমিশনের অ্যাপারেটাসগুলোর জন্য আবেদন করেছি, এখনও কোন সাড়া নেই; আর অপেক্ষা না করে ওগুলো কিনে ফেলা দরকার' ইত্যাদি ইত্যাদি। আরে এ তো জ্বালিয়ে মারলে! কত দিক দেখব বল তো, ও যা হয় নিজেই কর বাপু! অবশ্য ডাক্তারই অক্লান্ত খেটে করল সব। নিজের চাকরি, দৈনন্দিন কাজের হাজার ঝামেলার মাঝেও সে ঠিক সময় বার করে নিল। প্রতিদিন অজস্র মেডিকেল জার্নাল ঘাঁটা, আর কি কি ওষুধ লাগবে, কতটা করে লাগবে তার হিসেব কষা, লিস্ট করা, বিভিন্ন ওষুধ-কোম্পানীতে সেই সব ওষুধের জন্য আবেদনপত্র লেখা, কোম্পানীর ডাক অনুযায়ী তাদের অফিস থেকে ওষুধ সংগ্রহ করা ইত্যাদি অসংখ্য কাজ ডাক্তার নির্বিকার চিত্তে করে যেতে লাগল।

একটা অভিযানে ওষুধ লাগে অজস্র রকমের। হয়ত এর অনেক-গুলোই কাজে লাগবে না, কিন্তু কখন কার কোন্ ওষুধটা দরকার পড়বে তার কোন ঠিক নেই। তাই হাতের কাছে সম্ভাব্য সব-কিছুই তৈরী রাখতে হবে। উলঙ্গ প্রকৃতির মাঝে দাঁড়িয়ে নিজেকে যেন অসহায় মনে না হয়। সামান্য একটা ওষুধের জন্য যেন অভিযানকে কোন বিরাট বাধার সামনে পড়তে না হয়। তাই প্রত্যেক পর্বতাভিযানে মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক যার সামগ্রিক দায়িত্ব অভি-যানের ডাক্তারের। আমরা খুশী যে আমাদের ডাক্তার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

এ তো গেল না হয় চিকিৎসা-বিভাগ। কিন্তু দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপারটা—, রেশন-বিভাগ! ওটাকে তো কোন শর্তেই উপেক্ষা করা

চলবে না! সর্বাগ্রে মনে রাখা দরকার পর্বতারোহণ এক কঠিন শ্রমসাধ্য ব্যাপার। প্রত্যেক আরোহীকে উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করা হল অভিযান-সাফল্যের প্রাথমিক শর্ত। আরো যেটা মনে রাখতে হবে তা হল—জায়গাটা পাহাড়। নির্জন, উষর-প্রকৃতি। এমন নয় যে বললাম—ওরে, এটা তো নেই, যা তো চট করে নিয়ে আয়। দু-চার মিনিট বা ঘন্টা কেন, দু-চার দিনেও তা যোগাড় করে আনা সম্ভব হবে না। তাই প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির ওপর অসম্ভব নজর দিতে হচ্ছে। কোন জিনিসটাই, তা এই মুহূর্তে যত অকিঞ্চিৎকরই মনে হোক না কেন, যেন বাদ না যায়, আবার কোন জিনিসটাই যেন বেশী না হয়। যেমন ধরা যাক—নুনের কথা। সামান্য জিনিস, কিন্তু অসামান্য উপযোগিতা। কোন রকমে বাদ পড়ে গেলে, বাস্, অভিযানও বাদ। আবার এক কিলো নুন বেশী নিয়ে গেলে, হয়ত কেনা-দাম কিছুই নয়, কিন্তু কুলী-ভাড়া দিয়ে পাহাড়ে পৌঁছনোর পর তার দাম পড়ে যাবে সোনার মত। তাই বারে বারে লিস্ট করা, তাকে পরীক্ষা করা এবং আবার লিস্ট করা।

এই গোটা ব্যাপারটার পুরো দায়িত্ব কোয়ার্টার-মাস্টার সুশান্ত মজুমদারের। ওর ডান হাত হল প্রবীর, সে ওকে সর্বতোভাবে সাহায্য করছে, আর লিডার হিসেবে আমাকে ওর বাঁ হাত বলতে পারি। দিনের পর দিন আমাদের তিনজনের বৈঠক হতে লাগল, লিস্ট হতে লাগল ততোধিক। দিনে দিনে লিস্টের দৈর্ঘ্য বাড়তে লাগল, বাড়তে লাগল আইটেমের সংখ্যা। শত শত আইটেম, হাজার হাজার হিসেব আর লক্ষ লক্ষ ভুল। অথৈ সমুদ্র যেন। খাবি খেতে লাগলাম আমরা তিনজন। যত দেখি তত লিস্ট বাড়ে, যত লিস্ট বাড়ে তত দেখি। আর এই খাবারদাবার তৈরী করার জন্য জিনিসপত্রও লাগবে অসংখ্য। শুরু হল আমাদের প্রাণান্ত চেষ্টা আর চেষ্টাকে নিখুঁত করার প্রচেষ্টা! 'আচ্ছা সুশান্ত, প্রেসার-কুকার তো লিখেছ, ওর নিচে ব্র্যাকেটে সিটিগুলোর কথাটাও উল্লেখ করে রাখ। কোন কারণে ভুল হয়ে গেলেই হয়েছে আর কি!' 'এই রে, বিজয়, প্রেসার-কুকারের স্পেয়ার রাবার গাসকেট

লেখা হয়নি, একটা বিগড়োলে কি হবে বলুন তো?' 'আচ্ছা বিজয়দা, আপনি তো খুব বললেন স্টোভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাক, সমস্ত স্পেয়ার পার্টস নেওয়া হয়েছে?' 'হ্যাঁ, আমি তো স্পেয়ার নোজল্, ওয়াশার, এমন কি পিন ও তেল ঢালবার জন্য ফানেল পর্যন্ত লিখে দিয়েছি।' 'হ্যাঁ, সবই তো দিয়েছেন, কিন্তু নোংরা তেলে যে মুখ জ্যাম হয়ে যাবে, ছাঁকবার জন্য কিছু পরিষ্কার কাপড়ের কথা উল্লেখ করে রাখুন। নইলে দেখা যাবে ঐ জন্যই শেষে সব পণ্ড।' 'উঃ এত কি আর মনে করা যায়! ঐ যাঃ, মনে পড়েছে এই দিকে, গুচ্ছের টিন্‌ড্ ফুড তো নেওয়া হচ্ছে, টিন-কাটার নিয়েছ? কাটবে কি দিয়ে?' 'ওঃ হ্যাঁ, তাই তো।' 'ওঃ হ্যাঁ, তাই তো নয়, মনে থাকতে থাকতে এক্ষুণি লেখ, অন্ততঃ ছ'টা টিন-কাটার। সব ক্যাম্পে অন্ততঃ একটা করে থাকা চাই, আর গোটা দুই স্পেয়ার।' 'আচ্ছা, স্টোভ ভাল মতন ধরানোর জন্য কিছু স্পিরিটও তো চাই?' 'লেখ, লেখ, আরো কত জিনিস বার হবে দেখ না। আচ্ছ', হাতা, খুন্তি, চামচ তো লেখা হয়েছে, চা-ছাঁকনি লিখেছ?' 'ঐ যাঃ, ওটা তো মনে পড়েনি।'

শুধু একটাই নয়। এমনি আরো অসংখ্য জিনিস প্রতিদিন বাড়তে লাগল। এর প্রত্যেকটাই অত্যন্ত জরুরী, কোনটাই ভুললে চলবে না। তাই আমাদের এত সাবধানতা!

এ ছাড়া আছে প্রত্যেকটি খাদ্যের পরিমাণ নিয়ে চুলচেরা বিচার। এটা দেখা গেছে উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরোহীদের খাদ্য-রুচির বিরাট পরিবর্তন হতে থাকে। ২০,০০০ ফুটের ওপরে অনেকেই মাংস, পেঁয়াজ ইত্যাদি একদম খেতে পারেন না। মিষ্টি জিনিস দেখা গেছে সব উচ্চতায় ভাল চলে। আবার অনেকে বেশী উচ্চতায় গিয়ে শক্ত জিনিস খেতে পারেন না। ফুড-প্ল্যানিং-এর সময় এ সবই খেয়াল রাখতে হবে। কোন্ উচ্চতায় কোন্ ক্যাম্পে কে কতদিন থাকবেন তা এখনই ঠিক করতে হবে এবং সে অনুযায়ী কোন্ কোন্ খাদ্য কতটা পরিমাণে লাগবে তা ঠিক করতে হবে। হয়ত পাহাড়ে গিয়ে দেখা যাবে অনিবার্য কারণে

এর অনেকটাই পরিবর্তন করতে হচ্ছে, তবু যতদূর পারা যায় সব-কিছুই পূর্বনির্ধারিত ভাবে চালানোর চেষ্টা করতে হবে।

সর্বোপরি আছে সব খাবার-দাবার ও সে সব রান্না করার জিনিস-পত্রের দাম ধরা ও ওজন ঠিক করা। কারণ ওজনের ওপরেই কুলীর সংখ্যা নির্ভর করবে। 'দেখেছ,' হঠাৎ সুশান্ত চেঁচিয়ে উঠল, 'গোড়াতেই গলদ। সব-কিছুর ওজনের হিসেব তো করছি। কিন্তু ওখানে ওজনটা করা হবে কি দিয়ে? স্প্রিং ব্যালান্স লেখা হয়েছে?' আমি বললাম, 'হোক গোড়ায় গলদ, তবু শেষ রক্ষা হলেই হবে।'

এদিকে সরকারী দপ্তরে যোগাযোগ রাখা এক ঝকমারি কাজ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ ধরনের অভিযানকে এককালীন অনুদান দিয়ে সাহায্য করেন। এ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, যেমন পশুপালন, ডেয়ারী, বন ইত্যাদি তাঁদের উৎপাদন দিয়ে সাহায্য করেন। সেজন্য রাইটার্স বিভিন্ন দপ্তরে ধর্না দেওয়া চলছেই।

কিন্তু বিপাকে ফেললেন উত্তরপ্রদেশ সরকার। মোটামুটি ভাবে জানা ছিল যে উত্তরপ্রদেশের মধ্যে ২০,০০০ ফুট বা ততোধিক উঁচু কোন পাহাড়ে অভিযান করলে বিনামূল্যে বাস-রাস্তায় যাতায়াত এবং / অথবা হাজার দুই টাকা দিয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকার সাহায্য করেন। কিন্তু প্রথম যোগাযোগের পরই লক্ষ্ণৌর সদর-দপ্তর থেকে জবাব পেলাম, দুঃখিত; বাসের কোন ব্যবস্থা করা যাবে না, তবে অনুদানের বিষয় বিবেচনা করা হচ্ছে। বুঝি, তেল নিয়ে বিশ্বের সবাই যখন একটা চুক্তিতে আসতে ফেল মেরেছে তখন লক্ষ্ণৌ সরকার আর কি করবেন! তবু যা হোক, অনুদানের ব্যাপারে এক্ষুণি সবুজ না হলেও অন্ততঃ হলুদ আলো দেখা গেছে। এদিকে দিনও আর বেশী নেই। ক্রমাগত চিঠিতে তাগাদা দিতে লাগলাম। ওঁদের বোধহয় বিরক্তিই ধরে গেল। দেখি উত্তর আসাই বন্ধ। এই সেরেছে! বাজেটে যে বেশ ভাল একটা অঙ্ক ধরে রেখেছি ওঁদের নামে। তাহলে উপায়? উপায় সুশান্ত। আর কে যাবে, সবাই ব্যস্ত। 'ও সুশান্ত, আর তো সময় নেই, প্লিজ, তুমি লক্ষ্ণৌ রওনা

হয়ে পড়। ওঁদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বল। টাকা চাই, না হলে নির্ঘাত মারা পড়ে যাব। দেখ, দেখ।'

এমনি ভাবে প্রত্যেকটি ছেলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কেউবা মার্কেটিং করছে। কেউবা প্যাকিং-এর ব্যবস্থা নিয়ে গলদঘর্ম। 'ও দ্বিজেন, তুমি চট্ করে কলকাতা চলে যাও, তিনটে কোম্পানী থেকে সাহায্যের চিঠি এসেছে, ও মালগুলি এক্ষুণি আনা দরকার।' 'সদা, আরে চাকরি তো সবারই আছে, ও ভাবলে এখন চলবে ? তুই প্লিজ একবার দুর্গাপুরে চলে যা। দীনেন ওদের অফিস-ক্যান্টিন থেকে কিছু চাল ডাল সংগ্রহ করেছে, ওগুলো নিয়ে আসা দরকার।' 'যাচ্চলে, পলিথিন শীট-এর রোলটা আনবে কে ? ঠিক আছে, বার্ণপুরে খবর পাঠাও। জিতু গিয়ে নিয়ে আসুক ওটা।' প্রবীর হঠাৎ চেঁচামেচি জুড়ে দিলে, 'বা বিজয়দা, বেশ, সুশান্তকে পাঠিয়ে দিলে লক্ষ্ণৌ আর ও দিব্যি সব দায় আমার ওপর চাপিয়ে চলে গেল। গুচ্ছের রেশন কিনতে হবে, বাসনপত্র কিনতে হবে, কলকাতা যাওয়া দরকার, অন্ততঃ একজন কাউকে সঙ্গে দাও।' 'আচ্ছা মুশকিল, ছেলে কি আমি ট্যাঁকে গুঁজে রেখেছি ?' 'ও অনিমেষদা, তুমি যাও না ;. আচ্ছা না, অনিমেষদা ম্যানেজার, প্রতিদিন চারদিক থেকে টাকা জমা পড়ছে। অনিমেষদার এ মুহূর্তে হেডকোয়ার্টার ছাড়া চলবে না। এক কাজ কর পিকে, তুমি অনিন্দ্যকে সঙ্গে নিয়ে যাও আর কলকাতায় হীরালালকে তো পাবেই।'

কাজ, কাজ আর কাজ। অসংখ্য কাজ, অসম্ভব দৌড়োদৌড়ি। এটা এখনও আনা হল না। ওটা এখনও এসে পৌছল না। সেটা এখনও যোগাড়ই হল না। প্রত্যেকের ঘাম ছুটে যাবার দাখিল। এরই মধ্যে একটু সময় করে প্রায় প্রতিদিন রাতে ক্লাবঘরে মিলিত হচ্ছি আমরা। প্রত্যেকের কাজের গতি বুঝে নিতে, সমস্ত কাজের হিসেবকে এক জায়গায় করতে, সমস্ত কাজকে একমুখী করতে, আগামীকাল সম্বন্ধে প্ল্যান ছকে নিতে।

সারাদিনের ছোটাছুটির পর, যারা অন্ততঃ কাছাকাছি থাকে, এসে

জোটে ক্লাবে। দেখতে দেখতে রাত হয়ে যায় অনেক। নানারকম কথা, আলোচনা, সিদ্ধান্ত আর হাজারটা চিঠি আর হিসেবপত্তরের মধ্যে ডুবে যাই আমরা। হঠাৎ দেখি, শান্তি একগাদা হাতুড়ি, করাত, ছুরি, পেরেক ইত্যাদি ঘাড়ে করে নিয়ে ঢুকছে। শান্তি দত্ত এ অভিযানে যাচ্ছে না, কিন্তু ওকে ছাড়া সব অভিযানই বোধ হয় অচল। অসম্ভব খাটতে পারে ও। যে সব দৈহিক পরিশ্রমের কাজ আমরা এড়িয়ে যেতে চাই, ও সাগ্রহে এগিয়ে এসে ঘাড়ে নিয়ে নেয় সেগুলো। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিরে, কি হবে এগুলোয় ?'

—'তোমার পিণ্ডি চটকানোর ব্যবস্থা করা হবে,' দুম করে কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল শান্তি।

—'সর্বনাশ, ওকে চটাবেন না,' বলল পিকে, 'দেখছেন না গর্মে আছে।'

—'তা তো দেখলাম। কিন্তু ব্যাপারটা কি ?'

—'ও বলছে কেউ কোন কাজ করছে না, সবাই নাকি মুখেই টপাটপ রাজাটাজা মেরে দিচ্ছে। আর তাই ও ঠিক করেছে আজ রাতের মধ্যেই প্রত্যেকটা প্যাকিং বাক্সকে কেটেকুটে ঠিকঠাক করে ফেলবে। কেউ ওকে সাহায্য না করল তো ওর নাকি বয়েই যাবে।' যথেষ্ট গম্ভীর হয়ে হাসি চাপতে চেষ্টা করল প্রবীর।

—'সে ঠিক আছে, কিন্তু ওর সঙ্গে কাউকে দাও, ও একা করবে কেন ?'

—'আরে না না, ভাববেন না, ওর সঙ্গে দুলাল আছে। ও ওরকম বলে। আসলে শান্তি এখন একমনে কাজ করবে। ঐ সমস্ত প্যাকিং বাক্স ঠিক না করা পর্যন্ত ও থামবে না। ওকে চটাবেন না, তাহলেই কেলেঙ্কারি করে ছাড়বে।' হাসি মুখে শেষ করে প্রবীর।

এমনি ভাবে হাতে হাতে, উষ্ণ ভাব বিনিময়ে, হৃদয়ে উত্তাপের লেনাদেনায় কাজ চলল এগিয়ে।

আর সমস্ত কাজের ওপরে, সমস্ত কাজকে ঘিরে আছে সাংগঠনিক

কাজ। যার মধ্যে একটা বিরাট কাজ হল চিঠি লেখা আর চিঠির উত্তর দেওয়া। প্রতিদিন অজস্র চিঠি লিখতে হচ্ছে। বহু কোম্পানীকে জিনিস-পত্রের জন্য, বহু প্রতিষ্ঠানকে সাহায্যের জন্য, বহু মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাবকে তাদের উপদেশ ও শুভেচ্ছার জন্য। চিত্তরঞ্জনের বহু প্রতিষ্ঠান প্রতিদিন ডেকে পাঠান। তাঁরা কৌতূহলী অভিযান সম্পর্কে। সব জায়গাতেই প্রথম থেকে বুঝিয়ে বলতে হচ্ছে সব। প্রচার এ সব ব্যাপারে মস্ত হাতিয়ার। তার জন্যও সংবাদপত্র ও আকাশবাণীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে।

আমাদের অনেক সদস্যই চিত্তরঞ্জন থেকে দূরে থাকেন। তাঁদের সঙ্গেও যোগাযোগের প্রধান উপায় চিঠি লেখা। প্রত্যেকের ছুটির ব্যবস্থা করা। প্রত্যেককে জানিয়ে দেওয়া কি কি জিনিস তাদের নিজেদের নিতে হবে। এমনতরো আরো কত কি।

গোটা ব্যাপারটা এক রাজসূয় যজ্ঞ। যদি এমন হত যে আমাদের প্রচুর টাকা আছে বা বাজেটের পুরো টাকাটাই কোন জায়গা থেকে একসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে, তা হলে এত দৌড়োদৌড়ির প্রশ্ন উঠত না। অনেক ঠাণ্ডা মাথায় সব-কিছু করা যেত। ভুলের সংখ্যা হত অনেক কম। কিন্তু আমাদের অবস্থা সেই নুন আনতে পান্তা ফুরোবার মত। সাধ্য নেই কানাকড়িও, সাধ আছে অনেক। ক্ষমতা নেই এক পয়সার, ক্ষ্যাপামি আছে পুরো।

তবু এই কর্মযজ্ঞের অক্লান্ত ধারায় দিনে দিনে মুহূর্তে মুহূর্তে একদিনের স্বপ্ন আজ বাস্তবের মুখোমুখি। অনেক অসম্পূর্ণতা নিয়েও, অনেক অপূর্ণতা সত্ত্বেও আমরা স্থিরসঙ্কল্প—ত্রিশূল আমাদের, আমরা ত্রিশূলের।

সাত

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৭৪।

হুড়মুড় করে যেন দিনটা এসে পড়ল।

গত কয়েকটা দিন কোথা দিয়ে কেটেছে, কি ভাবে কেটেছে, জানা নেই আমাদের। যত দিন এগিয়ে এসেছে অসংখ্য নতুন কাজ উপস্থিত হয়েছে, সংখ্যাতীত ভুল বেরিয়েছে পুরনো কাজে।

২৯শে আগস্ট প্রথম অগ্রগামী দলে রওনা হল ট্রান্সপোর্ট ইনচার্জ দ্বিজেন রায় ও অনিন্দ্য সেন। তাদের অনেক কাজ। প্রথমে ঋষিকেশে গিয়ে মূল দলের জন্য বাসের ব্যবস্থা করবে ওরা। তারপর এগিয়ে যাবে যোশীমঠে। ওখান থেকে কুলীর সর্দারের সঙ্গে যোগাযোগ করে কুলীর ব্যবস্থা করবে। হাই-অলটিচুড কুলীও যোগাড় করবে ওরা। সরকারী রেশনের কিছু জিনিস—যেমন চাল, চিনি, আটা ইত্যাদি যোশীমঠ থেকে নেওয়া হবে। বিশেষ করে কেরোসিন তেল। ট্রেনে বয়ে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ বলে কেরোসিন পুরোটাই যোশীমঠ থেকে যোগাড় করতে হবে। স্থানীয় জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করে এসবের ব্যবস্থাও ওদের করতে হবে। তাছাড়া মূল দলের জন্য যোশীমঠে একটি ভাল থাকার জায়গা ও যোশীমঠ থেকে লতাগ্রাম পর্যন্ত যাওয়ার জন্য ট্রাকের ব্যবস্থাও ওদের করে রাখতে হবে। হাসিমুখে বলিষ্ঠ কাঁধে শত কাজের দায়িত্ব নিয়ে ওরা রওনা হল। ওদের স্থির বিশ্বাস সব কাজই ওরা ঠিকমত করে রাখবে, মূল দলকে যেন এতটুকু সময় নষ্ট করতে না হয়।

গতকাল, ১লা সেপ্টেম্বর রওনা হল দ্বিতীয় অগ্রগামী দল—কালীসাধন ব্যানার্জী ও শোভন গুপ্ত। আমাদের দলের দুই কনিষ্ঠ পর্বতারোহী। চোখে ওদের স্বপ্ন, পর্বতের উত্তুঙ্গ শিখরে উঠবে ওরা, মুখে ওদের দৃঢ় প্রত্যয়, অভিযানের সাফল্যের জন্য শেষ নিঃশ্বাসটুকু ব্যয় করবে ওরা। ইয়ারকি মারার সময়, আড্ডা দেওয়ার সময় যেমন ওরা জুটি, বিরাট কাজের দায়িত্ব নেওয়ার সময়ও হাসিমুখে জোড়া কাঁধ এগিয়ে দিল কালী আর শোভন।

ওরা দুজন গেল দার্জিলিং। গতবার দার্জিলিং ঘুরে কালী ইনস্টিটিউট থেকে মালপত্রের ব্যবস্থা যাহোক একটা করেছিল, কিন্তু শেরপা অ্যাসোসিয়েশন থেকে কোন নামই ওকে দিতে পারেনি। শেরপা

সম্বন্ধে এখনও অন্ধকারেই আছি আমরা। ঠিক হল কালী আর শোভন দার্জিলিং থেকে সব ইকুইপমেন্ট বা মালপত্র সংগ্রহ করবে এবং যতদূর সম্ভব আস্থাভাজন শেরপা সঙ্গে নিয়ে শিলিগুড়ি-লক্ষ্ণৌ পথে গিয়ে ৩রা সেপ্টেম্বর লক্ষ্ণৌতে মূল দলের সঙ্গে যোগ দেবে, না হলে হরিদ্বারে মিলিত হবে।

ইতিমধ্যে সব জিনিসপত্র কেন্দ্রীভূত হয়েছে ক্লাবরুমে। প্যাকিং করা শুরু হল। সেও এক এলাহি ব্যাপার। খাবারদাবার সব জিনিসকেই পলিথিন দিয়ে মুড়ে সীল করে নেওয়া হচ্ছে। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচানোর এটাই একমাত্র রাস্তা। তাছাড়া কোন্ বাসে কি থাকছে তারও পরিষ্কার লিস্ট থাকা দরকার। কোন একটা জিনিস খুঁজতে গিয়ে যেন সব বাক্স ওল্টাতে না হয়। প্রত্যেকটি বাক্সের লিস্ট করে এক কপি বাক্সে, এক কপি কোয়ার্টার-মাস্টারের ফাইলে আর এক কপি লিডারের ফাইলে রাখা হচ্ছে। আর একটা ব্যাপার হল প্রত্যেকটি প্যাকিংয়েই যেন প্রায় সব মাল কিছু কিছু থাকে। কোন কারণে যদি কোন বাক্স খোয়া যায় বা পড়ে যায়, তবে কিছু মাল পড়লেও কোন একটি জিনিস একেবারেই নেই এ অবস্থা না হয়।

আজ ২রা। সমস্ত দিক দিয়েই অভিযান সম্পূর্ণ তৈরী, প্রস্তুত পাহাড়ের পথে বেরিয়ে পড়তে। গত তিন রাত ধরে প্যাকিং হয়েছে। আজ সকালে তাও শেষ। ডাক্তার শেষ বারের মত তার বিপুল ওষুধের বাক্স পরীক্ষা করে দেখল। সব জিনিসই বার বার চেক করা হচ্ছে, তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। এক অদ্ভুত উত্তেজনায় সবাই চঞ্চল। আর মাত্র কয়েক ঘন্টা, তবু যেন বিশ্বাসই হতে চায় না যে সত্যিই পাহাড়ে যাচ্ছি, সত্যিই ত্রিশূল অভিযান হচ্ছে।

শেষ দিন পর্যন্ত চূড়ান্ত আশঙ্কায় দিন কাটিয়েছি। টাকা আর ওঠে না। প্রতি মুহূর্তেই ভেবেছি শেষ পর্যন্ত যদি টাকা না ওঠে তাহলে কি হবে।

কিন্তু আমরা কৃতজ্ঞ সবার কাছে। সবার অকৃপণ দানে আমাদের ঝোলা উঠেছে ভরে। দাতাদের কাউকে নির্দিষ্ট করতে চাওয়া বাতুলতা,

সে ধৃষ্টতাও আমাদের নেই। সবার কাছে—যার কাছেই গিয়েছি, ছু হাত ভরে দিয়েছেন আমাদের। জানা অজানা, কাছের দূরের সবাইকে শ্রদ্ধা জানাই আর বলি, 'আমাদের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করো, তোমাদের সাহায্য ছাড়া পাহাড়ে চড়ার স্বপ্ন কোনদিনই সফল হতো না।'

চিত্তরঞ্জন স্টেশন। গাড়ি আসবে বিকেল ৫টা ১০ মিনিটে। আমরা সমস্ত মালপত্র নিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক আগেই পৌঁছে গেলাম। চিন্তা ছিল এই পর্বতপ্রমাণ মাল কি ভাবে প্ল্যাটফরমে তুলব। দেখলাম অযাচিত সহস্র হাতে মুহূর্তে পৌঁছে গেল সব। পৌঁছে গেলাম আমরাও।

প্ল্যাটফরমে ঢুকে দেখি অনেক লোক। অদ্ভুত লাগছে, এঁরা সবাই আমাদের জন্য এসেছেন—এসেছেন শুভেচ্ছা জানাতে। গর্বে ভরে গেল আমার বুক। অপরিসীম দায়িত্ববোধে নতুন করে চৈতন্য হল আমার।

বিদায়-পর্বে ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান হল। চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানার জেনারেল ম্যানেজার পর্বতপ্রেমী শ্রীসতীশচন্দ্র মিশ্র এসেছেন প্রধান অতিথি হয়ে। আনুষ্ঠানিকভাবে তুষার-গাঁইতিতে জড়ানো পতাকা আমার হাতে তুলে দিলেন তিনি। সবার শুভেচ্ছার প্রতীক ঐ পতাকা। আমরা নিঃশব্দে প্রতিজ্ঞা করলাম, ঐ পতাকা আমরা নিয়ে যাব পর্বত-শিখরে, আমাদের লক্ষ্যে। পতাকার সম্মান আমরা রাখবই। ছোট্ট ভাষণে শ্রীমিশ্র বললেন, 'যাও, আর একবার ঘোষিত হোক যৌবনের জয়বার্তা, ঘোষিত হোক মানুষের কীর্তি। যাও, জয় করে ফিরে এস, সুস্থ দেহ মনে ফিরে এস।'

শ্রীমতী সরোজিনী মিশ্র আমার হাতে তুলে দিলেন কলাপাতায় জড়ানো কিছু ফুল। আবেগ-মথিত সুরে বললেন, 'তোমাদের জন্য আজ প্রার্থনা করেছি ভগবানের কাছে, পূজো দিয়েছি, এই নাও প্রসাদী ফুল।' আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিনয়ের সঙ্গে, ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করলাম সব। আমি জানি এই ফুলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক নিষ্ঠা, জড়িয়ে আছে এক কল্যাণময়ীর নিরন্তর মঙ্গল কামনা। আমার ভালো লাগল, আমি ভরে উঠলাম। মনে হল আমি অসীম শক্তির অধিকারী, হাজার মানুষের একনিষ্ঠতার জোরে আমি নিশ্চয়ই পৌঁছে যাব লক্ষ্যে।

অনুষ্ঠান-পর্ব সারা হতেই চারদিক থেকে জয়ধ্বনি উঠল। প্ল্যাটফরম ভর্তি লোক। সংগঠন-সভাপতি শ্রীযোগনাথ চট্টোপাধ্যায় এসেছেন সস্ত্রীক। চেনা পরিচিত এসেছেন আরো অনেক। কিন্তু ততোধিক লোক আমার অচেনা। তাঁরাও এসেছেন আমাদের শুভকামনায়। তাঁরা কেউ আমার অপরিচিত নন। প্রত্যেকে আমাদের আত্মার আত্মীয়।

হঠাৎ দেখলাম ঝপঝপ গলায় মালা পড়তে লাগল। কারা কোথা থেকে দিল বুঝবার আগেই চারিদিকে হৈ-হৈ, হাততালি। এরই মধ্যে একজন হাতে কিছু রজনীগন্ধা ধরিয়ে দিল—বোধহয় তার অন্তরের সবটুকু সৌরভ মিশিয়ে। আন্তরিকতায় আর হৃদয়ের উত্তাপে আমরা বুঝি মোহিত, বিমোহিত। উদ্বেলিত হৃদয় নিয়ে বার বার মনে করতে চাইছি, কি বিশাল দায়িত্ব আমাদের কাঁধে। সবার শুভেচ্ছার সম্মান আমাদের রাখতেই হবে।

সদস্যদের সবার বাড়ি থেকেই প্রিয়জনেরা এসেছেন। কিন্তু চারিদিকের এই উৎসাহের ভিড়ে তারা একটু পেছনে। তাদের চোখে জল, মুখে হাসি। তাদের বুকে আনন্দ বেশী, বেশী বুকের স্পন্দনও।

এরই মধ্যে গাড়ি এসে পড়ল। শুরু হল মাল তোলা। অতগুলো মাল তোলা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু আবারও দেখলাম, অজস্র হাতে নিমেষে উঠে গেল সব। শুরু হল বিদায়ের হাসি আর হাত-ঝাঁকানি। কে যে অভিযাত্রী আর কে যে নয় বোঝার উপায় নেই ভিড়ে। সবাই দেখি পায়ের দিকে তাকাচ্ছেন আর হাতে ঝাঁকি দিচ্ছেন। আমাদের সবার পায়ে হাণ্টার সুও। ঐ দিকে তাকিয়েই বুঝে নিচ্ছন সবাই। আমরা উঠে পড়লাম। ক্লাবের অন্য ছেলেরা, যাঁরা এ অভিযানে যাচ্ছেন না, যাঁদের গত কয়েক মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকের মুহূর্তটি হয়েছে সম্ভব, মুখের হাসিতে চোখের জল ঢেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বলে যাচ্ছেন—best of luck. উৎসাহের ভিড়ে আত্মীয়-পরিজনরা কাছে আসতেই পারছেন না। দূর থেকেই সজল দৃষ্টিতে তাঁরা আমাদের যাত্রাপথকে নির্বিঘ্ন করে দিতে চাইছেন। ওঁদের সবার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ও করতে পারলাম না। গাড়ি বাঁশী বাজাল। আমার চোখের সামনে সমস্ত স্টেশন,

প্ল্যাটফরম আর হাজার মানুষ একাকার হয়ে এক শ্বেত-শুভ্র গগনচুম্বী বিশালে পরিণত হল—নাম তার ত্রিশূল। অজস্র কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল। হাত নড়ল। রুমাল উড়ল। গাড়ি ছাড়ল।

আট

'ত্রিশূল পার্টি ! ত্রিশূল পার্টি !!'

একটা বিরাট ঝাঁকুনি দিয়ে বাস দাঁড়িয়ে গেল। সেই সঙ্গেই চিৎকারটা শুনতে পেলাম। 'ত্রিশূল পার্টি ! ত্রিশূল পার্টি !!'

কার গলা ? অনিন্দ্যর না ? তাহলে কি যোশীমঠে পৌঁছে গেলাম ? চারিদিক অন্ধকার। বাইরের কিছু ভাল বোঝা যাচ্ছে না। তবু মনে হয়, হ্যাঁ, যোশীমঠেই পৌঁছেছি।

তাহলে এতক্ষণ কি করছিলাম ? সারাদিন বাসে থেকে থেকে সন্ধ্যের দিকে ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। আধো ঘুমে আধো জাগরণে কত কী ভাসছিল চোখের সামনে। দেখছিলাম—

এক নিঃশ্বাসে পৌঁছুলাম লক্ষ্মৌ। গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়াবে। কেউ নামল টিফিনের ব্যবস্থা করতে, কেউ রাতের খাবারের অর্ডার দিতে. কেউ বা একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেতে শুধু শুধুই প্ল্যাটফরমে নামল।

আমিও নামলাম। লক্ষ্মৌ স্টেশনটা আমার খুব ভালো লাগে। একটা বড় স্টেশনের সব সুবিধে তো এখানে আছেই, কিন্তু সেটাই প্রধান কারণ নয়, স্টেশনের বিশাল বাড়িটার দিকে তাকালে, এর গঠন-কৌশল দেখলেই মনে হয় আমি আর আজকের লক্ষ্মৌতে নেই। পৌঁছে গেছি সেই নবাবী আমলে। লক্ষ্মৌ ঘরানার সঙ্গীতে আর ছন্দিত পায়ের নূপুর-নিক্কণে যার অলিগলি মুখরিত। কে যেন বলেছিলেন লুচি ভাজার গন্ধ পেলেই তার লক্ষ্মী পূজোর কথা মনে পড়ে। আমারও, হয়ত কোন কারণ নেই, কেন জানি, সন্ধ্যেবেলা লক্ষ্মৌ স্টেশনের দিকে তাকালেই পান খেতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু আজ আর তেমন করে তাকাবার অবকাশ নেই। লক্ষ্ণৌতেই দ্বিতীয় অগ্রগামী দলের দার্জিলিং থেকে এসে আমাদের সঙ্গে মিলবার কথা। আসাম মেল কি এসে গেছে? কিন্তু কে, ওদের কাউকে তো প্ল্যাটফরমে দেখছি না। এদিক ওদিক দেখছি, হঠাৎ মাইকে ঘোষণা শুনতে পেলাম 'এইমাত্র আসাম মেল লক্ষ্ণৌ স্টেশনের উত্তরপূর্ব রেলের প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়িয়েছে।'

লক্ষ্ণৌ স্টেশনটা বিরাট। আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে এদিকটায়, উত্তর-রেলের প্ল্যাটফরমে। উত্তর-পূর্ব রেলের প্ল্যাটফরমগুলো বেশ কিছুটা ওদিকে। দৌড়লাম আমি। ছুটতে ছুটতে গিয়ে ঢুকলাম, যেখানে আসাম মেল সবে এসে দাঁড়িয়েছে। বাঁধভাঙা স্রোতের মত লোক বেরিয়ে আসছে। তার মধ্যে পথ করে এগিয়ে চললাম। হঠাৎ দেখি এক জায়গায় স্তূপীকৃত মাল। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে কালী আর শোভন। আরও দুজন লোক ক্রমাগত গাড়ি থেকে মাল নামিয়ে চলেছে। বুঝলাম, ওরাই আমাদের শেরপা। কিন্তু ভাল করে ওদের মুখের দিকে তাকাবার সময় পর্যন্ত নেই। কালী আর শোভন আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল। আমি শুধু বললাম, 'সব ঠিক আছে তো?' 'সব ঠিক হ্যায়, কোন চিন্তা নেই। বরং একটা ভাল খবর আছে।' 'ঠিক আছে, পরে শুনব। এখন সময় নেই। আমার গাড়ি ছাড়ল বলে। তোমরা পরের গাড়িতে এস। হরিদ্বারে দেখা হবে।' বলেই আমি আবার দৌড়লাম। কোন রকমে গাড়িতে উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দিল। সবাই ওদের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ছিল। বললাম, কোন চিন্তা নেই। সব ঠিক আছে। ওরা আসছে।'

অতঃপর হরিদ্বার।

আবার হরিদ্বার এলাম। কত বারই তো হরিদ্বার এলাম, তবু হরিদ্বার চিরনতুন। হরিদ্বার কোনদিনই পুরনো হয় না, আমার কাছে তো নয়ই, বোধ হয় কারো কাছেই নয়।

আজকের হরিদ্বারের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বেড়েছে লোক, বেড়েছে বাজার, বেড়েছে দাম, বেড়েছে নোংরামি, বেড়েছে শঠতা,

চুরি, রাহাজানি। তবু যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয় ভারতবর্ষের কোন্ জায়গা সবচেয়ে ভাল লাগে, আমার নির্দ্বিধায় উত্তর হবে হরিদ্বার। আজও হরিদ্বার তার মনসা পাহাড়, চণ্ডী পাহাড় নিয়ে, কনখলের বিশাল বটগাছটা নিয়ে, ঘিঞ্জি বাজার আর অসংখ্য মনোলোভা খাবারের দোকান নিয়ে, ব্রহ্মকুণ্ড আর হর কি পৌরির চমৎকার পরিবেশ নিয়ে, সুনির্মল বাতাস আর সর্বোপরি কলস্বিনী গঙ্গাকে নিয়ে এক এবং অদ্বিতীয়। আস্তিক আর নাস্তিক, ধনী আর দরিদ্র, পুণ্যার্থী আর ভ্রমণার্থী সবার জন্যই হরিদ্বার অবারিতদ্বার, সবাই আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে হরিদ্বারকে আপন করে নিতে পারেন। হরিদ্বার—পাহাড়ের প্রবেশপথ, হিমালয়ের প্রথম আঙ্গিনা। পাহাড়ে যে আসবে, হিমালয়ের ডাকে যে সাড়া দিয়েছে হরিদ্বার তাকে আসতেই হবে। তাই তো হরিদ্বার আমার এত প্রিয়।

এবারে কিন্তু হরিদ্বারে আমাদের মেয়াদ বড় কম। পরের গাড়ি ধরেই চলে যেতে হবে হৃষিকেশ। ইতিমধ্যে সবাই মিলে সেই পর্বত-প্রমাণ মাল প্ল্যাটফরমে নামিয়ে সাজিয়ে ফেলেছি। হৃষিকেশের গাড়ি কয়েক ঘন্টা পরে। এরই মধ্যে আরেকটা গাড়ি ধরে হৈ হৈ করে এসে পড়ল কালীরা। মালপত্রের পরিমাণ আরও বাড়ল। তবে আগের তুলনায় এমন কিছু নয়। বোঝার ওপর শাকের আঁটিটি যেন।

কালি একটা সুখবর দেবে বলেছিল। শেরপাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই বুঝলাম সেটা। 'বিজয়দা, এই হল শেরপা কিতারে, ইদানীংকালে ওর রেজাল্ট খুবই ভালো, যদিও এ অঞ্চলে প্রথম আসছে। আর এবার সুখবরটা দিই। এ হলো নিমা দোরজি। হ্যাঁ, আমরা যাকে চেয়েছিলাম সেই নিমা দোরজি। ওই অঞ্চলে বেশ কয়েক বার এসেছে, এমনকি ত্রিশূলেও গেছে এর আগে।'

লাজুক লাজুক চোখে তাকিয়ে মৃদু হাসল ওরা। আমি হাত মেলালাম। অত্যন্ত সীমিত ওদের অভিব্যক্তি। প্রচণ্ড আনন্দে ও উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে না ওরা, চরমতম দুঃখেও ভেঙে পড়ে না। জীবনের বিচিত্রতম অভিজ্ঞতার এত সঞ্চয় ওদের আছে, জীবনের বীভৎসতম মুহূর্তের এত

বেশী মোকাবিলা ওরা করেছে, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে জীবনকে এত বার ওরা ছিনিয়ে এনেছে যে জীবনবোধের এক উন্নত স্তরে ওরা পৌঁছে গেছে। সম্পূর্ণ আবেগবর্জিত হয়ে, নিঃশব্দে এক মনপ্রাণে নিজের কাজটুকু করে যেতে শিখেছে ওরা। আর তাই সার্থক নাম ওদের, ওরা শেরপা।

বিচিত্র জাত এই শেরপারা। বৃহৎ হিমালয়ের এক উচ্চতর প্রদেশে, নেপালের সোলো আর খুম্বু জেলায় এদের আদি বাস। ঐ অঞ্চলকে বলাই হয় 'শেরপা ল্যাণ্ড'। পাহাড়ের কোলে এদের জন্ম। কঠিন, রুক্ষ পর্বত এদের খেলার সাথী, যৌবনের রোমাঞ্চ, বার্ধক্যের শরণ আর আত্মার দোসর।* হিমালয় এদের জীবনে এত গভীর ভাবে, এত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত যে হিমালয়ও এদের করে নিয়েছে আপন। হিমালয়কে ঘিরেই এদের জীবনবেদ গড়ে ওঠে। হিমালয়ই এদের পরম আরাধ্য দেবতা। ওদের বিশ্বাস আপদেবিপদে হিমালয়ই ওদের রক্ষা করে, হিমালয়ই পারে ওদের জীবন সুখে সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে দিতে।

আজ এই শেরপাদের একটা ভালো অংশ দার্জিলিং প্রবাসী। আধুনিক সভ্যতার অনিবার্য স্রোতে, জীবনধারণের উলঙ্গ তাগিদে আজ ওদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত। তবু ওদের মন পড়ে থাকে হিমালয়ে। আজও অনেকে হিমালয়কে করে নিয়েছে জীবনধারণের একমাত্র উপায় বলে। তাই ওরা আসে এইসব অভিযানের সঙ্গে। সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অসম্ভব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় ওরা, কঠোর পরিশ্রম করে অভিযানকে করে সার্থক। তারপর নিঃশব্দে বিদায় নেয় ওরা। অভিযানের যা কিছু সম্মান জোটে সদস্যদের কপালে, শেরপারা আজও অপাংক্তেয়। আজও আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেকটি পর্বতাভিযানে শেরপা অপরিহার্য। বলতে দ্বিধা নেই, ওদের কাঁধে পা দিয়েই আমরা পাহাড়ে চড়ি। কিন্তু সাফল্যের স্বীকৃতিতে আজও ওদের সমান স্থান দিতে রাজী নই আমরা। আমাদের মতো সখের পর্বতারোহী যে ওরা নয়। ওরা যে পেশাদারী। ওদের দুর্ভাগ্য, অভিযানে এসেও বাঁচার তাগিদে কিছু পয়সা ওদের নিতেই হয়।

হৃষিকেশ স্টেশনে রাত কাটিয়ে ভোরের বাসেই রওনা দিলাম জোশীমঠ। পূর্ব ব্যবস্থা মত বাস এল স্টেশনে, আমাদের মাল নিতে। প্রায় পুরো বাসটাই দখল করলাম আমরা, মাল আর লোকে।

দুর্বার বেগে এগিয়ে চলল বাস। আমরা এগিয়ে চললাম দেবভূমির পথে। দেখতে দেখতে হৃষিকেশ শহর ছাড়িয়ে, মুনি-কি-রেতি আর লছমনঝুলার বিখ্যাত ঝুলাকে পেরিয়ে ডান পাশে গঙ্গাকে সঙ্গে নিয়ে সর্পিল পাহাড়ী পথে বাস এগিয়ে চলল দেবপ্রয়াগের পথে। এ পথ ভারতের আদি তীর্থের পথ, এ পথ পঞ্চপ্রয়াগের পথ, গঙ্গা অলকানন্দা বিধৌত মহাপ্রস্থানের পথ। হাজার বছরের লাখো মুক্তিকামী মানুষের পদরেণুলাঞ্ছিত পুণ্য পথ। কত গ্রাম, কত নদী, কত শস্যক্ষেত এ পথে। সরল পাহাড়ীর অবাক চাউনি, আত্মমগ্ন সন্ন্যাসীর উদাস হয়ে চলা, ফার-দেওদার-পাইনের ঋজুতা, গগনভেদী পর্বতের উচ্চ আকাশ, আলিঙ্গনে আর মুক্তির আশ্বাসে ভরা বাতাস এ পথকে করেছে মহিমান্বিত।

লবণাক্ত সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এ পথ হয়েছে অনেক সুগম। পথের দুধারে অনেক বিরতির অবকাশ। অনেক স্বাচ্ছন্দ্য ছড়ানো সেখানে। তবু যেন মনে হয় কোথায় সেই রোমাঞ্চ, কোথায় সেই আবেগ—আজ যা রয়েছে তা তো শুধু বেগ।

দেবপ্রয়াগে ভাগীরথী আর অলকানন্দার সঙ্গমে এসে গঙ্গাকে বিদায় জানিয়েছি আমরা। এবার আমাদের সঙ্গে থাকবে শুধু অলকানন্দা, থাকবে সেই যোশীমঠ পর্যন্ত। এ পথে শুধু প্রয়াগ আর সঙ্গম। দেবপ্রয়াগের পরই রুদ্রপ্রয়াগ, মন্দাকিনী এসে মিলেছে অলকানন্দায়। পুল পার হয়ে বাঁ দিকের পথ চলে গেছে শোণপ্রয়াগ-কেদারনাথের পথে। ডানদিকে চলি আমরা, পার হয়ে যাই কর্ণপ্রয়াগ-অলকানন্দা আর কর্ণগঙ্গা বা পিণ্ডারী নদীর সঙ্গম। তারও পরে নন্দাকিনি আর অলকানন্দার সঙ্গম। নন্দপ্রয়াগ যখন পার হলাম তখন বিকেল হয়ে গেছে। সারা দিনের বাসযাত্রার ফলে সবাই ক্লান্ত —অল্প-বিস্তর ঝিমুনি এসে গেল। ইতিমধ্যে কখন যেন সন্ধ্যে হয়ে গেছে

—অর্ধচেতন মনে কত কি ছবি দেখে চলেছি, এমন সময়—

—'ত্রিশূল পার্টি ! ত্রিশূল পার্টি !!'

চমকে উঠে ফিরে এলাম বাস্তবে। এক ঝটকায় নেমে এলাম বাসের বাইরে। হ্যাঁ, পৌঁছেছি যোশীমঠে।

—'বিজয়দা !!'

চিৎকার করে আমাকে জড়িয়ে ধরল দ্বিজেন। অনিন্দ্যও এসে হাত মেলাল। 'যাক, তোরা ভালয় ভালয় এসে পৌঁছলি, চিন্তা দূর হল।'

—'এদিকের খবর কি অনিন্দ্য ?'

—'Every thing is OK and at your service, leader.' পুরো কেতাবী কণ্ঠে বলে উঠল অনিন্দ্য।

—'কিন্তু এখানে আর কথা নয়, দ্বিজেন বলে, 'তোমরা ক্লান্ত, আগে চলো ঘরে—মানে বিড়লা রেস্ট-হাউসে। রেস্ট নাও, চা খাও, তারপর তোমাদের কথাও শুনবো, আমাদের কাজের রিপোর্টিংও করবো।'

বহু কাজ ওরা করেছে তবু অনেক কাজ এখনও বাকী। কেরোসিন তেলের পারমিট তো পাওয়া গেছে কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে যোশীমঠে তেল নেই। কবে আসবে কে জানে! তাহলে? ভরসা একমাত্র হুকুম সিং।

পরের দিনই ছুটলাম যোশীমঠের ইন্দো-তিব্বত-সীমান্ত-পুলিসের ট্রেনিং সেণ্টারে। যোশীমঠে ওদের বিরাট ছাউনি। হুকুম সিং এদের একজন বড় গোছের কর্তা। সেই হুকুম সিং যিনি দুর্ধর্ষ পর্বতারোহী, সফল নেতা।

দেখা করলাম। উনি পরম আগ্রহে বসালেন আমাদের। বিস্তারিত খবর জেনে নিলেন। এক কথায় কেরোসিন দিতে রাজী হয়ে গেলেন। বছর তিনেক আগে উনি ত্রিশূলে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন শিবিরের সম্ভাব্য অবস্থান ও অন্যান্য দিক নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হল। আমাদের লাভ হল অনেক। ধন্যবাদ জানাতে বললেন, 'আরে এটুকু অন্ততঃ করতে দিন। আমরা তো নিশ্চিন্ত মনে পাহাড়ে যাই। অঢেল রেশন আর সাপ্লাই লাইন, ধীরেসুস্থে উঠলেই হল। আমি তো জানি, আপনারা কি

ভাবে আসেন, কি ভাবে একটা অভিযান সংগঠিত করেন। আপনারাই সত্যিকারের পর্বতারোহী, সাচ্চা পর্বতপ্রেমী।' এতবড় একজন পর্ব্বতারোহীর এমন বিনীত ভাষণ আমাকে মুগ্ধ করল।

বিড়লা রেস্ট-হাউসে আমাদের পাশের ঘরে উঠেছে এক বৃটিশ অভিযাত্রী দল। ওরা যাবে দুর্গম কলঙ্ক (২২৭৪০´) পর্বতে। আলাপ হল, হৃদ্যতা হল। যাওয়ার দিন একটা রঙিন ৩৫ মি. মি. ফিল্ম দিয়ে বললেন ওঁরা, 'এটা রাখ। আমাদের স্বল্পকালীন বন্ধুত্বের স্মৃতি।'

রেশনের পুরো হিসেবটাই ফেঁসে গেল এখানে। অনিন্দ্যরা জানাল কুলীদের সঙ্গে কথা হয়েছে, কুলী-সর্দারের সঙ্গে চুক্তিও হয়েছে, তবে আমরা ওদের জন্য যে পরিমাণ রেশন ধরেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী লাগবে। মোটামুটি ভাবে প্রত্যেক কুলীকে প্রত্যেক দিন চাল আর আটা মিলিয়ে অন্ততঃ এক কেজি পরিমাণ দিতে হবে। অন্য যা যা দেওয়ার তা তো রইলই। মাথায় হাত। কিন্তু মাথায় হাত দিয়ে এখন আর লাভ নেই। আবার হিসেব হল, আবার চাল, আটা, চিনি প্রচুর কিনতে হল যোশীমঠ থেকে। এছাড়া আলু ও পেঁয়াজের পুরোটাই নেওয়া হবে এখান থেকে, নেওয়া হবে কাঁচা বাজারও।

স্থানীয় মিলিটারি কর্তৃপক্ষ '৯ মাউন্টেন ব্রিগেড' সাদরে আহ্বান জানালেন আমাদের। মাত্র কয়েকদিন আগে পর্যন্ত যোশীমঠের পর থেকেই আমাদের অভিযানের সমগ্র অঞ্চলটিতে যাওয়া প্রতিরক্ষার কারণে নিষিদ্ধ ছিল, নিষিদ্ধ ছিল ছবি তোলাও। যদিও সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত অভিযানকে যেতে দেওয়া হত এবং ছবিও তুলতে দেওয়া হত, তবু এই সমস্ত অনুমতিপত্র বার করতে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হত। কিন্তু এ বছর আগস্ট মাস থেকে হিমালয়ের এরকম বহু অঞ্চল থেকে উক্ত বাধানিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছে। মিলিটারি কর্তৃপক্ষ বললেন, 'আর তো কোন ঝামেলা নেই। যেমন খুশি যান, যেমন খুশি ছবি তুলুন।' লতাগ্রাম পর্যন্ত যাওয়ার কথা তুলতে এক কথায় সাহায্য করতে রাজী হলেন।

ফলে প্রায় সব ব্যবস্থাই হয়ে গেল। আমরাও পাহাড়ে যাওয়ার জন্য তৈরী।

এরই মধ্যে একটু সময় করে শঙ্করাচার্যের মঠ দেখতে গেলাম। শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত চারটি মঠের অন্যতমটি এখানে। জোতিমঠ—যোশীমঠ। আজকের যোশীমঠের দিকে তাকালে কে বলবে এ ছিল একদিন ভগবৎ সন্ধানের অন্যতম স্থান, ছিল পুণ্যাত্মাদের সাধনভূমি। যোশীমঠ এখন মানুষে আর যন্ত্রে ছয়লাপ, যোশীমঠ এখন শব্দে, বর্ণে, গন্ধে, মানসিকতায় পুরোপুরি আধুনিক শহর।

রাতে বিড়লা রেস্ট-হাউসের ঘরে এক দৃশ্য। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। কাল সকালে বেরিয়ে পড়তে হবে বলে সব গোছানোও শেষ। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া দরকার, অন্যদিন ইতিমধ্যেই সব ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু আজ সবাই জেগে। বুকের নীচে এয়ার-পিলো দিয়ে যে যার বিছানায় একগাদা করে খাম-পোস্টকার্ড নিয়ে মগ্ন। কাল থেকে প্রকৃত যুদ্ধে নেমে পড়ব। পোস্ট-অফিসের সুবিধেও আর পাওয়া যাবে না। তাই এ পর্যায়ে শেষবারের মত প্রিয়জনদের স্মরণ করে নিচ্ছে সবাই। প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল যেন। রাত যত গভীর হয় চিঠির সংখ্যা বাড়তে লাগল ততই। কে ঠিক কটা লিখল বোঝা গেল না, তবে মনে হল বিবাহিত সদস্যদের থেকে অবিবাহিত সদস্যদের চিঠির সংখ্যাই যেন বেশী।

হাসতে হাসতে আমি একতরফা রুলিং জারী করলাম—প্রয়োজন বোধে লীডার যে কোন সন্দেহজনক চিঠি খুলতে পারবে, পড়তে পারবে। কেননা এর দ্বারা সেই সদস্যের মনের গতি-প্রকৃতি বোঝা যাবে এবং যদি বোঝা যায় তার মন 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে—', খামের ওজন দেখে অনেকেরই এরকম মনে হচ্ছে, তবে তাকে ফাইন করা হবে এবং সে ফাইন হল এর যে সব উত্তর আসবে সেগুলিও সবার সামনে পড়া হবে।

সবাই হাসল। হাসতে হাসতেই একসঙ্গে বলে উঠল: 'মন আমাদের এক জায়গাতেই—ত্রিশূলে।'

হ্যাঁ, অনেক বাধার পাহাড় পেরিয়ে আজ আমরা সত্যিই ত্রিশূলের দোরগোড়ায়।

নয়

সকাল থেকেই হৈ হৈ।

সবাই কোন না কোন কাজ করছে, একান্ত কাজ না থাকলে অন্যের কাজে নাক গলাচ্ছে। তবু তারই মধ্যে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকল। দশটা বাজতে না বাজতে দেখা গেল সবাই তৈরী। এরই মধ্যে শম্ভুদা আর ডাক্তারকে নিয়ে পোস্ট-অফিস ঘুরে এলাম। প্রচুর খাম, পোস্টকার্ড ইত্যাদি কেনা হল। চিত্তরঞ্জনে টেলিগ্রাম পাঠালাম। জানানো হল, 'সুস্থ দেহে ও মনে অভিযাত্রীরা যোশীমঠ থেকে মূল শিবিরের দিকে যাত্রা করল আজ, ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৪।

হ্যাঁ, আজ ৯ই। আজই অভিযানের তৃতীয় পর্যায় শুরু। চললাম পাহাড়ের একেবারে অন্তরের কাছে। যদিও সত্যিকারের পায়ে পায়ে পথ চলা শুরু হবে আগামী কাল থেকে। আজকের দিনটাকে তার ভূমিকা বলা যেতে পারে।

আজও আমরা পাহাড়ী পথে যাব, তবে গাড়িতে। যোশীমঠ থেকে বদ্রীনাথ পর্যন্ত যে প্রধান রাস্তা চলে গেছে তাকে বাঁ পাশে রেখে অলকানন্দার এক প্রধান উপনদী ধৌলীগঙ্গাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা চলব। চলব যোশীমঠ-মালারী সড়ক ধরে, যে সড়ক চলে গেছে তিব্বত সীমান্তে নিতি গিরিবর্ত্ম পর্যন্ত। এই পথ ধরে যোশীমঠ থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে, ধৌলী ও ঋষিগঙ্গার সঙ্গম পেরিয়ে লতাগ্রামে থাকব আমরা। লক্ষ্যপথের শেষ গ্রাম লতা, যেখান থেকে শুরু হবে পদযাত্রা।

লতা যদিও পথের শেষ গ্রাম তবু বলা যায়, আধুনিক সভ্যতাকে বিদায় জানাতে হবে যোশীমঠ থেকেই। শেষ পোস্ট-অফিসও এখানেই। তাই এখানকার পোস্ট-মাস্টারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলাম আমরা। আগামী এক মাস এই অভিযানের নামে যে সমস্ত চিঠিপত্র আসবে তার ঠিকানা থাকবে 'কেয়ার অব পোস্ট-মাস্টার, যোশীমঠ' আর আমরাও রানার

মারফত মূল শিবির থেকে বাকী দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব এই পোস্ট-মাস্টারের মাধ্যমেই। অতি সজ্জন ব্যক্তি মাস্টারমশাই, সানন্দে রাজী হলেন আমাদের সাহায্য করতে।

আমরা কৃতজ্ঞ স্থানীয় মিলিটারি কর্তৃপক্ষের কাছে। তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনেছেন আমাদের অভিযান-পরিকল্পনা, প্রচুর উৎসাহ দিয়েছেন আর এক কথায় প্রায় সারাদিনের জন্য একটি ট্রাক ছেড়ে দিয়েছেন। যার ফলে অতি সহজেই আমরা লতাগ্রামে পৌঁছে যাব।

একেই বলে মিলিটারি সময়ানুবর্তিতা। পূর্বকথামত কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটায় মিলিটারি ট্রাক দোরগোড়ায় হাজির। হাতে হাতে সব মাল তোলা হল ট্রাকে। প্রচুর মাল। তার ওপর যোশীমঠ বাজার থেকে কিছু কাঁচা বাজার তোলা হল যার মধ্যে ১৫০ কেজি আলু ও ৭৫ কেজি পেঁয়াজ প্রধান। প্রায় দিন তিনেকের আশ্রয়স্থল যোশীমঠের বিড়লা রেস্ট-হাউসকে বিদায় জানিয়ে এগিয়ে গেলাম আমরা, তখন বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা।

রেনী গ্রামে পৌঁছুলাম বেলা ১টায়। পথে পার হয়ে এসেছি তপোবন—এক কালের সাধক পুরুষদের সাধনাস্থল। শান্ত, মৌন, স্নিগ্ধ তপোবন আজ মানুষের কলরবে আর যন্ত্রযানের ঘর্ঘরে জমজমাট। আজকের জীবনযাত্রার অনেক স্বাচ্ছন্দ্য হয়ত এখন তপোবনে উপস্থিত, কিন্তু সেই শাশ্বত অনাবিল প্রশান্তি খুঁজতে যাওয়া আজ বৃথা। এই তপোবন থেকে একটি পায়ে-চলা পথ চলে গেছে হিমালয়ের সৌন্দর্য-পিপাসুদের এক অন্যতম আকর্ষণ কুঁয়ারী গিরিবর্ত্মে (১২৪০০´)। সেখান থেকে নেমে এসেছে পথ, রূপকুণ্ড পথের ওয়ান গ্রাম (৮০০০´) হয়ে কুমায়ুনের প্রবেশদ্বার গোয়ালদামে গিয়ে মিশেছে।

রেনী গ্রামে একটু দাঁড়ালাম আমরা। গ্রামের একটু আগে ডান-দিক থেকে ঋষিগঙ্গা এসে মিলেছে ধৌলীতে। চমৎকার সঙ্গমটি। ঋষির সেতু পার হতে হতে একপলক দেখে নিলুম নদীকে। গাড়োয়ালের অত্যন্ত দুর্গম এই ঋষিগঙ্গার নদীখাত ধরেই আমাদের এগুতে হবে মূল শিবিরের দিকে। কিন্তু সে কথা এখন নয়।

রেনী গ্রামে অভিযানের হাই অল্টিচুড্ পোর্টার (H. A. P.) কেদার সিং, মেহেরবান সিং ও শের সিং যোগ দিল আমাদের সঙ্গে। এরা পাহাড়ের উচ্চতর অংশে বা চিরতুষার অঞ্চলে কাজ করবার জন্য বিশেষ ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন। এদের মেট হল কেদার সিং। বহু অভিযানের অভিজ্ঞতাপুষ্ট। রেনী গ্রামেই এদের বসতি। আজ থেকে এরা অভিযানের অন্যতম সদস্যরূপে পরিগণিত হল।

আরও কিছু চাল ও আটা কেনা হল রেনীর একমাত্র দোকান থেকে। আরও মাইল চারেক এগিয়ে ধৌলির তীরে লতাগ্রামের একটু আগে থামলাম আমরা। কেদার সিং জানাল, এইখানেই আমাদের তাঁবু পাতা ঠিক হবে। ঐ যে বড় রাস্তার ডানপাশ দিয়ে একটি পায়ে-চলা পথ উঠে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে ওপর দিকে—ঐটিই আমাদের আগামী-কালের পথ।

সব মালপত্র নামিয়ে ট্রাককে ধন্যবাদ জানিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। রাস্তার ধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মালপত্রের মধ্যে একটা প্যাকিং বাক্সর ওপর বসে চারদিকে তাকাতে দেখি চারপাশে প্রচুর লোকের ভিড়। কারা এরা?

—'নমস্তে লিডার সাব।'

তাকিয়ে দেখি এক মধ্যবয়স্ক গ্রামবাসী, মুখে হাসি, দু হাত বুকের কাছে জড়ো করা।

'নমস্তে' বলে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাতে পাশে দাঁড়ানো অনিন্দ্য পরিচয় করিয়ে দিল। বলল—

'লিডার, এ হল জয় সিং, আমাদের কুলীর সর্দার। ওর সঙ্গে আমাদের যা চুক্তি হয়েছে, এই নাও সেই কাগজ। ওই-ই কুলী ইত্যাদি যোগান দেবে। যা যা কথাবার্তা বলার দরকার সেরে নাও।'

আচ্ছা, এই তবে জয় সিং। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'মিলাও হাত সর্দার। বসো, বসো।'

অতন্ত বিনয়ী হাসি হেসে হাত মেলাল জয় সিং, কিন্তু বসল না, 'ঠিক হ্যায় সাব' বলে দাঁড়িয়ে রইল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'বল জয় সিং কবে থেকে পাহাড়ে যাচ্ছ, কোথায় কোথায় গেছ ?'

কুণ্ঠার সঙ্গে হেসে বলল জয় সিং, 'সে তো সাব অনেকদিন হল। সেই যেবার টিলম্যান সাবকা সাথ নন্দাদেবীমে—'

ও বাবা, এ যে অনেক পুরনো লোক। প্রথমেই টিলম্যানকে টেনে এনেছে। বললাম, 'ঠিক হ্যায় জয় সিং, তোমার আর টিলম্যান সাহেবের গল্প নিশ্চয়ই শুনব, কিন্তু তার আগে বল কতজন কুলী এনেছ আর হঠাৎ এখানে এত ছাগল ভেড়া এসে গেল কি করে ?'

উত্তরে জয় সিং যা জানাল তা অতি চমৎকার।

প্রত্যেকটি পর্বত অভিযানেই বিপুল মালপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম অন্ততঃ মূল শিবির পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবার জন্য দরকার হয় এক বিশাল কুলী বাহিনী। যেমন ধরা যাক ১০ জন সদস্যের একটি দলের একটি অভিযানে ২০ দিনের সব খাদ্যসামগ্রী, বাসনপত্র, তাঁবু, পাহাড়ে চড়ার বিভিন্ন সরঞ্জাম ইত্যাদি নিয়ে মোট মালের পরিমাণ হল ৮০০ কিলোগ্রাম। যদি জন প্রতি কুলী ২৫ কিলোগ্রাম মাল বয় তাহলে দরকার ৩২জন কুলী। এখন যদি মূলশিবিরে ৬ দিনের হাঁটাপথে পৌছনো যায় এবং ৪ দিনের হাঁটাপথে ফেরা যায় তাহলে ঐ ৩২জন কুলীর জন্য ১০ দিনের খাদ্যসামগ্রীও নিতে হবে। হয়ত দেখা গেল তার ওজন হল প্রায় ৫০০ কিলো। এবার এই ৫০০ কিলো মাল বইবার জন্য আবার দরকার ২০জন কুলী। আবার তাদের খাদ্যসামগ্রী এবং তা বইবার জন্য আবার কুলী। একটা পৌনঃপুনিক ব্যাপার। হয়ত শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে ঐ ১০ জনের দলকে ঠিকমত মূল শিবিরে পেঁছুতে হলে দরকার পড়ছে ৭০টি কুলী। এবং এদের প্রতিদিনের মাইনে পড়বে কমপক্ষে ৭০০ টাকা। মাত্র ২০,০০০ ফুটের এক পর্বত অভিযানে কেন হাজার পঁচিশেক টাকা খরচ হয়ে যায় তাও কিছুটা বোঝা যায় এই হিসেব থেকে। প্রতিদিন প্রায় হাজার টাকা খরচ। এক রাজসূয় ব্যাপার।

কোন কোন পাহাড়ী অঞ্চলের মূল শিবিরের পথ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত,

ফলে সেখানে মালবহনকারী খচ্চর (mule) নিয়োগ করা হয়। এক একটি খচ্চর প্রায় ৭০/৮০ কিলো মাল বহন করে। এদের রেট হয়তো কুলীদের রেটের তিন গুণই হয় কিন্তু খেতে দেবার সমস্যা নেই বলে খাদ্যসামগ্রীর দাম ও সেগুলি বয়ে নিয়ে যাওয়ার মত পৌনঃপুনিক সমস্যা ও খরচের ব্যাপারটা তাতে অনেক কমে যায়।

আমাদের এই অভিযানে ঋষি-গঙ্গার গভীর দুর্গম খাত ধরে মূল শিবিরের যে রাস্তা তা মালবহনকারী খচ্চরের পক্ষেও অনতিক্রম্য। কিন্তু এত বড় অভিযানের সব মাল বইবার জন্য যদি শুধু কুলী নিয়োগ করতে হয় তবে খরচ প্রায় একটা অসম্ভব অঙ্কে গিয়ে ঠেকবে। হয়ত মূলশিবিরে না পৌঁছেই টাকার অভাবে ফেরার পথ ধরতে হবে। তাই খরচ বাঁচানোর জন্য এপথে অভিযানের মাল টেনে নিয়ে যাবে বিশাল এক ছাগলবাহিনী।

হ্যাঁ, নন্দাদেবী-ত্রিশূল অঞ্চলে অভিযান করার এই একটিই উপায়। আশেপাশের গ্রামের কয়েকজনের আছে এই ছাগলবাহিনী। দুর্গম খাড়াই পাহাড়ের গা বেয়ে চলতে এরা ওস্তাদ। প্রত্যেকটি ছাগলের পিঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে দু'পাশে থলেওয়ালা একটি চামড়ার ব্যাগ যাতে থাকবে ১২ কিলো মত মাল। সেই মাল নিয়ে অবিশ্বাস্য গতিতে ঐ বিপজ্জনক পথে চলবে এরা। এই বিশাল ছাগলবাহিনীর সঙ্গে থাকবে একজন লোক, এদের দেখাশোনা করার জন্য। মোট যে পরিমাণ মাল এরা বইবে তার ওপর একটা মোট দর ধার্য করা হয়। এখানেও খেতে দেবার সমস্যা নেই বলে ভাড়া তুলনামূলক ভাবে অনেক কম পড়ে। তবে খুব বড় আকারের জিনিস যেমন—তাঁবু, বাসন, কেরোসিন তেলের টিন বা কাঁচের বোতল ইত্যাদি জিনিস এদের আওতার বাইরে। সেগুলির জন্য কুলী করতেই হবে। খাদ্যসামগ্রীর প্রায় সবটাই যেমন চাল, ডাল, আটা, চিনি, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি বেশীর ভাগ মালটাই এরা টানবে। হিসেব করে দেখলাম প্রায় ১০০ ছাগল আমাদের দরকার হবে। আর কুলীও লাগবে অন্তত ২৫ জন। তার মানে কাল আমরা যে দল বার হচ্ছি তাতে থাকছে ১৫ জন সদস্য, ২ জন শেরপা, ৩ জন

হাই-অল্টিচ্যুড-কুলী, জনা ২৫ সাধারণ কুলী ও অন্ততঃ ১০০ ছাগলের বাহিনী। গোটা ব্যাপারটা ভাবতেই আমার আক্কেল গুড়ুম।

বিপুল উদ্যমে রি-প্যাকিং শুরু হল। সমস্ত প্যাকিং বাক্স খুলে, বস্তা খালি করে ছাগলওয়ালাকে রেশন বুঝিয়ে দেওয়া হল। কথাবার্তা হল সর্দার জয় সিং-এর সঙ্গেও। রাস্তার ধারেই ৬/৭ টা তাঁবু পাতা হল। একটা বড় পাথরের গায়ে ত্রিপল টাঙিয়ে কিচেন করা হল। দেখতে দেখতে জায়গাটা একটা ছোটখাট মেলার আকার ধারণ করল। কোয়ার্টার-মাস্টার সুশান্ত খুবই ব্যস্ত হয়ে একে ওকে নির্দেশ দিতে থাকল রি-প্যাকিং-এর। এখনকার মত রান্নাঘরের দায়িত্বে গেল প্রবীর। ও দেখি ইতিমধ্যেই একটি কম বয়েসী ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাকে নিজের অ্যাসিস্টেন্ট বানিয়ে ফেলেছে। চট্‌পট্‌ এক রাউণ্ড চা পাওয়া গেল।

আমি, শম্ভুদা আর ডাক্তার একটু লতাগ্রামের দিকে এগুলাম। জানি কাল আর সময় পাওয়া যাবে না। তাছাড়া ওদের নাকি কি একটা উৎসব চলছে এখন। সারা রাত নাচ-গান হবে। একটু এগিয়ে যেতেই কিছু ঘর চোখে পড়ল। রাস্তা আর ধৌলী-গঙ্গার তীর পর্যন্ত ছড়ানো ঘরগুলি। এটি লতাগ্রাম, তবে শীতকালীন গ্রাম। এখন এ গ্রামে কেউ নেই। সব ঘরগুলিই বন্ধ দেখলাম। আশেপাশে ছোট ছোট ক্ষেত রয়েছে। সিম, লাউ ইত্যাদি ফলে আছে। এছাড়াও রয়েছে বহু-রকমের নাম-না-জানা শস্য। গ্রীষ্মকালীন গ্রাম-রাস্তার ডানদিকে। অনেক ওপরে পাহাড়ের গায়ে ছবির মত গ্রামটিকে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ও গ্রামে যাওয়ার মত সময় আর নেই। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, তার ওপর কোয়ার্টার-মাস্টারের নির্দেশ আছে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে হবে।

ফিরে দেখি, সবাই মিলে, হাতে হাতে রি-প্যাকিং প্রায় শেষ। কাল সকালে যাত্রা করার জন্য আমরা প্রায় প্রস্তুত।

লতা সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচু। খুব একটা ঠাণ্ডা নেই। বাইরে হ্যাজাকের আলোয় বসেই খাওয়া সেরে নেওয়া হল। সব-কিছু গুছিয়ে

তাঁবুতে যখন এলাম তখন রাত ৯টা। আমার তাঁবুতে আমরা ৭ জন। ম্যানেজার, কোয়ার্টার-মাস্টার, ডাক্তার, শম্ভুদা, প্রবীর আর দীনেনকে নিয়ে এই ফোর মেন টেণ্টে (4 men tent) দিব্যি সাত জনের হয়ে গেল। সবাই শুয়ে পড়েছে। সারাদিনের একটানা পরিশ্রমে ক্লান্ত সব। শুয়ে পড়তে না পড়তেই সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। কি রকম অদ্ভুত লাগছে পরিবেশটা। ঝর ঝর ঝর ঝর কানের কাছে শুধু ধৌলীর গর্জন। মদ-মন্দ্রিত স্বরে বলে যাচ্ছে, হে অভিযাত্রী, আজ বিশ্রাম নাও। আগামী কালের নতুন প্রভাতে নবীন আলোয় অনুপ্রাণিত হয়ে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে যেও পাহাড়ের কাছে, হিমালয়ের কাছে, ত্রিশূলের কাছে॥

দশ

দশই সেপ্টেম্বর।

লতাগ্রাম।

একটা ঝরঝর আওয়াজের মূর্ছনায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আর একটা ঝিরঝির আওয়াজে হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল। আগের আওয়াজের মত এটাও পাহাড়ের পথে পরিচিত। বৃষ্টি হচ্ছে। পাহাড়ে হাঁটা-পথ শুরু না করতেই বৃষ্টি শুরু। রাত কটা? বোধহয় সাড়ে তিনটে। খুব জোরে না হলেও বৃষ্টির পরিমাণ মন্দ নয়।

ওঠো ওঠো শব্দে হৈ হৈ করে সবাই উঠে পড়ল। তাঁবুগুলো অতি বাজে। এই বৃষ্টিতেই জল ঢুকছে। প্রবীর আর সুশান্ত তাড়াতাড়ি বাইরে বার হল। চারিদিক পরীক্ষা করল। বাইরে প্রচুর রেশন পড়ে আছে। তবে সবই পলিথিন শীট দিয়ে ভাল করে মুড়ে রাখা হয়েছে।

আস্তে আস্তে ভোর হয়ে এল। বৃষ্টিও ধরে এল। এরই মধ্যে প্রবীরের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট আজব সিং হাঁক দিল 'বেড-টি'। এই বৃষ্টির মধ্যেই 'বেড-টি' প্রস্তুত! আজব সিংই বটে।

বাইরে যখন বার হলাম ঘড়িতে তখন সকাল। পুরো আকাশ মেঘে

ঢাকা। তবে মনে হচ্ছে এ মেঘ কেটে যাবে। কুলিরা আসতে আরম্ভ করেছে। দ্বিজেন আর অনিন্দ্য ব্যস্ত হয়ে গেল ওদের নিয়ে। প্রত্যেকের নাম লেখ খাতায়, কে কি মাল নিল লেখ। বিশাল ছাগল-বাহিনীও এসে পড়ল। ইতিমধ্যেই সব মাল বাইরে বার করা হয়েছে। যেসব তাঁবু কাল পাতা হয়েছিল সেগুলো গোটানো হয়ে গেল।

এদিকে কোয়ার্টার-মাস্টারের বাঁশী—আগে টিফিন খাও ও প্যাক-লাঞ্চ নিয়ে নাও। টিফিন খাওয়া হল পাহাড়ের রাস্তার একমেবাদ্বিতীয়ম্ খাওয়া—খিচুড়ি, আচার দিয়ে চেখে চেখে বা বলা যেতে পারে দেখে দেখে। প্যাক-লাঞ্চ দেওয়া হল ডিম সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ আর সুজির হালুয়া।

ইতিমধ্যে সবাই নিজের নিজের রুকস্যাক গুছিয়ে নিয়েছে। এয়ার ম্যাট্রেস, স্লিপিং ব্যাগ, উইণ্ডপ্রুফ জ্যাকেট, ক্লাইম্বিং বুট, গ্লাভ্‌স ইত্যাদি নিজের নিজের পোশাক সবাই ভরে নিয়েছে রুকস্যাকে। সব মিলিয়ে ওজন যা দাঁড়িয়েছে—এটা কাঁধে করে টেনে নিয়ে যেতে হবে ভাবতেই অঙ্গ শীতল হয়ে আসছে।

সবই হল, কিন্তু কুলীদের ঝামেলা আর সমাধান হয় না। এক চিরন্তন পর্বতারোহণ-সমস্যা। ওজন নিয়ে গোলমাল। যতখানি করে মাল বইবে বলে ওরা চুক্তিবদ্ধ ততটা করেই মাল ওদের দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওদের এক কথা—'বহুত জ্যাদা মাল হ্যায় সাব।' স্প্রিং ব্যালেন্স দিয়ে প্রত্যেকটা ওজন করে দেখানো হল। কিন্তু ওরা এইসব যন্ত্রে তেমন ভরসা করতে পারে না। দু হাতে তুলে দেখে আর বলে, 'বহুত জ্যাদা মাল হ্যায়, সাব।' এ তো আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল! এই সব সিধে-পন্থী পাহাড়ী লোকদের বোঝানোও মুশকিল। একবার যদি একটা কিছু মাথায় ঢুকে গেল তো ব্যাস, সেখান থেকে সরায় কার সাধ্য! আর ওরা বেঁকে বসলে অভিযান বানচাল। শেষে ওজন কিছু কমাতে হল, কুলীর সংখ্যা বাড়াতে হল। এ ছাড়াও ওদের নানান দাবী। ওদের দাবী হয়ত ওদের তরফ থেকে ন্যায্য, কিন্তু আমাদের মত অভিযানের পক্ষে তা সব মেনে নেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

ঠিক ৯টায় সবাই প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে কখন যেন মেঘ কেটে গিয়ে একফালি রোদ উঠেছে, একঝলক প্রসন্ন হাসির মত তা আমাদের স্বাগত জানাল।

আমরা গোল হয়ে দাঁড়ালুম। অভিযানের সিনিয়র মেম্বর-হিমালয়-বিশেষজ্ঞ শম্ভুনাথ দাস বললেন ক'টি কথা। বললেন, 'আজ থেকে পায়ে পায়ে পাহাড়ে চলা শুরু। যাত্রার মুহূর্তে মনে রাখতে হবে বিখ্যাত পর্বতারোহীর বিখ্যাত উক্তি 'the mountains have a mysterious way of getting the best of man ······There is no other pursuit which brings about such, physical, mental, emotional and spiritual integration as mountaineering.' অনেক বাধার পাহাড় পেরিয়ে আজ আমরা আমাদের স্বপ্নের পাহাড়ে চলেছি, আমরা যেন ও কথাকে সার্থক করে তুলতে পারি।'

শেষ মুহূর্তে প্রবীর একটা নারকেল বার করে দিল ব্যাগ থেকে। নারকেল ফাটিয়ে যাত্রা শুরু করলেন শম্ভুদা। নারকেল শুভ-যাত্রার প্রতীক।

প্রথম পদক্ষেপ থেকেই চড়াই—শুধু চড়াই নয়, দুরন্ত চড়াই। আরও জানা গেল—আজকের পুরো চলাটাই নাকি এমনি চড়াই। লতাগ্রাম ৭৬০০ ফুট উঁচু। সেখান থেকে খুব সামান্য দূরত্বে আজকের ক্যাম্প লতাখরক পৌঁছুতে হবে ১২১০০ ফুট উঁচুতে। সর্দার জয় সিং হাত তুলে দেখিয়ে দিল, ঐ যে, পাহাড়ের মাথায় বুগিয়াল (alp.) মত দেখা যাচ্ছে ওর ওপরেই আমাদের ক্যাম্প। বাঃ, তবে আর কি, চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন তো হয়েই গেল।

একটু উঠেই পড়ল লতাগ্রাম—আমাদের পথের শেষ গ্রাম, শেষ মনুষ্য-বসতি। গ্রাম ছড়ানো পাহাড়ের গায়ে। উঁচু নীচু অনেক ঘর। তারই ফাঁকে ফাঁকে সবজির বাগান, চাষের ক্ষেত। বাড়ির ছাদে মুরগি আর আশেপাশে ছাগল। গ্রামের মাঝখান দিয়ে একটাই পথ। আমরা সেটা দিয়েই চলেছি। একটু ওপরে সাদা রঙের মন্দির। নন্দাদেবীর

মন্দির। গ্রামের কেন্দ্রীয় আকর্ষণ।

যেতে যেতে দেখি, গ্রামের সব লোক বিচিত্র পোশাক পরে বিভিন্ন বাজনা বাজাতে বাজাতে আসছে। সঙ্গে গ্রামের মেয়েরাও আছে। তাদের পোশাক আরও জাঁকজমক পূর্ণ। প্রত্যেকেই ভারী ভারী রুপোর গয়না পরেছে, মাথায় গুঁজেছে ফুলের বাহার। পুরুষ নারী সবারই কপালে বড় করে সিঁদুরের ফোঁটা। সামনে আছেন প্রধান পুরোহিত। পীতবস্ত্র পরনে। গলায় বিশাল গাঁদা ফুলের মালা, হাতে খোলা তরবারী। ওদের আজ পরব। দেবী নন্দাভগবতীকে নিয়ে ওরা চলেছে রেণী গ্রাম পেরিয়ে ঋষি ও ধৌলীগঙ্গার সঙ্গমে। স্নান হবে, পূজো হবে, তারপর ফিরে আসবে গ্রামে। গ্রামে সারা রাত ধরে চলবে হৈ-হৈ নাচ-গান খাওয়া-দাওয়া। উৎসবের আনন্দ ওদের চোখে মুখে, উৎসবের রেশ ওদের মনে। সমবেত গানে বাজনায় আকাশ-বাতাস মুখরিত করে ওদের পথে চলে গেল ওরা। প্রধান পুরোহিতের আশীর্বাদ নিয়ে আমাদের পথে এগিয়ে চললাম আমরা।

পথ খুব কঠিন কিছু নয়, তবে শুধু চড়াই আর চড়াই। তবু পথ চলার আনন্দে, হিমালয়ের অপূর্ব শোভায় মেতে দ্রুত পা চালিয়েছে সবাই। নিজস্ব চলার ভঙ্গীতে কেউ গেছে এগিয়ে, কেউ পড়েছে একটু পেছিয়ে। তবে মোটামুটি জুটি বেঁধে নিয়েছে সব। চমৎকার চলে সদা-অনিন্দ্য, জিতু-কিঙো, কালী-শোভন। ডাক্তারও চমৎকার চলছে, সমান তালে চলছে সুশান্ত প্রবীরের সঙ্গে। আমি আর দ্বিজেন রয়েছি সবার শেষে। আজ আমরা duty rope. আমাদের সবার শেষে থাকতে হবে।

প্রায় ১২টা নাগাদ একটা জলস্রোত পেলাম। দেখি আগের দলের শম্ভুদা, হীরা আর অনিমেষদা বসে আছে। এরা একটু লেট লতিফ। অবশ্য আজ প্রথম দিনেই যা রাস্তা, সবারই অবস্থা কাহিল।

শুনলাম আজ পথে আর কোথাও জল পাওয়া যাবে না। তাই ওয়াটার-বটলে জল তো ভরে নিতেই হবে, প্যাক-লাঞ্চও খেয়ে নেওয়া যেতে পারে। তাই হল।

আবার চলা শুরু। ওরে বাবা, এ যে একেবারে স্বর্গের সিঁড়ি। শুধু ওঠা আর ওঠা। মাথার ওপর নীল আকাশ। চড়া রোদ। পিঠে মালের বোঝা আর অফুরন্ত চড়াই টানতে গিয়ে এমনিতেই ঘাম ছুটে যাবার দাখিল। তবু রক্ষা চারদিকে বড় বড় গাছ, ঝোপঝাড়, জঙ্গল। বেশীর ভাগ সময়েই ছায়ায় ছায়ায় চলেছি।

পথের দুপাশে বহুরকমের গাছ। জানা অজানা বহু গাছ চোখে পড়ল, কিন্তু হিমালয়ের ৯/১০ হাজার ফুট উচ্চতায় যে গাছের দল তাদের চেহারায় মন কেড়ে নেয় সেই পাইন, দেওদার বা ফার একদম চোখে পড়ল না।

অনেক উঁচুতে উঠে এসেছি। কিন্তু এখান থেকেও বহু নীচে পেছন দিকে লতাগ্রাম দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে হলুদবরণ ক্ষেত, দেখা যাচ্ছে খেলাঘরের মতো ছোট ছোট ঘরগুলি। আরও নীচে ধোয়া ধোয়া এক রুপোলী সুতোর মত দেখা যাচ্ছে ধৌলী-গঙ্গা।

দেখতে দেখতে ৪টে বেজে গেল। লক্ষ্যের ধারেকাছেও পৌছুতে পারলাম না। উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন চোখে পড়ছে। বড় বড় গাছপালা শেষ হয়ে এলো। এবার শুধু ঝোপঝাড়। হিমালয়ে হাজার এগারোর পর থেকে বড় গাছ অদৃশ্য হতে থাকে। তারপর কিছুদূর পর্যন্ত থাকে ভূজগাছ, জুনিপারের ঝোপ ইত্যাদি। তারপর আরও ওপরে উঠে গেলে, ১৩/১৪ হাজার ফুটে পৌছে গেলে, তাও শেষ হয়ে যায়। সবুজের আর কোন চিহ্ন থাকে না। শুধু পাথর, বালি, মাটি, ন্যাড়া পাহাড়ের গা, মাঝে মধ্যে বরফ। তারও ওপরে শুরু হয় চিরতুষারের দেশ, যেখানে শুধু একটাই রঙ—সাদা আর সাদা।

তার মানে অন্ততঃ ১১ হাজার ফুটের ওপরে চলে এসেছি। ৫টাও বেজে গেল। কিন্তু কোথায় আমাদের শিবির অঞ্চল? আগের সবাই এগিয়ে গেছে। অনিমেষদা আর হীরালাল বেশ পিছিয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড ক্লান্ত আমরাও। প্রথম দিনই এত উচ্চতা কারই বা সহ্য হয়!

দেখতে দেখতে সামনের পাহাড় তোলমাজিন্‌টির প্রায় ওপরে চলে

এলাম। সন্ধ্যে হয়ে এল। চারিদিক থেকে মেঘ নেমে আসছে। কিন্তু দূরের জিনিসও আর দেখা যাচ্ছে না। একসময় তো মেঘে ঢাকাই পড়ে গেলাম। ক্রমাগত দাঁড়াতে হচ্ছে। প্রচণ্ড হাঁপিয়ে যাচ্ছি। অথচ দাঁড়ালেই, মনে হচ্ছে, ঠাণ্ডাতে সব জমে যাবে। অতএব ওঠো ওঠো— এক পা এক পা করে।

অবশেষে সন্ধ্যে ৭টায় অবসন্ন শরীরে পৌঁছলাম লতাখরক (১২,১০০´)। অনেকগুলো তাঁবু পড়েছে দেখলাম। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। কোন দিকে না তাকিয়ে একটা তাঁবুতে ঢুকে পড়লাম। একটু বিশ্রামের একান্ত দরকার।

কখন রাত বেড়েছে, কখন রাতের খাওয়া খিচুড়ি শেষ করলাম মনে নেই। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা হিসেবে লতাখরক চূড়ান্ত একথা মানতেই হবে।

* * *

বেড-টির ডাকে ঘুম ভাঙলো। খারাপ লাগছে না। চারিদিকে ফর্সা হয়ে এসেছে। সবাই উঠে পড়েছে, দৈনন্দিন ব্যস্ততাও শুরু হয়ে গেছে।

তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলাম। মাথার ওপরে নীল আকাশ। অনেক নীচে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে জমে আছে মেঘ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘের দল ওপরে আসবে, আকাশের রঙ যাবে পালটে। হিমালয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়াই শ্রেয়।

সুশান্ত কিচেন বয় আজব সিংকে নিয়ে ব্যস্ত। দ্বিজেন ব্যস্ত তার কুলী-বাহিনী নিয়ে। এত কুলীকে থাকতে দেবার মত তাঁবু আমাদের নেই। ওরা তাই রাত কাটিয়েছে কাছের একটা গুহাতে। এ রাস্তায় সবকটা শিবিরের কাছেই নাকি এরকম গুহা আছে।

খেলা দেখাল ছাগল-বাহিনী। ভোর হতে না হতেই ওদের পিঠে মালের ব্যাগ বেঁধে দেওয়া হয়। ওদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, অন্ততঃ আমাদের তাই মনে হয়েছে, তরতর করে উঠে যাচ্ছে অত্যন্ত খাড়াই পাহাড়ের গা বেয়ে। দেখতে দেখতে বিশাল ছাগল-বাহিনী ঐ দূরের

পাহাড়ের গা বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওদের মালিক যে লোকটি সঙ্গে থাকে তাকেও সব সময় ছুটতে হয় ওদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য।

ক্রমে আমাদের ছেলেরাও বেরিয়ে পড়তে লাগল। প্রথম দিনের চলার পরই দেখলাম জুটির কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সবার আগে বার হল সদা-অনিন্দ্য, জিতু-কিমো, শোভন-দ্বিজেন। ডাক্তার কিন্তু চূড়ান্ত ফিট্। সমান তালে প্রথম দলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়ে পড়ল কুলীরাও, শেরপা কিতারে গেল ওদের সঙ্গে। আজ ডিউটি রোপে থাকল অনিমেষদা আর নিমা। ওদের একটু আগে থাকলাম আমি আর হীরা।

লতাখরক থেকে বেরিয়েই বিরাট এক চড়াই। অন্তত হাজার ফুট। কোন গাছপালা নেই। শুধু ঘাস আর জুনিপারের ঝোপ। ফলে একটা সুবিধে হচ্ছে, বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে সকালের আলোয় নীল নীল ধোঁয়া ধোঁয়া অসংখ্য পাহাড়, পাহাড়ের পর পাহাড়।

প্রায় একদমে উঠে গেলাম চড়াইয়ের মাথায়। ডানদিকে মালাটুনি পাহাড়শ্রেণী। চারদিকের কোন পাহাড়টাই ১৬/১৭ হাজারের বেশী উঁচু নয়। বরফ নেই এগুলিতে। নীচের দিকে বড় বড় গাছের জঙ্গল আর ওপরের দিকটা ঘাস আর নিরেট পাথরে বোঝাই। প্রথম দিনের ধাক্কা সামলিয়ে একটু রপ্ত হয়ে গেছি। কাঁধের সঙ্গে রুকস্যাকের বোধহয় একটা সমঝোতা হয়ে গেছে। বেশ মেজাজেই চলেছি। যতদূর জানি খুব বড় চড়াই আজ আর নেই। শুধু উঁচুনীচু পথ। তবে খাড়া পাহাড়ের গা ঘেঁষে। কিছু কিছু পথ চলার দাগ এখানেও রয়েছে। প্রতি বছরই লতাগ্রাম অঞ্চলের মেষপালকেরা আসে এদিকে। এটা তাদের পশুদের বিচরণ-ক্ষেত্র। ওদের যাতায়াতে মাঝে মধ্যে ক্ষীণ পথরেখা তৈরী হয়েছে আর সেটাই আমাদের পথনির্দেশ করছে।

বেশ ভালই চলছি। একটার পর একটা পাহাড়ের বাঁক পেরিয়ে চলেছি। পরিশ্রম তুলনামূলক ভাবে অনেক কম। আমার কিছুটা আগে শম্ভুদা, দীনেন আর কালী। মাঝে মাঝেই বাঁকের মুখে ওদের

দেখা যাচ্ছে। হীরা একটু পেছনে আর অনিমেষদাকে নিয়ে নিমা আছে অনেক পেছনে।

কখন যেন হঠাৎ দেখি, আকাশ মেঘে ঢেকে গেছে। আরে, এই তো নীল আকাশ ছিল! হিমালয়ের মজা এইখানেই। ক্ষণেকে ক্ষণেকে পরিবর্তন। চিন্তিত হলাম। তবে কি—

ভাবতে না ভাবতেই বৃষ্টি শুরু হল। ঠিক বৃষ্টি নয়, তুষার পড়ছে বলা যায়। চলার গতি বাড়ালাম। তুষারও বাড়তে লাগল। Wind-proof jacketটা পরে নিলাম। ক্যামেরাটা ঢোকালাম তার ভেতরে।

দেখতে দেখতে চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। ঝরঝর করে তুষার পড়তে শুরু করল। মুহূর্তে পথ হয়ে গেল অত্যন্ত পিচ্ছিল ও মারাত্মক। তীব্র বেগে হাওয়া শুরু হয়ে গেল। পেছনে তাকিয়ে হীরাকে দেখতে পেলাম না। সামনেও কাউকে দেখা গেল না। বেশী দূর নজরই চলছে না। জুতো মোজা প্যাণ্ট সব ভিজে গেল। আর তো পারি না। হাতে পায়ে অসহ্য ঠাণ্ডা লাগছে। তবু চলতেই হচ্ছে। আমার উপায় নেই। একে ন্যাড়া পাহাড়, কোন গুহা নেই, আর ধরাসু পাহাড়ের এ অঞ্চলটা এতই খাড়াই যে কোন পাথরের আড়ালে যে একটু আশ্রয় নেব তারও উপায় নেই। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগরে দিশাহারা নাবিকের মত অবস্থা তখন। তবু এগুতেই হবে। প্রতিটি বাঁকের মুখেই মনে হচ্ছে এবার নিশ্চয়ই তাঁবু দেখতে পাব, কিন্তু প্রত্যেক বারই আর একটা বাঁক ছাড়া কিছুই নজরে পড়ছে না। অথচ রাস্তা যা শুনেছিলাম আর সময় যা হয়েছে তাতে শিবির খুব দূরে থাকার কথা নয়। রুকস্যাকের পকেট থেকে পলিথিন শীট বার করে মুখ আর মাথা ঢাকার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঐ দুরন্ত হাওয়া—সাধ্য কি! মাঝখান থেকে হাত দুটো ভিজে গেল আর অত্যধিক ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ায় যন্ত্রণা করতে আরম্ভ করল।

এমনই যখন অবর্ণনীয় অবস্থা, মুহ্যমানের মতো চলেছি, কত সহস্র বাঁক পেরিয়েছিলাম মনে নেই, হঠাৎ একটা বাঁকের মুখ থেকে তাকিয়ে দেখি সামনের বাঁকের মুখে মাটিতে পলিথিন শীট দিয়ে ঢাকা রয়েছে কি

যেন ! ঐ হাওয়ায় আর তুষারপাতে ভাল দেখা যাচ্ছে না। তবে মনে হল, আমাদের মালপত্র, রেশন পলিথিন শীট দিয়ে ঢাকা রয়েছে—প্রতি দিনই শিবিরে পৌঁছে যা করা হয়। তার মানে শিবির এসে গেছে, কাছাকাছি কোথাও তাঁবু আছে। কি আনন্দ ! তাহলে আর থামা নয়। যত কষ্টই হোক, কোন রকমে তাঁবুতে পৌঁছতেই হবে। শরীরে যেন দ্বিগুণ জোর ফিরে এলো।

কিন্তু এ কি ! ওটা নড়ছে কেন ? হঠাৎ দেখি ওখান থেকে পলিথিন শীট মুড়ে একজন উঠে দাঁড়াল। তার মানে ! তার মানে ওরা তো শম্ভুদা-কালীদের দল ! উইণ্ডপ্রুফের লাল রঙ দেখে বুঝলাম ওটা কালী। প্রচণ্ড তুষারপাত আর হাওয়ার মোকাবিলা না করতে পেরে অসহায় ওরা মাটিতে উপুড় হয়ে পলিথিন শীট মুড়ে পড়ে আছে ! প্রকৃতির লীলার সামনে কত অসহায়, কত ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর আমরা।

কিন্তু, না। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে লড়েও বাঁচতে হবে আমাদের। এগিয়ে যেতে হবে লক্ষ্যসাধনে। কিন্তু এই মুহূর্তে সত্যি আর এগুনো সম্ভব নয়। সামনে কয়েকটা পাথর দেখলাম। দু-একটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আছে। তারই একটার গা ঘেঁষে বসে পড়লাম। পলিথিন শীটটা দিয়ে মুড়ে নিতে চাইলাম চারদিক—ঐ ওদের মতই, কিন্তু যা হাওয়া আর তুষার, এদিক গুঁজে দিই তো ওদিক খুলে যায়, ওদিক চেপে ধরি তো এদিক ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়। ক্রমেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে জ্বালা করতে লাগল। ক্রমাগত খুলে আর মুঠো করে হাত গরম রাখতে চেষ্টা করলাম। কান, নাকের ডগা, হাত-পায়ের আঙুল—সবই জ্বলছে, কি দিয়ে কি করব ভেবেই পাচ্ছি না ! এক প্রাণপণ যুদ্ধ !

উদ্দাম প্রকৃতির সঙ্গে আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে জানি না কতক্ষণ লড়েছি, মনে হচ্ছিল সেই প্রস্তর যুগ থেকে, হঠাৎ খেয়াল হল বাইরেটা একটু পরিষ্কার। তুষার পড়া একটু কমেছে। তবে তো উঠতে হয়। এভাবে এখানে বসে থাকলে, বেশী দেরি হবে না, ঠাণ্ডায় জমেই হৃদ-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু ইচ্ছাশক্তির জোরেই উঠলাম, এগুতে

চাইলাম। দেখি পেছনেই অনিমেষদা, হীরালাল আর নিমা। হীরার সে কি চেহারা! যেন একটা ধ্বংসস্তূপ। ওদের দিকে তাকানোর সময়ও নেই, ক্ষমতাও নেই। একটু নিশ্চিন্তি, সঙ্গে অভিজ্ঞ শেরপা নিমা আছে। শরীরে শক্তি নেই একফোঁটা। তবু চড়াই যদি বা ওঠা যাচ্ছে, উৎরাইয়ে নামা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নতুন বরফ পড়ে পথ এত পেছল হয়ে গেছে যে চার হাত-পায়ে ধরে ধরে বসে বসে নামা ছাড়া কোন উপায় নেই। অতি সাবধানে, প্রতিমুহূর্তে নিজের হাত-পায়ের কাঁপুনির সঙ্গে লড়াই করে এক পা এক পা করে নামতে হচ্ছে। নইলে এক মুহূর্তে পুরোটা নামা যাবে বটে, তবে আর ওঠা যাবে না।

সেদিন জানি না কি ভাবে তাঁবুতে পৌঁছেছিলাম। শুধু মনে আছে একটা বীভৎস উৎরাই পেরিয়েই সামনে এক বীভৎসতম চড়াই দেখে একেবারেই থেমে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, আর না, আর এক পাও চলতে পারব না। যা ঘটে ঘটুক, আমি বসি এখানে, আর পারি না, একটু শান্তি চাই। যদি চিরদিনের মত শান্ত হয়ে যাই দুঃখ নেই, আমার যতটুকু করার ছিল করেছি।

ঠিক তখনি চিৎকার শুনলাম—

—'তাঁবু দেখা যাচ্ছে, বিজয়দা, তাঁবু দেখা যাচ্ছে।'

—কোথায়? কোথায়? উদভ্রান্তের মত চাইলাম চারদিকে। ঐ, ঐ যে কালী! হ্যাঁ, অনেক উঁচুতে চড়াইএর মাথায় লাল উইণ্ডপ্রুফটা দেখা যাচ্ছে। কালী হাত নেড়ে ডাকল আমায়।

—'বিজয়দা তাঁবু দেখা যাচ্ছে।'

জীবনের জয় বোধহয় এখানেই। স্থবিরতার এক চরম মুহূর্ত থেকে জীবনের সচলতায় ফিরে এলাম। কেমন করে যেন, দুর্মূল্য জীবনের অমূল্য টানে, পার হয়ে এলাম সেই দুঃস্বপ্নের মত চড়াই। দূরে, অনেক নীচে রঙ-বেরঙের তাঁবুগুলি সাতরঙা জীবনের মতই লাগল আমার কাছে। স্বপ্নোত্থিতের মত নামতে লাগলাম, সামনে শুধু একটাই মরূদ্যান—ঐ শিবির, ঐ আশ্রয়, ঐ উষ্ণতা, ঐ জীবন!

—'বিজয়দা, চা নাও, চা।'

কে ওরা ? দ্বিজেন আর শোভন ? না, ওরা দেবদূত ? জীবনের উষ্ণ পানপাত্র হাতে দাঁড়িয়ে ওরা মুক্তির দূত !

আঃ, এই তো জীবন ! এর জন্যই তো এত কষ্ট করে এখানে আসা !

—'রুকস্যাকটা আমায় দিয়ে দাও। তুমি চা খাও, বিস্কুট খাও।'

বিস্কুট গলা দিয়ে নামল না। চা একটু খেলাম। ওরা আমার রুকস্যাকটা খুলে নিতে চাইল।

—'ঠিক আছে দ্বিজেন। এসেই তো গেছি। ঐ তো তাঁবু দেখা যাচ্ছে। তুমি বরং শোভনকে নিয়ে এগিয়ে যাও। অনিমেষদা, হীরাকে দেখ। ওদের অবস্থাও নিশ্চয়ই আমার মত।'

তারপর একসময়, অন্ধকার হতে তখন আর বাকী নেই, পৌঁছুলাম তাঁবুতে। কোন রকমে জামা-কাপড় পাল্টে, স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছে। সারাদিন কিছুই পেটে পড়েনি। প্যাক-লাঞ্চ সঙ্গেই ছিল কিন্তু ওই রাস্তা আর তুষারঝড়ে, কিছুই মুখে দেওয়া হয়নি।

ডাক্তার এসে দেখল। ওরা প্রথম দল, তুষার পড়ার মুখেই শিবির করে ফেলতে পেরেছিল। আজকের ঝড়টা তাই আমাদের ওপর দিয়েই গেছে।

মুহ্যমানের মতো পড়ে রইলাম। সারা মনে জোর করে শুধু এক চিন্তা আনলাম—এ রাত থাকবে না। সকাল হবে। রোদ উঠবে। সবাই আবার একসঙ্গে এগিয়ে যাব আমাদের লক্ষ্যের পথে।

*　　*　　*

অবাক কাণ্ড ! কে বলবে গতকাল এমন প্রচণ্ড ঝড় গেছে ! মাথার ওপরে ঝকঝকে আকাশ। এত নীল যে আকাশ হতে পারে তা বুঝি মনেই ছিল না। চারদিকে অজস্র রোদ্দুর কাঁচা সোনার মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আকাশ-বাতাস, ঘাস-নদী-পাথর সবই যেন সজীব, সতেজ।

প্রাণের বন্যা আমাদের মধ্যেও। অকৃপণ সূর্যালোকে প্রাণ-প্রাচুর্যে

ভরপুর সবাই। বিচিত্র চেহারা নিয়েছে ধরাসু (১৩,৬০০´) শিবির। রঙ-বেরঙের ইতস্তত-ছড়ানো তাঁবুগুলো মেলা-প্রাঙ্গণের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। সবাই তাদের সব সাজ-সরঞ্জাম বাইরে বের করেছে। কাল তুষার-ঝড়ের কবলে পড়ে শুকনো বাঁচেনি কিছুই—ঘাসের ওপর, তাঁবুর গায়ে, পাথরের ওপর, চতুর্দিকে এক বিরাট এলাকা নিয়ে রোদে মেলে দিয়েছে সব। নিজেরাও—কেউ শুধু গেঞ্জী গায়ে, কেউ বা পুরো পোশাকে, আবার কেউ একান্তই খালি গায়ে রোদ পোয়াতে বসে গেছে। কত রঙের বাহার। সব মিলিয়ে গোটা শিবিরটায় যেন এক উৎসব।

ডাক্তার কিন্তু কর্মব্যস্ত। সবার কাছেই যাচ্ছে। খবর নিচ্ছে শরীর-গতিকের। 'কিঁউ লিডার সাব, কেমন লাগছে?'

—'ফাইন। তা তোমার আর সব ক্লায়েন্টের খবর কি?'

—'সব ফিট। শুধু হীরালাল—'

—'কি হয়েছে হীরালালের?'

—'না না, কিছুই হয়নি। শরীর একদম সুস্থ। তবে পর পর হু'দিনই যা রাস্তা গেল, তার ওপর গতকালের ঝড়ের ধাক্কা। একটু টাল খেয়েছে আর কি!'

—'কিচ্ছু করতে হবে না। ও এমনি ঠিক হয়ে যাবে। আজ দেখো, সারাদিন ওয়েদার ভাল থাকবে। আর রাস্তাও শুনেছি এই হুদিনই সবচেয়ে বেশী শক্ত ছিল। একটু রোদ লাগিয়ে নিক, দেখবে হীরা গড়গড়িয়ে চলছে।'

সবাই বোধহয় জেনে গেছে আজকের রাস্তা অনেক কম। বড় জোর ৫ ঘণ্টার। অতএব দেরি করে বার হলেও হবে। ছুটির দিন যেন। ইতিমধ্যে টিফিন পৌঁছে গেছে হাতে হাতে। হাসি, গল্পে, ঠাট্টায় এক রবিবাসরীয় আমেজ তৈরী করেছে সব!

—'গুড্ মর্নিং সাব।'

—'গুড্ মর্নিং। সামনে দাঁড়িয়ে গোবিন্দ সিং,, থুড়ি, শিকারী গোবিন্দ সিং। পায়ে বুটজুতো, খাকি প্যাণ্ট, খাকি জামা—হুটো বুক-

পকেট। কোমর-বন্ধনীও রয়েছে। আধা-মিলিটারি যেন। কাঁধে বন্দুক নিয়ে এখন অবশ্য পুরো দস্তুর শিকারী।

—'সাব, অর্ডার দিজিয়ে। ম্যায় স্টার্ট'—

গোবিন্দ সিং কিছুদিন সীমান্ত-রক্ষী বাহিনীতে ছিল। ওর কথাবার্তার ঢংই আলাদা। একই গ্রামের লোক হয়েও ও আর সব কুলীদের থেকে আলাদা। খুব সচেতন ভাবেই ও একটা শ্রেণীগত তফাত রাখতে চেষ্টা করে। অবিশ্যি ওর সঙ্গীরাও, যারা কুলী হয়ে আমাদের দলে চলেছে, যথেষ্ট সমীহ করে ওকে। ওর যথেষ্ট প্রভাব কুলীদের দলে। হবে নাই বা কেন? একে শার্ট-প্যাণ্ট তার জুতো-কোমরবন্ধনী এবং কাঁধে বন্দুক। এতেও রক্ষা নেই—কথা বললেই দু-চারটে ইংরাজী শব্দ দুমদাম ব্যবহার করবেই। এক বিস্ময়-মেশানো ভক্তি-ভাব নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে কুলীরা। এখন আরও বিশেষ করে এইজন্য যে এই অভিযানে ও কুলী হিসেবে নয়, এসেছে শিকারী হয়ে।

সে এক মজার ব্যাপার। সে দিনটা বোধ হয় ১০ই। লতাগ্রাম থেকে সেদিন আমাদের ট্রেকিং শুরু হবে। বাঁধা-ছাঁদা নিয়ে, কুলীদের নিয়ে সবাই ব্যস্ত, হঠাৎ দেখি সর্দার জয় সিং কয়েকটি কুলীকে নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত।

—'কি ব্যাপার জয় সিং?'

—'সাব, ইয়ে হ্যায় গোবিন্দ সিং। হর ইস্‌পিডিশন মে যাতা। ওর বন্দুক আছে। ও খুব ভাল শিকারী। সব দলকে ও বড়াল মেরে দেয়।'

বড়াল একধরনের শিংবিহীন পাহাড়ী হরিণ। সম্বর জাতীয়। এ অঞ্চলে বড়াল আছে শুনেছি। তা একটা মারতে পারলে মন্দ হয় না।

কৌতূহলী হলাম। সঙ্গের সব কুলীরাই দেখলাম ওর সম্বন্ধে আগ্রহী, সবাই চাইছে গোবিন্দ সিং দলের সঙ্গে চলুক। আমাদের ছেলেরাও কেউ কেউ এসে দাঁড়িয়েছে এখানে। সব শুনেটুনে বললে, 'নিয়ে নাও না। ও তো শুধু কুলীদের রেটে টাকা চাইছে। দিন কুড়িতে কত আর

পড়বে। একটা বড়াল মারতে পারলেও পয়সা উসুল হয়ে যাবে। আর তাছাড়া অভিযানে বেরিয়ে শিকার করে হরিণ মেরে খাওয়া এর একটা আলাদা রোমাঞ্চ, কি বল ?'

কথা তো সবই ঠিক। ভাবতে আমারও ভাল লাগছে, লোভও হচ্ছে। কিন্তু শিকারীর দিকে এক নজর তাকিয়েই কেমন জানি খটকা লাগল, চাউনির মধ্যেই যেন একটা চালাকি চালাকি ভাব, যেন সব বুঝে গেছে। এই বেশী বুঝে যাওয়া শেষ পর্যন্ত অতি মারাত্মক বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সবাই দেখলাম ওকে চাইছে। আমাদের ছেলেরাও। ওরা তো হরিণের মাংসের চিন্তাতে এখন থেকেই রোমাঞ্চিত। কুলীর দলও সমস্বরে আবেদন জানালো। ওদের দৃঢ় বিশ্বাস, গোবিন্দ সিং ইচ্ছে করলে রোজই একটা বড়াল মেরে আনতে পারবে।

—'ঠিক হ্যায় ভাই গোবিন্দ সিং। চলো তুম হামারা সাথ। দিখাও তুমহারা খেল।' তা, গত দু'দিন ধরে সে খেল দেখিয়ে আসছে। কোন মাল ওকে বইতে হয় না। অন্য কোন কাজও করতে হয় না। ওর খাবারও তৈরী করে অন্য কুলীরা। ও সকাল হলেই বন্দুক কাঁধে নিরুদ্দেশ হয়, ফিরে আসে সন্ধ্যের পর। কোথায় যায়, কি করে ওই জানে। শুধু জানি, অন্ততঃ এ দু'দিনে কোন বড়াল ওর বন্দুকের নিশানা হবার মতো সৌজন্য দেখায়নি। আর আমরা গত দুদিন ধরেই, হরিণের মাংস উদরস্থ করার বদলে সকাল সন্ধ্যেয় গোবিন্দ সিংএর আশার বাণী উদরস্থ করে যাচ্ছি। জানি না কতদিন এটা হজম হবে।

আজ সকালেও ও লেকচার আরম্ভ করতে যাচ্ছিল—আমি কিছু বলার আগেই সবাই হৈ হৈ করে উঠল। 'কি বাবা গোবিন্দ সিং, তোমার বড়াল কি হলো ?'

—'আরে বড়াল নেহি তো ছোটালই লাও।'

—'কমসে কম একখানা ছবি তো দিখাও। দৃশ্যেন ফিফ্‌টি পারসেন্ট হোক !'

—'তুমি যে বাওয়া, সুকুমার রায়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছ! খুড়োর

ফলে তবু একটা কিছু থাকত চোখের সামনে, তুমি তো দেখছি স্রেফ নাম শুনিয়েই হু'দিন হাঁটিয়ে দিলে আমাদের।'

এতগুলো লোকের সমমেত আক্রমণেও কিন্তু গোবিন্দ সিং আশ্চর্য রকম অবিচল। ছু পা এগিয়ে গিয়ে বন্দুকে হাত রেখে দাঁড়াল, 'সাব, তুমলোক দেখতে যাও। আজ নেহি তো কাল, মিলেগা জরুর। লিডার সাব, য্যায়সে বোলা, খেল হাম জরুর দেখায়েঙ্গে।'

* * *

সবকিছু গুটিয়ে বার হতে ৯টা বেজে গেল। ধরাস্থ ক্লিফের (cliff) তৃণাঞ্চল পেরিয়ে এক নিঃশ্বাসে উঠে এলাম মালটুনি পাশের (১৩,৮০০´) মাথায়। ঠিক এই জায়গাটাকে স্থানীয় লোকেরা বলে 'নন্দাদেবী তলোয়ার'। এখানে, গিরিপথের উপর পাথর বসিয়ে বসিয়ে একটা চূড়ো মতন (cairn) করেছে ওরা। তার ওপর বসিয়ে দিয়েছে হু'টো তলোয়ার, আড়াআড়ি ভাবে। নন্দাদেবীর পবিত্রলোকে প্রবেশের দ্বাররক্ষী এই 'নন্দাদেবী তলোয়ার'। যা কিছু অশুভ, যা কিছু অমঙ্গলময়, নন্দাদেবী-অঞ্চলে প্রবেশের অধিকার তার নেই। শুদ্ধ অন্তরে, বিনম্র চিত্তে আজ আমরা এসে দাঁড়িয়েছি নন্দালোকের এই সিংহদ্বারে। পাহাড়কে চ্যালেঞ্জ জানানোর কোনরকম স্পর্ধা আমাদের নেই। শুধু বলি—আমরা ভালো-বাসতে চেয়েছি তোমাদের, তোমাদের কঠিন অথচ খাঁটি পরশমনির ছোঁয়া পেতে চেয়েছি অন্তরে, তোমাদের দৃপ্ত শুভ্রতার প্রভাবে সব কলুষতা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছি—আমাদের গ্রহণ করো—হিমালয়, আমরা তোমার কাছে যেতে চাই।

এই মুহূর্তে আমরা নন্দাদেবী-রক্ষাপ্রাচীরের বাইরের প্রাচীরটির ওপরে দাঁড়িয়ে। এই পর্বতপ্রাচীর একদিকে হুনাগিরি অপর দিকে ত্রিশূল পর্যন্ত বিস্তৃত। আমরা দেখতে পাচ্ছি হনুমান-শৃঙ্গের (১৯,৯৩০´) পশ্চিম দিক, দেখতে পাচ্ছি উত্তরে বেতারথলি (১৯,১৩১´) শৃঙ্গের উত্তর দিক। আর সামনের দিকে, অনেক নিচে,—ঐ ডিব্রুঘেটার চারণভূমি। ছোট্ট একটা ঘাসের প্রান্তর, এত উঁচু থেকে আরও ছোট মনে হচ্ছে।

ও বাবাঃ, এ যে প্রচুর নামতে হবে! একবার ফস্কে গেলে বা গড়িয়ে গেলে, মনে হচ্ছে, সোজা গিয়ে ওখানেই থামব।

পাহাড়ের পথে ওঠার চেয়ে নামা আরও শক্ত। চড়াইএ উঠতে দম লাগে প্রচুর, পরিশ্রমও হয় খুব, কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা থাকে কম। কিন্তু নিচে নামতে গিয়ে প্রতিমুহূর্তেই মনে হয় দেহের ভারসাম্য থাকছে না, পিঠের ভারী রুকস্যাকটার জন্যও টালমাটাল অবস্থা হয়, খালি মনে হয় এই বুঝি পা স্লিপ করল, এই বুঝি গড়িয়ে গেলাম! আর উৎরাইয়ে একবার স্লিপ করলে নিজেকে আটকে রাখা হয়ে যায় মুশকিল।

দেখতে দেখতে অনেক নীচে নেমে এলাম। ধীরে ধীরে চারপাশের গাছপালার চেহারাও গেল পালটে। একসময় দেখলাম অতি পরিচিত সেই সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনে ঢুকে পড়েছি। এই সব গাছ,—পাইন, ফার, দেওদার তাদের ঋজু দৃপ্ত ভঙ্গী নিয়ে, বিশালতা নিয়ে পাহাড়ের সঙ্গে যেন একাত্ম। এদের ছাড়া হিমালয়ে বিমোহিত সৌন্দর্য যেন অসম্পূর্ণ।

কখনও গাছের গুঁড়ি টপকে, কখনও ডালপালার তলা দিয়ে, কখনও বা দু হাতে শেকড় ধরে নামতে লাগলাম আমরা। ক্রমাগত নামছি আর নামছি। একটা জলস্রোত। পাইনের মোটা গুঁড়ি ফেলা আছে, নিশ্চিন্তে পার হয়ে এলাম। একটু যেন উঠলাম কিন্তু আবার নামলাম তার চেয়েও বেশী। গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ। মাথার ওপর বার্চ আর দেওদারে আকাশ ছাওয়া, জমিতে বহুবিচিত্র গাছের জঙ্গল, বেশী দূর নজরও চলে না এমন ঘন।

অকস্মাৎ জঙ্গল শেষ, এক টুকরো খোলা আকাশ, ডিব্রুঘেটা চারণভূমি। সাধারণত এখান অবধি আসে মেষপালকরা। বর্ষার পর, যখন সব ঘাস বড় হয়ে ওঠে, আসে ওদের অন্যতম জীবিকা পশুর দল নিয়ে। ঠিক তার আগেই বাঁদিকে দেখলাম একটা বিরাট গুহা, অনায়াসে ১৫/২০ জন রাত কাটাতে পারে সেখানে।

ঘাসের প্রান্তর পেরিয়ে আর একটা জলস্রোতের পাশে আমাদের ডিব্রুঘেটা শিবির।

অদ্ভুত জায়গাটা। চারিদিকে বড় বড় গাছ। তার নীচে নাম-না-জানা ফুলগাছের জঙ্গল, বুক-সমান উঁচু। এরই মধ্যে হবে আমাদের তাঁবু। দেখতে দেখতে সাফ হয়ে গেল ফুলের গাছ, লুটিয়ে পড়ল ফুলের গুচ্ছ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাঁবু পড়ল অনেকগুলি। মুহূর্তে যেন একটা বসতির চেহারা নিল জায়গাটা। বন কেটে বসত। শুধু তাই নয়, ফুলের বনে বসত।

আজ খুব একটা পরিশ্রান্ত নয় কেউ। রাস্তাও ছিল কম, আবহাওয়াও চমৎকার। দিনের আলোরও অনেকখানি বাকি। তবু তাঁবুতে ফিরে আর কিছু করতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু তা বললে কি সবার চলে? অন্তত কোয়ার্টার-মাস্টারের তো নয়ই। প্রতিদিন দিনশেষে এক কঠিন ও বিরক্তিকর কাজ অপেক্ষা করে থাকে কোয়ার্টারের জন্য।

শিবিরে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে, তাঁবু খাটানো হোক আর না হোক—চা চা করে হল্লা শুরু হয়ে যায়। সত্যিই তখন এক কাপ চা যেন মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করে। চা তো বটে, কিন্তু করে কে? সবার হালই তো এক। উঠতে হয় সুশান্তকে। নিজের কথা না ভেবে ভাবতে হয় সহযাত্রীদের কথা। জোর করে ক্লান্ত শরীরটাকে নিয়ে সে দাঁড়ায় স্তূপীকৃত রেশনের সামনে। কুক আজব সিংকে ডেকে বুঝিয়ে দেয় চা চিনি দুধ টিফিনের সরঞ্জাম। দিয়ে দেয় সদস্য ও শেরপাদের রাতের খাবারের জিনিসপত্র। আগামীকাল সকালের সবকিছুও এখনই মেপে, বুঝিয়ে দিতে হয়। সকালে আর সময় পাওয়া যায় না।

এতেই শেষ নয়। কুলীর দল দাঁড়িয়ে আছে রেশনের জন্য। ওদের হাজার সমস্যা। ৩০ জন কুলীর রেশন একসঙ্গে দেওয়া যাবে না। ওদের মধ্যে আত্মীয়, জাত, বন্ধু ইত্যাদি বহু সম্পর্কের গোষ্ঠী আছে। কেউ তিন-জনের রেশন নেবে, কেউ পাঁচজনের, কেউ দুজনের। এছাড়া এই গ্রুপের আলুর সাইজ বড় হয়ে গেল, ওদের পেঁয়াজ কম হল ইত্যাদি হাজার ঝামেলা তো আছেই। সেই গ্রাহামের অভিযানের উদাহরণ থেকেই আমরা সাবধান হয়ে গিয়েছি—একসঙ্গে বেশী দিনের রেশন দেওয়া

চলবে না। আমরা নিজেরাও দেখেছি ওদের চারটে রুটি দিলেও বলে ঠিক আছে, আটটা রুটি দিলেও একই রকম ভাবে বলে ঠিক আছে। প্রতিদিন এভাবে সবাইকে রেশন দেওয়া, সবাইকে সন্তুষ্ট করা এক অসম্ভব কাজ, কিন্তু আমাদের রেশনও যথেষ্ট সীমিত, এ ছাড়া উপায়ও নেই।

এই কাজে সুশান্তর সঙ্গী প্রবীর। রেশন দিতে গিয়ে প্রবীর স্বভাব-সিদ্ধ ভঙ্গীতে হাত পা ছুঁড়ে তার একান্ত মৌলিক হিন্দীতে এমন লেকচার দেয় যে কুলীরা রেশন নিতে গিয়ে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে পড়ে। এই কেরামতি (কেয়ামৎ) সিং, আজ টিফিনমে আটাকা বদলমে চিঁড়ে লেগা? ঐ দেখ, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতা হ্যায়, আরে চিড়ে—চিড়ে, চুড়া। চুড়া নেহি বুঝতা। ধ্যাত্তেরি, প্রবীর দু হাত কেয়ামতের মুখের সামনে নাচিয়ে বোঝায়, 'আরে, চাউলকো চ্যাপটা চ্যাপটা করকে বানাতা।' আহা, যেন বুঝিয়ে দিলে জল। কেয়ামৎও বুঝি বোঝে, সাব যখন এমন প্রাণান্তকর চেষ্টা করছে, ওর নিশ্চয়ই বোঝা উচিত। মানে মানে যা দিচ্ছে তা নিয়ে রণে ভঙ্গ দেওয়াই ও শ্রেয় মনে করে।

রাতের খাওয়া নিয়ে বসেছি সবাই একসঙ্গে। সেখানেও এক হৈ হৈ।

পাহাড়ের রাস্তায় খিচুড়ি এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী খাদ্য। রোজই এই আইটেম থাকছে। পর্বতারোহণের নিয়ম অনুযায়ী এর দ্বারা কতটা খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন দেওয়া যাচ্ছে জানি না তবে এরকম অভিযানে এ ছাড়া গতিও নেই। এই বাজেটে এর বেশী হয় না। এই খেয়েই আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা পাহাড়ে চড়ে আর পশ্চিমী দেশগুলির পর্বতারোহীদের সঙ্গে তুলনা করতে চায়।

সে যাই হোক, এ অবস্থাকে আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু রোজ রোজ কাঁহাতক আর খিচুড়ি খাওয়া যায়! এমত অবস্থায়, কোয়ার্টার একটা দারুণ আইটেম পেশ করেছে—উচ্ছেভাজা। প্রথমে খিচুড়ির পাশে উচ্ছেভাজা দেখে তো চমকে গিয়েছিলাম। পাহাড়ে এসে উচ্ছেভাজা, তাও খিচুড়ির সঙ্গে! অদ্ভুত কম্বিনেশন তো! কার উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত

কে জানে ! কিন্তু একটু মুখে দিয়েই দেখলাম, দারুণ লাগছে। রোজকার একঘেয়ে স্বাদ থেকে এক চমৎকার মোড় ফেরানো। মুখের স্বাদ ফিরে এল যেন। সবাই সমস্বরে কথা বলতে চাইল। 'আহা, কি আইটেম করেছ কোয়ার্টার, জবাব নেই।'

—'না ভাই, এটা আমার নয়। All credit goes to PK.'

—'কোই বাত নেহি, পিকে জিন্দাবাদ।'

প্রবীর বোধহয় একটু লজ্জা পেল, বলল, 'কোয়ার্টারও একটা স্পেশাল ছেড়েছে। একটু নজর দিয়ে দেখ।'

আরে তাই তো !

এটা কি ? থালার এক কোণায় আচারের মত কি একটু রয়েছে যেন ! মোমবাতির আলোয় ভালো দেখাও যায় না। আঙুলে করে একটু মুখে দিলাম।

—'আরে ! এ যে মাংস !'

—'হ্যাঁ, এ তো টিনের মাংস !' কালীর গলায় উপচানো খুশী।

—'হ্যাঁরে, পাঁঠার, মুরগির, অনেক রকমের মাংস তো খেয়েছি, তবে টিনের মাংস খাচ্ছি এই প্রথম, তাই না রে কালী ?' সুযোগ পেয়েই অনিমেষদা কালীর ওপর এক হাত নিল।

মাংসের আনন্দে, স্বচ্ছন্দে সংঘর্ষ এড়িয়ে গেল কালী। 'আরে বাবা, যারই হোক, মাংস তো ? আগে মুখে দিই—'

—'আরে আরে, করছিস কি ? থাম থাম !' ছুটে এসে ওকে থামাল সুশান্ত, 'মুখে দিচ্ছিস যে ? পরিমাণটা দেখছিস না ? ওটা খাবার জন্য দেওয়া হয়নি। ওটা দেওয়া হয়েছে আইটেম বাড়ানোর জন্য আর মাংস খাচ্ছি মাংস খাচ্ছি ভাব আনার জন্য।'

হাঃ হাঃ হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই।

—'আচ্ছা, এটা কি গোবিন্দ সিংএর বড়ালের মিনি কর্ম ?' হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করল দীনেন।

—'তার চাইতে ওকে মাঝে বসিয়ে রেখে খিচুড়ি খেলেই পারতাম।

যা একটা টিন কেটেছ তাও সেফ হত, বড়াল বড়াল গন্ধও পেতাম।'

*　　*　　*

আবার সকাল হল। আবার দৈনন্দিন ব্যস্ততা, আবার বাঁধাছাঁদা, আবার সব গোটানো।

ডিক্রুঘেটাকে বিদায় জানানোর সময় হয়ে এল।

শিবিরের ঠিক পেছন থেকেই ঘন জঙ্গল। প্রচুর রডোডেনড্রন গাছ। আরও কত রকমের গাছপালা, ঝোপঝাড়। কটাই বা চিনি! এর ভেতর দিয়ে উঠে যেতে হবে বেশ কয়েকশো ফুট। মাথার ওপরে আকাশ দেখতে পাচ্ছি না, দেখতে পাচ্ছি না চার পাশের কিছুও। কি রকম ভেজা ভেজা চারপাশটা। ভালো করে সূর্যের আলো ঢুকতেই পারে না এর মধ্যে। সকাল বেলা, ছায়া-ছায়া পথ। ঠাণ্ডা লাগছে, তবে দমও পাওয়া যাচ্ছে। তবু আকাঙ্ক্ষা কখন রোদ্দুর গায়ে লাগাতে পারব, কখন নীলাকাশ দেখতে পাব। জানি এ পাহাড়ের মাথায় উঠতে পারলেই, এই চড়াই পার হলেই মাথার ওপরে পাব অনেকখানি আকাশ, পাব চোখের সামনে অনেকখানি খোলা। এই এক চিন্তা নিয়ে উঠে যাচ্ছি, উঠে যাচ্ছি, আমার সামনে পেছনে আর সবার মনেও বোধহয় একই চিন্তা, আরো উঠলাম, আরো—

এ কি ?

এ কি দেখছি আমি ?

এ কোথায় এলাম আমি ? এ কি আমার রোজকার চেনা পৃথিবীটা ? এ কি আমার জন্মাবধি পরিচিত ছুনিয়াটা ? এ কি আমার বোধের জগতের মধ্যে ?

এ কোথায় আমি ? এ কে আমার সামনে ? কে এমন মহিমান্বিত রূপ নিয়ে আমার সামনে উদ্‌ভাসিত ? আমার চৈতন্যের গণ্ডি অতি সীমিত—এমন অপার বিস্ময়কে উপলব্ধি করি এমন সাধ্য আমার কই ? আমার চেতনা বুঝি লোপ পেল, বুঝি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হলাম। হৃদয়ের সবটুকু আকূতি দিয়ে অনুভব করতে চাইলাম, বুঝতে চাইলাম, কৃতার্থ

চিত্তে হৃদয়ঙ্গম করতে চাইলাম—আমি পৌঁছেছি তার অনিন্দ্যলোকে—আমার সামনে—

নন্দাদেবী !

এগারো

ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে !
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥

মানুষের পদসঞ্চারে ঋষি উপত্যকার ঘুম ভাঙছে। কেটে যাচ্ছে অন্ধসংস্কার আর অহেতুক ভীতির ভাব। পর্বতারোহীদের অর্ধশতাব্দীর সাধনা আজ সিদ্ধিলাভের পথে। তাদের নিরলস প্রচেষ্টা, কঠোর পরিশ্রম ও অসীম ধৈর্যে দেবতাত্মা বিগলিত হয়। মুদ্রিত হয় ত্রিকালজ্ঞ ত্রিশূলধারীর তৃতীয় নেত্র। করুণাঘন বরাভয় আসনে তিনি শান্ত সমাহিত। শুভক্ষণে অপরাজিত মানুষ হাজির হয় সুরক্ষিত রক্ষাব্যূহের সিংহদ্বারে। খুলে যায় নন্দালোকের দুর্গতোরণ। বিস্ময়বিনম্র চিত্তে তারা এগিয়ে চলে, নির্ভয়ে প্রবেশ করে স্বর্ণপ্রতিমার সোনার মন্দিরে। উদয়-শিখরে বেজে ওঠে মাভৈঃ ! নভোশীলের নিচে ত্রিনয়নীর অপরূপ রূপে তারা বিহ্বল চঞ্চল। অপলক নেত্রে শুধু চেয়ে থাকে তাঁর করুণা-ছলছল আঁখিপানে।

তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে !
ডান হতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ।
দুই নয়নে স্নেহের হাসি ললাটনেত্র আগুন-বরণ।
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জমেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী,
তোমার অভয়বাজে হৃদয়মাঝে হৃদয়হরণী,
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥

সেদিন ১৯৩৪ সনের ৪ঠা জুন। রোমাঞ্চিত পদক্ষেপে সিপটন আর টিলম্যান প্রবেশ করেন নন্দাদেবীর অভয়াশ্রমের অভ্যন্তরে। চিরকল্যাণময়ীর চরণতলে পূত ঋষিধারার পবিত্র উৎস-মুখের কাছে স্থাপন করেন তাঁদের সফলতার সার্থক শিবির (১৩,১০০´)। এক বিস্ময়কর প্রচেষ্টার সাফল্যে 'সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ, নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক'। পর্বতারোহণের ইতিহাসে সেই বরণীয় দিনের স্মরণীয়ক্ষণের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে আছে।

আর আজ! ১৯৭৪ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর। স্বনামধন্য পর্বতারোহীদের ক্ষুদ্রতম উত্তরসূরী আমরা এসে দাঁড়িয়েছি নন্দাদেবীর দুর্গতোরণে। সার্থক আমাদের স্বপ্ন, সফল আমাদের চেষ্টা। মাথার ওপরে নীলে নীলাকার আকাশ, মুঠো মুঠো সোনাঝরা অজস্র রোদ আর সামনে নন্দাদেবীর বিস্ময়-বিহ্বলকর মহিমান্বিত রূপ—আঃ, আমি বুঝি হারিয়ে গেলাম!

—'লিডার, give me permission. I want to go back.'

চমকে উঠলাম। কি এক স্বপ্নের ঘোরে ছিলাম যেন। বেশ কিছু সময় লাগল ফিরে আসতে। সামনে দাঁড়িয়ে শম্ভুদা। শান্ত পরিতৃপ্ত মুখ শম্ভুদার। কিন্তু কি বললেন যেন?

—'কিছু বললেন শম্ভুদা?'

—'Give me permission. I want to go back.'

শান্ত ভাবে কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আবার বললেন শম্ভুদা।

তার মানে? ঠিক বুঝতেই পারলান না কিছু। অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকালাম। বেশ কয়েকজন ঘিরে দাঁড়িয়েছে আমাদের। সবার চোখেই বিস্ময়। হতভম্ব আমিও।

—'কি বলছেন আপনি!'

—'Yes, I want to go back.' শম্ভুদা একইভাবে আবার বললেন।

—'কিন্তু, কি ব্যাপার বলবেন তো? আমি তো কিছুই বুঝতে

পারছি না। কি হয়েছে কি ?'

শম্ভুদা সবার দিকে একবার দেখলেন। সবাই উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে। এরই মধ্যে কি হল, কেউই বুঝতে পারছে না।

শম্ভুদা ঘুরে আমার চোখে চোখ রাখলেন, খুব শান্ত স্বরে বললেন, 'My mission is fulfilled.'

—'তার মানে ?' আমার গলা দিয়ে আপনিই বেরিয়ে এল কথাটা।

—'সারা জীবনের স্বপ্ন ছিল নন্দাদেবীকে দেখব, কাছ থেকে দেখব। দেখেছি। আমি পরিপূর্ণ—my mission is fulfilled.

এক মুহূর্ত আমরা সবাই নির্বাক। তারপর প্রচণ্ড এক নির্মল হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই। আমি জড়িয়ে ধরলাম শম্ভুদাকে। 'Beautiful শম্ভুদা, beautiful. এমন করে মনোভাব প্রকাশ করতে শুধু আপনিই পারেন।'

শম্ভুদাও হাসলেন। হাসল সবাই। উজ্জ্বল হাসি নিয়ে সবাই তাকাল নন্দাদেবীর দিকে।

আবার চলা শুরু। তিনদিন চলার পর এই প্রথম ঋষিগঙ্গাকে দেখলাম আমরা, পেলাম পাশে। ঠিক পাশে নয়, অনেক নীচে, সরু একটা রূপালী ধারার মত ঋষি চলল আমাদের সঙ্গে, ডান ধার ঘেঁষে।

চমৎকার পথ। পাহাড়ের গা ঘেঁষে, আঁকাবাঁকা উঁচুনীচু পথ। অবিশ্যি পথের রেখা অনেক জায়গাতেই নেই। আগের দিকে আছে জয় সিং, শেরপারা, তাদের অনুসরণ করে চলেছি আমরা। কোথাও খুবই সঙ্কীর্ণ পথ। পাথরের খাঁজে খাঁজে পা রেখে, কখনও শৈলারোহণের কায়দাকে কাজে লাগিয়ে অতি সাবধানে চলতে হচ্ছে। কিন্তু পরিশ্রম একেবারেই কম। আজও আমরা উঁচুতে উঠব না। যে কয়েক শো ফুট উঠেছিলাম নামব তার চেয়েও বেশী। নীচে ঋষির নদীখাত দেখা যাচ্ছে। ভয়ানক খাড়াই। আমরাও তাই পাহাড়ের ওপর দিয়েই চলেছি। গভীর খাতের মধ্যে দিয়ে বিপুল গর্জনে ছুটে চলেছে ঋষি—

চলেছে ধৌলীর সঙ্গে মিলতে। এখন নদী পার হব কি করে কে জানে! অথচ আজই ঋষির ওপারে যেতে হবে আমাদের।

অনেক সময় আছে হাতে। আবহাওয়া চমৎকার। ধীরে ধীরে, বিশ্রাম নিতে নিতে, গল্প করতে করতে চলেছি আমরা। আজ আমার গ্রুপে রয়েছে সুশান্ত, কালী আর শম্ভুদা। এই সুযোগে প্রশ্নে প্রশ্নে শম্ভুদাকে উত্ত্যক্ত করে তুললাম। চোখের সামনে সারা অস্তিত্ব জুড়ে নন্দাদেবীকে রেখে শম্ভুদা শোনালেন গল্প—লঙস্টাফের গল্প আর নন্দাদেবীর গল্প।

—'দীর্ঘ কুড়ি বছর পর ডাঃ লঙস্টাফ আবার ফিরে আসেন নন্দা-ত্রিশূল অঞ্চলে। আলমোরার ডেপুটি কমিশনার মিঃ রাট্‌লেজের সঙ্গে তিনি ত্রিশূলের পাদদেশে নন্দাকিনীর উৎস ছাড়িয়ে রোন্টি স্যাডেলের দিকে যাত্রা করেন। নন্দাঘুন্টি ও ত্রিশূলের মধ্যবর্তী যে উচ্চ গিরিবর্ত্মের সন্ধান তিনি ১৯০৫ সনে পেয়েছিলেন সেটির অনুসন্ধান এবং সম্ভব হলে সেই গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে অপর দিকে অবতরণ করে ত্রিশূল অভিমুখে অগ্রসর হওয়াই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। ১৯২৭ সনের ১৫ই মে গোয়ালদাম ছেড়ে তাঁরা কুকিনাখাল (১০,৩৫০´) পেরিয়ে ১৭ই মে সুতোলে উপস্থিত হন। স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে ত্রিশূলের পাদ-দেশে অনুষ্ঠিত আরও কিছু খবর তাঁরা পান। তাছাড়া ডাঃ লঙস্টাফ আরও জানতে পারেন যে বহুদিন পূর্বে একদল যাত্রী ত্রিশূলের কাছাকাছি এক উচ্চ গিরবর্ত্ম অতিক্রম করার সময় ত্রিশূলধারীর মহারোষে হিমানী সম্প্রপাতের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল।'

—'আপনি রূপকুণ্ডের (১৬০০০´) কথা বলছেন তো?' জানতে চাইলাম আমি।

—'হ্যাঁ, রূপকুণ্ডের সেই ট্রাজেডির কথা তো তোমরা জানই।' শম্ভুদা বলে চললেন, 'লঙস্টাফ অবিশ্যি তাঁর লেখায় রূপকুণ্ড সম্বন্ধে ঐ-টুকুর বেশী কিছু উল্লেখ করেননি। বোধ হয় তাঁর উদ্দেশ্যের প্রতি মনোযোগ আর অস্পষ্ট খবর তাঁকে রুপকুণ্ডের প্রতি বিশেষভাবে

আকর্ষণ করতে পারেনি।

যাই হোক, ১৮ই মে তাঁরা তাঁতরা পেরিয়ে নন্দাকিনীকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলেন তার উৎসের দিকে। ২৩শে মে রোন্টি স্যাডেলের প্রায় হাজার ফুট নিচে তাঁরা তাঁদের উচ্চতম শিবির স্থাপন করেন। পরের দিন মাত্র তিন ঘণ্টায় ডাঃ লঙস্টাফ ত্রিশূলের উত্তর-পশ্চিমে রোন্টি স্যাডেল (১৭০০০´) শীর্ষে আরোহণ করেন। কিন্তু অপর দিকে ফাটল-ধরা হিমবাহ-পথে অবতরণ করা সম্ভব হয় না। স্যাডেলের বাঁ দিকে যেতে পারলে তাঁরা gain the crest of the serrated north-west spur running down from Trisul and look over on the great shelf glacier. সাবধানে প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর তিনি সেই crest-এর ধারে পৌঁছান এবং নিজেদের অবস্থান সেই shelf glacier-এর কিছু ওপরে দেখে বিস্মিত হন। কিন্তু shelf glacier এবং রোন্টি হিমবাহ সঙ্গম তাঁরা দেখতে পান না। ২৭শে মে ঐ হিমবাহ সঙ্গম এলাকা পরিদর্শনের জন্য তিনি বিশেষ প্রস্তুতিসহ বার হন। প্রথম দিকের অগ্রগতি বেশ ভাল হলেও, হঠাৎ আবহাওয়ার অবনতির জন্য তুষার-ঝড়ের মধ্যে কাজ অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে ফিরে আসতে হয়। সুতোলে এসে বাড়তি মালপত্র ওয়ান গ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে ডাঃ লঙস্টাফ কৈলুবিনায়ক গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে বালান হয়ে চলে যান পিণ্ডারী উপত্যকায়। নন্দা-ত্রিশূল অঞ্চলে এটাই তাঁর শেষ অভিযান। তিনটি অভিযানে ডাঃ লঙস্টাফ নন্দা-ত্রিশূল সম্বন্ধে যে সব মূল্যবান তথ্য ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তা পরবর্তীকালের অভিযাত্রীদের কাছে এক অমূল্য সম্পদরূপেই পরিগণিত হয়।'

—'আপনার গল্প কিন্তু এখনও নন্দাদেবীর ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারল না।' শম্ভুদাকে থামতে দেখেই সুর ধরল সুশান্ত।

—'দেখতে পাচ্ছ না শম্ভুদার কাছে দশনম্বরী নেই। দশনম্বরী ছাড়া শম্ভুদার জুত আসছে না—নেশা বলে কথা!' হাসতে হাসতে বলল কালী।

শম্ভুদা একটু হাসলেন, তাকালেন একবার নন্দাদেবীর দিকে। 'কালী, চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখ। যে নেশায় আকণ্ঠ ডুবেছি—তার কাছে একনম্বরী দশনম্বরী কিছু নয়, কিছু নয়।'

—'বেশ তো, প্রমাণ দিন। নিয়ে চলুন আমাদের নন্দাদেবীর কাছে।'

—'আরও অন্তত ন'টা বছর অপেক্ষা করতে হবে যে।'

—'ন বছর'!

—'সে কি! ১৯২৭ সনের পরে আর কেউ আসেনি এদিকে?' সুশান্ত জিজ্ঞেস করল।

—'এসেছেন। ১৯৩২ সনে হিউরাট্‌লেজ সুন্দরডুঙ্গা উপত্যকা পথে নন্দাদেবীর দক্ষিণ-পশ্চিমে পাওয়ালীধর (২১,৮৬০´) ও মাইতোলীর (২২,৩২০´) মধ্যবর্তী সুন্দরডুঙ্গা খালে (১৮,১২০´) আরোহণ করেন। কিন্তু নন্দাদেবী রক্ষাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে অবতরণ করা সম্ভব হয় না।

অতঃপর আসে সেই লগ্ন। '৩৪ সালের ৮ই জুন শিপটন ও টিলম্যান প্রথম ঢোকেন নন্দাদেবীর অভয়াশ্রমে (Sanctuary).'

—'নন্দাদেবী জয় হয়ে গেল?'

—'দাঁড়াও, দাঁড়াও। অত ব্যস্ত হলে কি পাহাড়ে চড়া যায়।' শম্ভুদা বলে চলেন, 'তিন সপ্তাহ ধরে টিলম্যান আর শিপটন নন্দাদেবী স্যাঙ্কচুয়ারীর মধ্যে ভূসংস্থানের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। প্রাচীরগাত্রে আরোহণ করে তাঁরা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। শিখর অভিমুখে সম্ভাব্য পথ অনুসন্ধান করে তাঁরা সেখান থেকে একই পথে বার হয়ে চলে যান বদরীনাথের ওপর শতপন্থ-ভগীরথ খড়ক হিমবাহ সঙ্গমে। তারপর বিভিন্ন গিরিপথ-গিরিশিরা অতিক্রম করে ২০শে জুলাই অলকানন্দা-ভাগীরথী জলবিভাজিকা গিরিশিরার এক উচ্চ গিরিবর্ত্ম (১৯,৪০০´) অতিক্রম করে তাঁরা নেমে আসেন শ্বেতা হিমবাহ-পথে চতুরঙ্গী হিমবাহ-প্রান্তে

নন্দনবনে (১৪,৩২০´)। ভাগীরথীর উৎস গোমুখ (১২,৭৭০´) দর্শন করে চতুরঙ্গী হিমবাহ-পথে ঘাসতলী হয়ে তাঁরা ২রা আগস্ট ফিরে আসেন বদরীনাথে। বাকী কাজ শেষ করার জন্য আবার তাঁরা ঋষি-গঙ্গা ধরে প্রবেশ করেন নন্দাদেবীর রক্ষাপ্রাচীরের মধ্যে। পরে সুন্দরডুঙ্গা খাল অতিক্রম করে সেখান থেকে বার হয়ে আসেন। বলছি, বলছি....,' কালী হয়ত কিছু বলার জন্য তৈরী হয়েছিল, কিন্তু তাকে থামিয়ে শম্ভুদা বললেন, 'অবশেষে ১৯৩৬ সনের ২৯শে আগস্ট। পর্বতারোহণের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। টিলম্যান ও ওডেল বেলা তিনটের সময় আরোহণ করলেন নন্দাদেবীর শিখরে (২৫,৬৪৫´)। গরীয়সীর গর্বিত মস্তকে দাঁড়িয়ে শীর্ষারোহীরা কিন্তু গর্বের চেয়ে ব্যথাই বেশী অনুভব করেন। যাই হোক, শেষ হয় এক অধ্যায়ের। মূল দল ঋষির পথে আর টিলম্যান, হৌসটন ও পাসাং নন্দাদেবী গিরিবর্ত্ম (ডাঃ লঙস্টাফ কল) অতিক্রম করে নেমে আসেন মিলাম উপত্যকায়।' শম্ভুদা একটু থেমে আবার বললেন, 'বাস্ কালী, পৌঁছে গেছ।'

—'কোথায়, নন্দাদেবীতে ?'

—'না, ডেওভিতে।'

শম্ভুদার কথায় চমক ভাঙে। আরে তাই তো! পৌঁছে গেছি ডেওভি—আজকের শিবিরে। চোখ ছিল পথের দিকে, কান ছিল শম্ভুদার গল্পে—একমনে চলেছি। দেখতে দেখতে পেরিয়ে এলাম এতটা পথ।

ঐ তো বেশ কিছুটা নীচে, নদীর ওপারে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে রঙিন তাঁবুগুলো দেখা যাচ্ছে। অগ্রগামী দল ইতিমধ্যেই তাঁবুটাবু সব লাগিয়ে ফেলেছে। মালটাল নামিয়ে ছাগলের দল চরে বেড়াচ্ছে শিবিরের চারপাশে। ছাগলগুলো সবার আগে পৌঁছয়—অবিশ্বাস্য গতিতে। রোজই পৌঁছে দেখি ছাগলওয়ালা চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকে। ছাগবাহিনীর সঙ্গে দৌড়ে প্রাণান্ত হয় ওর। অন্ততঃ ২/৩ ঘণ্টা শুয়ে বিশ্রাম না নিলে নড়তেই পারে না বেচারা।

অনেকটা নামতে হবে। একেবারে খাড়াই—তবে নদী পাব। কিন্তু

নদী পার হব কি করে? যা দুরন্ত স্রোত! আওয়াজ এখান থেকে মালুম পাচ্ছি। তবে আগের সবাই যখন ওপারে পৌঁছেছে তখন উপায় একটা নিশ্চয়ই আছে।

হাচ্‌ড়ে-পাচ্‌ড়ে কোন রকমে নদীর ধারে নামলাম—আরে বাঃ, চমৎকার একটা ব্রীজ। পাইন গাছের গুঁড়ি কেটে, পেরেক মেরে যথেষ্ট মজবুত সেতু তৈরী করা রয়েছে। হাসতে হাসতে পেরিয়ে এলাম সেই দুর্গমতম নদী।

—'সেদিন হুকুম সিং বললেন না ওঁদের ৭১ সালের অভিযানের সময় বানিয়েছিলেন এই ব্রীজটা।' সুশান্ত আমাদের মনে পড়িয়ে দেয়। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ধন্যবাদ তোমাদের। তোমাদের পরিশ্রমের মূল্যে অতি নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেলাম ডেওভি (১১,০০০´) শিবিরে।

বার

—'হিমালয়ে এক এশীয় দলের সাফল্যও আসে নন্দাদেবী বিজয়ের বছরে—ঐ ১৯৩৬ সনে। জাপানী পর্বতারোহীরা ৫ই অক্টোবর নন্দাদেবী রক্ষাপ্রাচীরের নিকটবর্তী নন্দাকোট শিখরে (২২,৫১০´) প্রথম আরোহণের গৌরব অর্জন করেন। ঐ বছরেই ওস্‌ম্যাস্‌টনের তত্ত্বাবধানে ঋষি-উপত্যকা ও নন্দাদেবী অঞ্চলে আধুনিক সমীক্ষাকার্যে সহায়তা করেন শিপটন। তিনি রেনি থেকে রোন্টি উপত্যকায় প্রবেশ করে ত্রিশূলের উত্তর-পশ্চিম গিরিশিরায় এক রাত অতিবাহিত করে নেমে আসেন নন্দাকিনী উপত্যকায়।

১৯৩৯ সনে এক পোলিশ পর্বতারোহীদল ২রা জুলাই নন্দাদেবী পূর্বশিখরে (২১,৩৯০´) আরোহণ করেন। ১৯৫১ সনে এক ফরাসী অভিযাত্রী দল একই সঙ্গে নন্দাদেবীর উভয় শিখরে আরোহণের পরিকল্পনা নিয়ে ঋষি-উপত্যকা পথে রক্ষাপ্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করেন। ২৯শে জুন চতুর্থ শিবির (২৩,৭০০´) থেকে দুজন পর্বতারোহী মূল

শিখর অভিমুখে অগ্রসর হবার সময় হারিয়ে যায়। অন্যেরা ডাঃ লঙস্টাফ কল থেকে ৬ই জুলাই নন্দাদেবী পূর্বশিখরে আরোহণ করে। সেবারে—'

—'আচ্ছা শম্ভুদা, N.D. Jayal নন্দাদেবী গিয়েছিলেন না ?'

—'হ্যাঁ, সেই কথাতেই আসছি। নান্দু জয়াল এই ফরাসী দলেই লিয়াঁজো অফিসার হিসেবে ছিলেন। ১৯৫৭ সালে তিনি প্রথম ভারতীয় নন্দাদেবী অভিযানের নেতৃত্ব করেন। ১৯৬১ সালে গুরুদয়াল সিংএর নেতৃত্বে দ্বিতীয় অভিযানই ব্যর্থ হয়। শেষে ১৯৬৪ সালে নরেন্দ্রকুমারের নেতৃত্বে তৃতীয় অভিযান সফল হয়। ২০শে জুন বেলা সাড়ে এগারোটায় নোয়াঙ গোম্বু ও দাওয়া নরবু ভারতের উচ্চতম শিখর* নন্দাদেবী শীর্ষে জাতীয় পতাকা স্থাপন করেন।' একটু থেমে আবার বললেন শম্ভুদা, 'দেখ, ভাল করে দেখে নাও নন্দাদেবীকে। একটু পরেই আর দেখতে পাবে না।'

হ্যাঁ, এবার আমরা ডানদিকে ঘুরব। ডেওডি শিবির থেকে ঋষি-গঙ্গাকে বাঁদিকে রেখে আমরা উঠে এসেছি অনেক। পাইন, বার্চ, রডোডেনড্রন আর জুনিপারের ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে হয়েছে। নন্দাদেবী অভয়াশ্রমের বহিঃপ্রাচীর, যেটি ত্রিশূল থেকে এসে ঋষির পথ করে দিয়েছে, তারই গা ধরে পার হয়ে চলেছি। একেবারে পিছনে মানে উত্তর দিকে অনেক দূরে কাঞ্চন কামেট (২৫,৪৪৭´) আর মানসী মানার (২৩,৩৬৮´) গিরিশ্রেণী মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। এতক্ষণ নন্দাদেবীর দিকে মুখ করে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলেছিলাম, এবার ঋষি আর ত্রিশূল নালার সঙ্গম থেকে ঋষির মায়া কাটিয়ে ত্রিশূল নালার সাথী হব আমরা, ডান দিকে ঘুরে প্রায় দক্ষিণ দিকে চলব।

আপাততঃ, চলতে চলতে, পথের পাশে চমৎকার একটা গুহা পেয়ে একটু বসেছি। এখান থেকেও নন্দাদেবীকে সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে। এখান থেকেই একটি ক্ষীণ পথরেখা নেমে গেছে ঋষি আর ত্রিশূল নালার সঙ্গমের

---

* সিকিম অধিগ্রণের আগে নন্দাদেবী ছিল ভারতের ভৌগোলিক সীমার সর্বোচ্চ শিখর। বর্তমানে সিকিমের কাঞ্চনজঙ্ঘা ভারতে সবচেয়ে উঁচু শিখর।

দিকে। সঙ্গমের কাছাকাছি ত্রিশূল নালা পেরিয়ে পথ চলে গেছে নন্দা-দেবীর দিকে। দেখা যাচ্ছে ঋষির অসম্ভব সংকীর্ণ নদীখাত। ওর গায়ে গায়ে পথ করে চলতে হবে নন্দাদেবী অভিযানের মূল শিবিরের জন্য। দূরে রহমণি নালা আর ঋষির সঙ্গম দেখা যাচ্ছে। রহমণি নালা এসেছে তুনাগিরি-চ্যাঙবাঙ অঞ্চল থেকে। তুনাগিরিকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু একেবারে উত্তর-পূর্ব দিকে চ্যাঙবাঙ (২২,৫২০´) আর কলঙ্ক (২২,৭৪০´) পর্বতের সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গ আকাশকে বিদ্ধ করে আছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ক্রমে নন্দাদেবীকে বিদায় জানিয়ে ত্রিশূল নালাকে বাঁ দিকে রেখে এগোলাম আমরা। আজকের পথও সুন্দর। পরিশ্রম যথেষ্ট কম। মাত্র ৫ ঘন্টার মধ্যেই বেথারতলী ঘাসের প্রান্তরে পৌঁছলাম—এখানেই আজকের শিবির (১২,৫৪০´)।

বেথারতলী (২০,৭৩০´) পর্বতের একেবারে পায়ের কাছে এই শিবির। সামনেই বেথারতলির গা থেকে নেমে আসা হিমবাহ দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে তার আপার আইস ফল-টাও। এই হিমবাহ থেকে নেমে আসা একটি ক্ষীণ জলধারা বয়ে গেছে শিবিরের গা ঘেঁষে। এটিই আমাদের জলের সূত্র। সাড়ে বার হাজার ফুট উচ্চতার জন্য এখানে আর বড় গাছ নেই, শুধু বড় বড় ঘাসে ছাওয়া এক প্রান্তর। কাছেই এক গুহাতে কুলীরা আশ্রয় নিয়েছে।

আরও একটা দিন, তারপরই মূল শিবির।

পরের দিনের পথ চলা কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পথে। সাড়ে বার হাজার ফুট উচ্চতা থেকে চলা শুরু। সবুজের রেখা প্রায় শেষ। প্রথমেই পড়ল বেথারতলী হিমবাহের শেষ মুখ (Snout)। এই অংশে হিমবাহের চেহারা থাকে অত্যন্ত বিপজ্জনক। অসংখ্য ভাঙাচোরা ফাটলে, আলগা বরফের আর পাথরের চাঁইয়ে ভর্তি। খুবই সাবধানে প্রত্যেকটি পাথর চিনে চিনে পা ফেলা দরকার। যে কোন সময় একটা ছোট পাথর খসে যেতে পারে এবং মুহূর্তে তা একটা মরণমুখী ধসে পরিণত হতে পারে।

মাত্র কয়েক শো ফুট পার হতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লেগে গেল। ছাগলবাহিনী কিন্তু নির্বিকার। অত্যন্ত খাড়া দেওয়াল বা একেবারে আলগা পাথরের অঞ্চল যাই হোক না কেন, ওদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তরতরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, অবলীলাক্রমে পার হয়ে যাচ্ছে সব। অভিজ্ঞ 'রক্ ক্লাইম্বার' যেন। আমরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। শম্ভুদার বিস্ময় প্রকাশ সব সময়েই একটু ভিন্ন ধরনের। পথ চলতে চলতে যখনই একটু বসে বিশ্রাম নিয়েছি, শুনতে পেয়েছি আকাশের দিকে মুখ করে রামপ্রসাদী ঢঙে শম্ভুদার গান—

'হাঁটিতে যে আর পারি না,
মাগো, আমায় ছাগল কর।'

ঘণ্টা তিনেক চলার পর একটা মোটামুটি সমতল ক্ষেত্র পড়ল। চোখে পড়ল কিছু জুনিপারের ঝোপ। কুলীরা জানাল, এ জায়গার নাম দেওতলী। সামনের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম পথে এই শেষ গাছপালা দেখা। বুঝলাম এখান থেকেই রোজ কাঠ নিয়ে যেতে হবে মূলশিবিরে, জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারের জন্য।

আরও মনে পড়ল অনেক কথা। মনে পড়ল ত্রিশূলজয়ী ডাঃ লঙস্টাফের কথা। ১৯০৭ সালের ৫ই জুন তিনিই বোধকরি প্রথম মানুষ, যিনি এখানে শিবির স্থাপন করেন এবং তার সার্থক নামাকরণ করেন 'জুনিপার ক্যাম্প'।

দেওতলীর পর থেকেই সমানে চড়াই। সেই ভাঙাচোরা পথ। অবশ্য পথরেখা বলতে কিছু এখানে নেই। শুধু পাথরে পাথরে পা রেখে চলা। ত্রিশূল থেকে নেমে আসা হিমবাহ রয়েছে আমাদের বাঁ দিকে। তারই প্রান্তীয় গাবরেখার পাশ দিয়ে আমরা চলেছি। হিমবাহের অপর পারেই দেবীস্থানের দেহ সোজা দেওয়ালের মত উঠে গেছে। আমরা ঠিক দক্ষিণমুখী হয়ে চলছিলাম। সামনে সোজা দেখা যাচ্ছিল মৃগথুনীর বিশাল দেহ।

অবশেষে প্রায় ৭ ঘণ্টা হাঁটার পর পৌছুলাম মূল শিবিরে

(১৫,৫৫০´)। জায়গাটা একদিকে একটু ঢালুমত। পাশেই জলের একটা ক্ষীণ ধারা আছে। শিবিরের প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করবে। তাঁবু পাতার জায়গা রয়েছে প্রচুর। এর আগেও এখানে অনেকবার মূল শিবির স্থাপন করা হয়েছে। দেখা গেল চারদিকে অনেক খালি টিনের কৌটো পড়ে আছে। রান্নাঘরের জন্য পাথর দিয়ে বেশ খানিকটা দেওয়াল তোলা রয়েছে। আমরাও ওখানে ত্রিপল টাঙিয়ে রান্নাঘর বানালাম। শিবির করার জায়গা হিসেবে এক কথায় মন্দ না।

যাই হোক মূল শিবিরে পৌঁছেই যথেষ্ট ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। দেখতে দেখতে নানা রঙের অনেকগুলি তাঁবু মাথা তুলে দাঁড়াল, হাতে হাতে কিচেন হয়ে গেল তৈরী। সমস্ত রেশন, সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য জিনিসপত্র এক জায়গায় করে গুছিয়ে একটা ত্রিপলের ওপর রাখা হল, ঢাকা দেওয়া হল আর-একটা ত্রিপল দিয়ে।

আমি আর দ্বিজেন ব্যস্ত হয়ে পড়লাম কুলীবাহিনীকে নিয়ে। ওদের এক্ষুনি ছেড়ে দেওয়া হবে। মূল শিবিরের পর থেকে এইসব সাধারণ কুলীদের আর কাজ থাকে না। এর পর কাজ করবে বেশী উচ্চতায় কাজ করার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষ কুলীরা। এরকম কুলী আমাদের দলে আছে তিনজন—কেদার সিং, মেহেরবান সিং ও শের সিং।

তবু ৫জন সাধারণ কুলীকে রেখে দিলাম আমরা। মূল শিবিরের কাজের জন্য। মূল শিবিরে কাঠের যোগান দেওয়ার জন্য এদের দরকার হবে। আর কুক আজব সিং তো রইলই।

বাকী কুলীদের টাকাকড়ি মিটিয়ে দিলাম। ওরা খালি হাতে ফিরবে। শুধু ফেরার পথের খাবার থাকবে ওদের সঙ্গে। একে ফিরতি পথে কিছু ঢালু রাস্তা তায় ঘরে ফেরার নেশা, ওরা হয়ত ৬দিনের পথকে ২দিনেই অতিক্রম করে চলে যাবে। সেই দুর্ধর্ষ ছাগলবাহিনীকেও বিদায় দেওয়া হল। ওরাও বিপুল বেগে নেমে চলল পরিচিত এলাকার সন্ধানে, ঘাসে ছাওয়া প্রান্তরের টানে।

চলে গেল আমাদের কুলীবাহিনী। যাওয়ার আগে ছলছল চোখে

হাত মেলাল আমাদের সঙ্গে, ধরা গলায় জানাল বিদায়-সম্ভাষণ।

হিমালয়ের কোলের সহজ সরল পাহাড়ী মানুষ ওরা। পোড়া পেটের দায়ে সামান্য কিছু পয়সার টানে ওরা অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে মাল বয়ে নিয়ে এল অভিযানের। কষ্টসহিষ্ণুতার এক-একটি মূর্ত প্রতীক। ওরা আসে, মাল বয়, হাত পেতে পারিশ্রমিক নেয়, অভিযানের সাফল্য কামনা করে নিঃশব্দে ফিরে যায়। আমরাও ওদের ভুলে যাই। সফল অভিযানের কৃতিত্বে ওদের কোন ভূমিকা নেই। অভিযান-কাহিনীতে একাধিক লাইন ব্যয় করা হয় না ওদের জন্য।

আমি কিন্তু ওদের ভুলিনি। ভুলতে পারব না কোনদিনও। বেশ কয়েকটা দিন যে আমরা একসঙ্গে ছিলাম। অনেকগুলি পা যে আমরা একসঙ্গে হাঁটলাম। বহু সুখ-দুঃখের স্মৃতিতে যে আমরা অংশীদার হয়ে রইলাম। অনেক অম্লমধুর অনুভবের বিনিময় যে আমাদের মধ্যে হয়েছিল। না, ওদের ভুলতে পারব না কোনদিন।

তের

১৬ই সেপ্টেম্বর। মূল শিবির।

রেস্ট ডে।

রেস্ট ডে কথাটার বাংলা মানে হল বিশ্রামের দিন। কিন্তু পাহাড়ে, বিশেষ করে অভিযানের মূল শিবিরে পৌঁছে যে রেস্ট ডে তার মানে হল প্রচুর কাজ করা, যত রাজ্যের খুচরো কাজ শেষ করা।

আজব সিংএর আজব ডাকে ঘুম ভাঙল। এত দিনে ওর ডাকের সঙ্গে আমাদের বেশ জান-পয়চান হয়ে গেছে। চোখ বন্ধ রেখেই হাত বাড়িয়ে দিলাম, ধূমায়িত চায়ের মগ চলে এল হাতে। দু'এক চুমুকে ঘোর কাটল একটু, তাকালাম। তাঁবু-সঙ্গী সুশান্ত কখন বেরিয়ে গেছে। হাণ্টার শুটা পায়ে গলিয়ে বাইরে এলাম।

আঃ, উজ্জ্বল আলোয় চারদিক ঝকঝক করছে। প্রায় ৮টা বাজে।

চারদিকে তাকালাম। মাথার ওপরে গভীর নীল আকাশ—অতলান্ত, সমুদ্রের মত। একেবারে সামনে মৃগথুনী, পুরো দক্ষিণ দিকটা জুড়ে দাঁড়িয়ে। তার বাঁ পাশে এক অনামী শৃঙ্গ। তার ঠিক পরেই ছোট্ট একটা 'কল' দেখা যাচ্ছে—ওখান দিয়ে এই গিরিশিরাটি, যাকে নন্দাদেবী অভয়ারণ্যের অন্তররক্ষা প্রাচীর বলা হয়, অতিক্রম করা যেতে পারে। তারপর ঐ গিরিশিরা ধরে আরো বঁদিকে এলে বেশ সুন্দর দেখতে, একেবারে সমবাহু ত্রিভুজের মত, এক অনামী শৃঙ্গ। তার গিরিশিরা ধরে আরো বাঁ দিকে এলে দেবীস্থান ১ ও ২। বাস্তবিক পক্ষে দেবীস্থান ১ ও ২ ঠিক আমাদের মূল শিবিরের বাঁ দিকে, সোজা ৬ হাজার ফুট উঁচুতে। মাঝে শুধু ত্রিশূল হিমবাহ। তবে দেবীস্থানের এই পশ্চিম দিকের দেওয়াল দিয়ে ওঠার কোন সম্ভাব্য রাস্তা নজরে পড়ল না। মূল শিবিরের ডানদিকে বেথারতলীর কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যাকে দেখতে চাইছি সেই ত্রিশূল এখনও অদেখাই রয়ে গেল। এ যেন সেই কথা ঃ

'এখনও তারে চোখে দেখিনি
শুধু বাঁশী শুনেছি।'

কিন্তু এদিকে এ কি অবস্থা! ডাক্তার বীরেন দাস দেখি কিণ্ডোকে নিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ বড়সড় এক ওষুধের দোকান খুলে বসেছে। বিরাট এক পলিথিন সীট পাতা, তাতে গুচ্ছের শিশি বোতল ট্যাবলেট, বড়ি, গুলি ইত্যাদি থরে থরে সাজানো।

কে যেন টিপ্পনি কাটলো, 'ও ডাক্তার, 'দাস মেডিকেল স্টোরস্' লেখা একটা সাইনবোর্ড টাঙালে হতো না?'

—'ওর সঙ্গে 'অ্যাণ্ড সন্স'টাও জুড়ে দিও।' সঙ্গে সঙ্গে আর এক-জনের মন্তব্য।

—'এই, ডাক্তারের ছেলে কোথায়?' কিণ্ডো আপাতত কম্পাউণ্ডার, তাই বোধহয় ডাক্তারকে গার্ড দিতে চাইল।

—'আরে বিয়ে তো করেছে,' রসিক জনের তৈরী জবাব, 'জানিস না

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অনেক আগে থেকেই ভবিষ্যৎ চিন্তা করে।'

বুঝলাম আজকের টার্গেট হচ্ছে ডাক্তার শ্রীমান বীরেন দাস। সকাল থেকেই ওর পেছনে লাগা চলছে। তবে সবই দূর দূর থেকে। ডাক্তারের দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাদর আহ্বান সত্ত্বেও কেউ বড় একটা ওর ধারে-কাছে ঘেঁষছে না। জোর করে না গেলালে কে আর কবে ওষুধ খায়।

রেশন-বিভাগ নিয়েও এক মহামারী কাণ্ড চলছে। কোয়ার্টার-মাস্টার সুশান্ত তার স্টোর নিয়ে অতি ব্যস্ত, দুই অনুচর প্রবীর আর দীনেন ওর হুকুম মানতে গিয়ে শশব্যস্ত।

এখান থেকে রেশন-বিভাগটার আমূল পরিবর্তন হবে। মূল শিবির থেকে ওপরের সব শিবিরেই খাবার-দাবার যাবে মানুষের পিঠে চেপে, তাই বোঝার পরিমাণ নতুন করে করতে হচ্ছে। তাছাড়া দু নম্বর ও তিন নম্বর শিবিরের জন্য যে বিশেষ খাবারের লিস্ট আছে তা থেকে সব-কিছু অল্প অল্প নিয়ে এক-একটি স্বনির্ভর বোঝা তৈরী করা হচ্ছে। এমন একটি বোঝা যা সহজে একজন বইতে পারবে, আবার তার মধ্যে একজন আরোহীর অন্তত দু-তিন দিনের সব প্রয়োজনীয় জিনিস থাকবে।

তার ওপর পুরো রেশনের একটা হিসেব করতে হচ্ছে। কুলিদের জন্য আমরা যে পরিমাণ রেশন ধরেছিলাম তাতে কুলোয়নি। ফলে পুরো রেশনের হিসাবটাই ফেঁসে গেছে। তাই একবার নতুন করে হিসাব করা দরকার ঠিক কতদিন আমরা পাহাড়ে থাকতে পারব, কবে আমাদের মূল শিবির ছাড়তেই হবে।

পাহাড়ে চড়ার সাজপোশাক নিয়ে পড়েছে অনিন্দ্য আর দ্বিজেন। একদিন হাণ্টার শু পরেই চালানো গেছে। এবার থেকে ক্লাইম্বিং বুট পরতে হবে। দার্জিলিং থেকে আনা বুটগুলোর চেহারা খুবই খারাপ। বহু অভিযানে ব্যবহার করার ফলে জীর্ণ আর জরাগ্রস্ত। তবু এই দিয়েই চালাতে হবে। একটু পথে আনার চেষ্টায়, অন্তত যাতে পদযুগল ঢুকতে

পারে, তার জন্য জুতোতে প্রচুর পরিমাণে গ্রীজ লাগিয়ে রোদে রেখে দেওয়া হল।

বিশ্রামের দিন বলে ঘোষিত হলেও কোন সদস্যই যেমন ছুটি পাচ্ছিল না, তেমনি কুলিদেরও বিশ্রাম বলে কিছু ছিল না। ২-জন শেরপা, ৩-জন হাই অলটিচ্যুড পোর্টার (High Altitude Porter), যাদের 'হ্যাপ' বলি, ও ২-জন কুলী তাঁবু আর অন্যান্য কিছু মাল নিয়ে গেল ১নং শিবির স্থাপন করতে। ২জন কুলীকে নীচের দিকে পাঠানো হল। ওরা যাবে দেওতলী, নিয়ে আসবে জুনিপারের বোঝা, মুল শিবিরের জ্বালানী।

আজব সিংএর দৌলতে সকাল থেকেই স্পেশাল মেনু চলছে। প্রাতঃকালীন জলখাবারের পর, ছুটির দিন বলে অন্তত এই একবার মনে হল, বেলা ১১টা নাগাদ পরিবেশিত হল এক জবর আইটেম—চিড়ের পোলাও। নাম শুনেই আমরা অর্ধেক ঘায়েল। খাওয়ার পর না জানি কি হয়। তা হ্যাঁ, পোলাওই বটে। রং সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই চলবে না—বাহারি হলুদ বর্ণ। অনুপান হিসেবে পেঁয়াজ, লঙ্কা, চিনেবাদাম, কাজুবাদাম, কিসমিস, আদা, কিঞ্চিৎ গরমমসলা, সবই আছে, এমন কি তেমন করে খুঁজলে ওমলেটের দু-একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশও আবিষ্কার করা যেতে পারে। এরপরও যদি তাকে পোলাও না বলা হয়—তবে কথা হল গিয়ে কিছু অস্থি, মজ্জা, নাক, চোখমুখের সমাবেশ হলেই যেমন মানুষ হয় না তেমন ব্যাপার আর কি। অবিশ্যি চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা মনের কথা কদাপি মুখে আনেন না, তার ওপর আজব সিংএর প্রধান নির্দেশক প্রবীর যখন সামনেই দাঁড়িয়ে। সবাই সোনা মুখ করে খেয়ে গেল।

দুপুরে ব্যাপক আয়োজন। খিচুড়ি তরকারী, পাঁপড়ভাজা, আচার ও মাংস। প্রত্যেকটা আইটেমই ভালো হয়েছে। প্রচুর খাওয়া হল। চুপিচুপি খবর নিয়ে জানলাম এ বেলায় আজব সিং নাকি প্রবীরকে কিচেনের কাছে ঘেঁষতেই দেয়নি। চিঁড়ের পোলাও-এর প্রতিক্রিয়াটা

বোধহয় আঁচ করেছে।

সাড়ে তিনটে নাগাদ ওপর থেকে ওরা ফেরী (ferry) করে এল। শেরপা নিমা জানাল পূর্ব-নির্ধারিত বড় পাথর পেরিয়ে আরও বেশ কিছুটা ওপরে ১ নম্বর শিবির স্থাপন করেছে। ১ নম্বর পর্যন্ত বরফ নেই, হান্টারস শু পরেও যাওয়া যেতে পারে। পথের বর্ণনা ওরা বেশী দিতে পারে না, যা বলা হয়েছে করে এসেছে ব্যাস্। যাই হোক, মনে হল ত্রিশূল-হিমবাহের ডান পাশ ধরেই চলতে হবে।

এখন পর্যন্ত সবই শুভ। বিশ্রামের দিন যার ঘাড়ে যতটা বিশ্রামের (!) দায়িত্ব ছিল হাসিমুখে পালন করল সবাই। এবার আমার পালা।

তাঁবুর ভেতরে ঢুকে কাগজপত্র সব সাজিয়ে বসলাম।

একটা পর্বতাভিযানকে যদি একটা যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে আমরা তার চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি। সমস্ত আক্রমণকে তীব্র করতে হবে, কেন্দ্রাভিমুখী করতে হবে। তার জন্য নতুন করে সৈন্য সাজাতে হবে, রসদের পরিমাপ ঠিক করতে হবে, যোগানের ব্যবস্থা সাবলীল রাখতে হবে। এক্ষেত্রে নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে যে তথ্যগুলো বিবেচনায় আনতে হবে তা হল মজুদ টাকার অঙ্ক, মোট রেশনের পরিমাণ, সাজ-সরঞ্জামের সংখ্যা এবং সর্বোপরি ত্রিশূল যে বাধার সৃষ্টি করতে পারে তাকে হিসেবে রেখে মোকাবিলার ক্ষেত্রে আমার দলের আরোহীদের পর্বতারোহণের শক্তি-সামর্থ্যের (Climbing stamina) সঠিক মূল্যায়ন।

অন্তত আমার কাছে এ এক অতি জটিল অঙ্ক। এতে সংখ্যাতত্ত্ব যেমন আছে, তেমনিই আছে মনস্তত্ত্ব। শুধু কামনা, আমার পরিচালনাটুকু যেন ঠিক হয়। যুদ্ধের সব নিয়ম মেনে সাচ্চা লড়াই যেন করতে পারি।

সময় হয়ে এল, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম।

বিকেল সাড়ে চারটে। টিফিন হাতে নিয়ে কিচেনের সামনে জড়ো হল সবাই। ১৫ জন মেম্বার, ২ জন শেরপা ৩ জন হ্যাপ ও ৫ জন

কুলী—সবাই। সবার সামনে আনুষ্ঠানিক ভাবে আগামী দিনের কর্মসূচী ঘোষণা করলাম :

'রণকৌশলগত কারণে আগামীকাল প্রভাত মানে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে পুরো দলকে চার ভাগে ভাগ করা হল। প্রত্যেক দলের একজন নেতা থাকবেন। তিনি, যতক্ষণ সম্ভব, মূল প্রোগ্রামকে অনুসরণ করেবন, কিন্তু প্রয়োজনবোধে যে কোন তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। সেই মুহূর্তে সেটাই হবে চূড়ান্ত। ভাগগুলি হল :

১ নং দল—সদানন্দ দাস (নেতা), অনিন্দ্য সেন, ডি. এম. কিণ্ডো, জিতু মিত্র, নিমা দোরজি ও শের সিং।

২ নং দল—প্রবীর ব্যানার্জী (নেতা), দ্বিজেন রায়, শোভন গুপ্ত, কালীসাধন ব্যানার্জী, শেরপা কিতারে ও কেদার সিং।

৩ নং দল—বিজয় দত্ত (নেতা), সুশান্ত মজুমদার, দীনেন ঘোষ ও মেহেরবান সিং।

৪ নং দল—শম্ভুনাথ দাস (নেতা), অনিমেব চ্যাটার্জী, হীরালাল চ্যাটার্জী ও ডাঃ বীরেন দাস।

আগামীকাল ১৭ই থেকে কাজ হবে এইভাবে :

১৭.৯.৭৪. : ১নং ও ২নং দল সদানন্দ দাসের নেতৃত্বে ১নং শিবির দখল করবে। বাকী ১ জন হ্যাপ ও ৩ জন কুলী ১ নম্বরে মাল ফেরী করে মূল শিবিরে ফিরে আসবে।

১৮.৯.৭৪ : ১নং ও ২নং দল ২ নম্বর শিবির স্থাপন করবে ১৯৫০০ ফুটে। তাঁবু লাগিয়ে, যতদূর সম্ভব জিনিসপত্র বোঝাই করে ১ নম্বরে ফিরে আসবে। ৩ জন কুলী ১ নম্বরে মাল ফেরী করে মূল শিবিরে ফিরে আসবে।

১৯.৯.৭৪ : ১নং দল ২ নম্বর শিবির দখল করেবে। ২নং দল ২ নম্বরে মাল ফেরী করে ১ নম্বরে ফিরে আসবে। ৩নং দল ১ নম্বরে মাল ফেরী করে মূল শিবিরে ফিরে আসবে।

২০.৯.৭৪ : ১নং দল ৩ নম্বর শিবির স্থাপন করবে ২০৫০০ ফুটে

এবং দখল করবে। ২নং দল ২ নম্বর শিবির দখল করবে। ৩নং দল ১ নম্বর দখল করবে। ৩ জন কুলী ১ নম্বরে মাল ফেরী করে মূল শিবিরে ফিরে আসবে।

২১.৯.৭৪ : 'D-Day'।

১নং দল ত্রিশূল শিখরে অভিযান চালাবে এবং ফিরতি পথে ৩ নম্বরে স্লিপিং ব্যাগ ও এয়ার-ম্যাট্রেস রেখে দিয়ে সোজা ২ নম্বরে নেমে আসবে এবং ২নং দলের ব্যাগ ও ম্যাট্রেস ব্যবহার করবে। ২নং দল ২ নম্বরে ব্যাগ ও ম্যাট্রেস রেখে ৩ নম্বর দখল করবে ও ১নং দলের জিনিস ব্যবহার করবে। ৩নং দল ২ নম্বরে ফেরী করে ১ নম্বরে ফিরবে। সম্ভব হলে আরোহণের খবর নিয়ে ফিরবে বা দলের হাই অলটিচ্যুড পোর্টারকে রেখে আসবে। ১নং দল শীর্ষ থেকে এসে পৌঁছলে সেই পোর্টার খবর নিয়ে ১ নম্বরে নামবে। ১ নম্বরে মূল শিবির থেকে কুলী এসে তৈরী থাকবে, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামবে, যাতে সেই রাতেই মূল শিবিরে খবর পৌঁছে যায়।

২২.৯.৭৪ : ২ নং দল ত্রিশূল-শিখরে অভিযান চালাবে এবং ফিরতি পথে ৩ নম্বরে ৫টি করে ব্যাগ ও ম্যাট্রেস রেখে দিয়ে সোজা ২ নম্বরে ফিরবে। ৩নং দল ১ নম্বরে সব ব্যাগ ও ম্যাট্রেস রেখে দিয়ে সোজা ৩ নম্বরে উঠে যাবে।

১নং দলের শেরপা ৩নং দলের সঙ্গে ৩ নম্বরে উঠে আসবে। বাকী ১নং দল ১টি ব্যাগ ও ম্যাট্রেস নিয়ে নীচে নামবে এবং ১ নম্বর থেকে বাকী ব্যাগ ও ম্যাট্রেস নিয়ে মূল শিবিরে নেমে যাবে।

৪নং দল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রানার মারফৎ যোশীমঠে খবর পাঠাবে এবং ১নং দলকে স্বাগত জানাবে।

২৩. ৯. ৭৪ : ৩নং দল ত্রিশূল-শিখরে অভিযান চালাবে এবং ফিরতি পথে ৩ নম্বর শিবির গুটিয়ে ২ নম্বরে নামবে। ২নং দলের শেরপা ও হ্যাপ ৩নং দলকে সাহায্য করতে উঠে আসবে যাতে ৩ নম্বর শিবির গুটিয়ে নীচে নামা যায়।

২৪. ৯. ৭৪ : ৩নং দল ও ২নং দলের শেরপা ও হ্যাপ ৩ নম্বর ও ২ নম্বর শিবির পুরোপুরি গুটিয়ে ১ নম্বরে নামবে।

৪নং দল সব কুলীদের নিয়ে ১ নম্বরে উঠে আসবে এবং সবাই মিলে ওপরের সমস্ত শিবির গুটিয়ে মূল শিবিরে নেমে আসবে।

রাতে মূল শিবিরে ক্যাম্প ফায়ার—

ব্যবস্থাপনায় ৪নং দল।

পরদিন ২৫ সেপ্টেম্বর পুরো অভিযান যোশীমঠের দিকে রওনা হবে।

এই হল আমাদের মূল প্রোগ্রাম। এই কর্মসূচীকে সামনে রেখেই আমরা এগুব। প্রয়োজনবোধে পরিবর্তিত অবশ্যই করা হবে।'

আমার ঘোষণা শেষ হতে না হতেই সবাই একবাক্যে বিস্ময় প্রকাশ করল: 'আবার ২১শে সেপ্টেম্বর।'

হ্যাঁ, অবাক আমিও কম হইনি। আবার ২১শে সেপ্টেম্বর।

এই দিনটা আমাদের সংগঠনের জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। ১৯৭০ সালে চিত্তরঞ্জনে গঠিত হয় এই পর্বতপ্রেমী সংগঠন তবে ১৯৭১ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর সংগঠনের ৪ জনের একটি দল প্রথম পর্বতারোহণের শিক্ষাক্রম শেষ করে পর্বতারোহীরূপে স্বীকৃতি পায়। দলের প্রথম অভিযানের প্রথম শৃঙ্গ জয় হয় হিমাচল প্রদেশের লাদাকী শৃঙ্গ (১৮৪০০´) ১৯৭২ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর। এবার আবার দেখলাম ত্রিশূল আরোহণের প্রথম দিন ধার্য হয়েছে ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪। সমস্ত সদস্যরা একবাক্যে পুরো প্রোগ্রামটিকে গ্রহণ করল, হর্ষধ্বনি করল আর সমস্বরে জানাল: 'আমরা ২১শে তারিখকে সার্থক করব! ২১শে সেপ্টেম্বর জিন্দাবাদ! ত্রিশূল অভিযান জিন্দাবাদ!'

সে রাতে আমরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। আজও আমরা ১৫ জন একসঙ্গে আছি। কাল থেকেই কাজের প্রয়োজনে আলাদা হয়ে যাব। অভিযানে গভীরতা এসে যাবে।

এতদিনের এত কষ্ট, এতজনের এত শ্রম যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়—এস, আমরা সেই কামনা করি।

চোদ্দ

সবই ঠিক ছিল।

কিন্তু প্রথমেই বাদ সাধল আবহাওয়া। সকাল থেকেই চারদিক মেঘে আচ্ছন্ন। রোদের নামগন্ধও নেই। এতদিন হাঁটলাম কিন্তু এরকম আবহাওয়া কোনদিন সকালেই হয়নি। কিন্তু আজ যে অভিযানের চূড়ান্ত পর্ব শুরু হওয়ার দিন, আজ যে ওপরে যাওয়ার দিন।

না, আশা ছাড়লে চলবে কেন? বেলা সাড়ে আটটায় অল্প অল্প রোদ উঠল, যদিও চারধারে যথেষ্ট মেঘ রয়েছে। তবু তারই মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। ঠিক ন'টা পঁচিশ মিনিটে ১৫ জনের দল তৈরী হয়ে গেল। ৩ জন কুলী ফেরী করে ফিরে আসবে, ১২ জন ১ নম্বরে থেকে যাবে।

বিদায়-মুহূর্তে সদানন্দের হাতে তুলে দিলাম পতাকা। বহু মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, শুভেচ্ছা আর ভালবাসা জড়ানো ঐ পতাকা। যাত্রা শুরুর দিন ঐ পতাকা তুলে দেওয়া হয়েছিল আমার হাতে। আজ ত্রিশূলের পদপ্রান্তে এসে ঐ পতাকা তুলে দিলাম আমারই নির্বাচিত অগ্রবর্তী দলের নেতার হাতে। তুলে দিলাম বহু ব্যথাবেদনার ডালি, তুলে দিলাম অনেক কামনা-বাসনার অর্ঘ্য।

বিদায়-মুহূর্তে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হলাম আমরা। সবারই চোখে জল, মুখে হাসি; সবারই দৃঢ় চোয়াল, মুষ্টিবদ্ধ হাত। বেশী কথা বলতে পারলাম না। উষ্ণ করস্পর্শে মনের সব অব্যক্ত কথা যেন প্রকাশিত হল। মুখে শুধু বললাম—যাও, জয়ী হয়ে ফিরে এস।

৯টা ৩০ মিনিট। ওরা চলে গেল। ঐ দূরে এক বিরাট মেঘ এসে আস্তে আস্তে ঢেকে দিল ওদের। সাথীহারা আমরা ক'জন ক্লান্ত পদ-ক্ষেপে তাঁবুতে ফিরলাম। কত নিঃস্ব লাগছে নিজেদের।

না, নিঃস্ব কেন! হৃদয়ের সবটুকু উত্তাপ দিয়েছি ওদের। ওদের

মন জুড়ে রয়েছি আমরা, আমাদের মন জুড়ে রয়েছে ওরা।

যাও সাথীরা, যাও বন্ধুরা, যাও বীরেরা, আমাদের সবটুকু শুভকামনা তোমাদের সঙ্গেই রইল। জয়ী তোমরা হবেই। বিনম্র চিত্তে পাহাড়ের কাছে যাও, সশ্রদ্ধ অন্তরে তাকে স্পর্শ করে ফিরে এস।

এদিকে আমি, আমরা কি করি? একান্ত আলস্যে সময় কাটতে লাগল। কিন্তু এ কি! বেলা মোটে বারোটা, চারদিক মেঘে ঢেকে গেল। খুব হাল্কা করে তুষার পড়তে শুরু করল। অনেকটা সাবুদানার মত।

আজব সিংএর ডাক শোনা গেল এরই মধ্যে। ত্রিপল ঢাকা কিচেনে বসেই খেয়ে নিলাম। আমরা মাত্র কয়েকজন। খেয়ে নিলাম বটে কিন্তু বড় চিন্তা হতে লাগল। চারদিক প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বুঝতে পারছি না ওপরের অবস্থা কেমন। মাত্র সাড়ে ১২টা। এর মধ্যে কি ওরা ১ নম্বরে পৌছতে পারবে? মাঝপথে তুষারপাত হওয়া মানেই ঝামেলা।

তুষারপাতের পরিমাণ একটু বাড়ল। তাড়াতাড়ি তাঁবু ঠিক করে নিলাম। মূল শিবির প্রায় খালি। মোটে ২টো তাঁবু রয়েছে। সাদা আর্কটিক তাঁবুতে আমি আর সুশান্ত। হলুদ বড় তাঁবুতে বাকী ৫ জন।

এখন একমাত্র কাজ ওপর থেকে যারা ফেরী করে আসবে তাদের জন্য অপেক্ষা করা। রেডিও বাজালাম, একটু পরেই একঘেয়ে লাগল। গান গাইলাম, সুশান্ত থালা মগ বাজিয়ে প্রাণ আনতে চাইল, কিন্তু চারদিক এত শান্ত, কিছুতেই জমানো গেল না। আসলে চিন্তার মেঘ দূরে সরানো গেল কই! তুষার-পড়া বন্ধও হল না, আবার পরিমাণে বাড়লও না। একই গতিতে পড়তে লাগল। বুঝতে পারছি না, হয়ত রাতে বাড়বে। ওপরের ছেলেরা প্রোগ্রামমত এগুতে পারবে তো?

হঠাৎ হৈ হৈ আওয়াজ। অনেক লোকের কথাবার্তা। তাকিয়ে দেখি জয় সিং এসে গেছে। ঠিক ৩টে বাজে।

—'কি খবর জয় সিং?'

—'ঠিক হ্যায় সাব, সব ঠিক হ্যায়—' জয় সিং এক গাল হাসল। এই ওদের এক দোষ, সব কথাতেই হাসি। হয়ত জীবনের চরম বিপর্যয়ের কথাটাও এমনি হাসিমুখে বলে দিতে পারে ওরা। কই, এত শিক্ষা, এত সংস্কৃতি, এত শালীনতা শেখার পরও আমরা তো পারি না।

জয় সিংএর টুপিতে, পিঠে, কাঁধে বেশ কিছু বরফের কুচি আটকে আছে। বলল, 'সাড়ে ১২টায় ওরা ১ নম্বরে পৌঁছেছে। শেষ ১ ঘণ্টা তুষারপাতের ভেতরেই চলতে হয়েছে।' হাসি হাসি মুখে আরও বললো, 'কোই চিন্তা নেহি লীডার সাব, সবকোই বিলকুল ঠিক হ্যায়। ইয়ে লো, উপর সে চিট্‌ঠি ভেজা।'

সদানন্দর চিঠি :

১৭ই সেপ্টেম্বর

Camp-1

বিজয়,

আমরা সবাই ১২-৩০ মিঃ এসে পৌঁছেছি। ১১½ টা থেকে snow পড়তে শুরু করেছে এবং এখনও পড়েছে। Weather খুব ভাল নয়। আমরা ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছি তাই Ration short করতে পারলাম না। তোমরা সুবিধে মত পাঠিয়ে দিও। একটা কোমরের বেল্ট আর ধূপ পাঠিয়ে দিও। আমরা সবাই মোটামুটি ভাল। ইতি—

সদা

প্রবীর লিখেছে :

Thursday/17.9.74

Camp-1

বিজয়দা,

এইমাত্র heavy snowfall-এর মধ্যে Camp-1এ এলাম। বাইরে যাওয়া যাচ্ছে না। আজ Ration-এর demand পাঠাতে পারলাম

না। Q.M-কে বলবে আগামীকাল ওর chart অনুযায়ী পাঠাতে। Pollythine packet কয়েকটা পারলে পাঠাবে। মেম্বাররা সবাই সুস্থ। আবহাওয়া ভাল না। জানি না আমাদের programme অনুযায়ী এগুতে পারব কিনা। তবে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাব।

প্রবীর

নিশ্চয়ই। তা তো করবেই। আমরা তো তা জানিই। হে আমার বীর বন্ধুরা, তোমাদের ওপর এতটুকু আস্থা আমরা হারাইনি। জানি—পতাকার সম্মান তোমরা রাখবেই।

সাড়ে চারটে বাজে। বিকেলের চা খাওয়া হয়ে গেল। ওপরের চিঠি ছ'টো সুশান্তকে দিয়ে দিলাম। রেশনের ব্যবস্থা করার জন্য।

প্রোগ্রাম অনুযায়ী কালও আমাদের রেস্ট ডে। কিন্তু এভাবে ভাল লাগছে না। কাল তিনজন কুলীর ওপরে ফেরী করতে যাওয়ার কথা। ঠিক করলাম, আবহাওয়া ভাল থাকলে আমরাও ১ নম্বরে যাব। ফেরী করে চলে আসব। তবু তো ওদের সঙ্গে দেখা হবে। তবু তো ওদের কিছু রসদ পৌঁছে দিতে পারব।

আকাশবাণীর বিশেষ ব্যবস্থাতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানা যাচ্ছে। বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে একটি বিশেষ মিটারে বিশেষ কোডে বলা হল—আমরা সাগ্রহে টুকে নিলাম। জানা গেল মূল শিবিরে তাপমাত্রা প্রায় মাইনাস ৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, হাওয়ার গতি ঘণ্টায় ২৫ কিলোমিটার, হাওয়ার দিক উত্তর-পশ্চিম। ১ নম্বর শিবিরের জন্য আগামী চব্বিশ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হল: তাপমাত্রা—৭° সেন্টিগ্রেড, উত্তর-পশ্চিমী হাওয়া ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার বেগ, মোটামুটি মেঘাচ্ছন্ন আকাশ।

তা, এর আর পূর্বাভাসের কি আছে? দেখতেই পাচ্ছি। ঠাণ্ডা তো হাড়ে হাড়েই মালুম দিচ্ছে। আর মেঘ? কালকের কথা কি, আজ এখনও চারদিক ঢাকা। জানি না রাতে কি চেহারা দাঁড়াবে!

মূল শিবিরে সন্ধ্যে হতে না হতেই রাতের খাবার দিয়ে দেওয়া হয়। অন্ধকার হলেই সব কাজ বন্ধ। প্রথম কথা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, দ্বিতীয় কথা

অন্ধকার এত গাঢ় যে মোমবাতির আলোয় কোন কাজই করা যায় না। একটু পরে তাঁবুতে বসেই হরলিকস্ জাতীয় উষ্ণ পানীয় পেয়ে গেলাম।

সামনে সুদীর্ঘ রাত। রেডিয়োর কাঁটা ঘোরানো ছাড়া আর কোন কাজ নেই। মাঝে মধ্যে ডাইরী নিয়ে বসি বটে, কিন্তু কেন জানি ভাল লাগছে না। মনে শুধু অসংখ্য ভাবনা। ওরা ভালো আছে তো? এই রকম বরফ পড়তে থাকলে ওদের খুব অসুবিধে হবে। আবহাওয়া এই রকম থাকলে কাল কি হবে! এমনি আরো হাজার ভাবনা। আশা-নিরাশার এক নিরন্তর দোলায় দুলছি যেন।

না, আর ভাবব না। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি—প্রকৃতি প্রসন্ন হোক আমাদের প্রতি। আগামী কালের প্রভাত আশার রৌদ্রে উজ্জ্বল হোক। ওপরের বন্ধুরা তাদের কাজ চালিয়ে যাক। আমিও ওদের যেন একটু সাহায্য করতে পারি।

পনের

ঘুম ভাঙল সুশান্তর নড়াচড়াতে।

একটু আলো ফুটতেই পেলাম বেড-টি। বাইরে এলাম। আঃ, একেবারে পরিষ্কার আকাশ। তবে চারদিক সাদা। তাঁবুর ওপর ইঞ্চিখানেক পুরু হয়ে বরফ জমে আছে। চমৎকার লাগছে চারদিক।

চটপট তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ২ জন কুলীকে নীচে পাঠালাম কাঠের জন্য। আমরা রুকস্যাকে কিছু কিছু রেশন আর ফেদার জ্যাকেট-গুলো ভরে নিলাম।

বেলা ১১টা পর্যন্ত আকাশ পরিষ্কার রইল।

ত্রিশূল-হিমবাহকে বাঁয়ে রেখে এগুতে লাগলাম। ডানদিকে বেথারতলির অংশবিশেষ। মূল শিবির থেকে ১০ মিনিট এগিয়ে বেশ সুন্দর ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড পেলাম। জয় সিং জানাল এখানে প্রাক্

বর্ষাকাকালীন অভিযানের মূল শিবির হয়। তখন কাছাকাছি জল পাওয়া যায়।

আরও একটু এগিয়ে দেখি, প্রায় একটা বাস্কেটবল খেলার জায়গা। তিন দিকে তিনটে বিরাট পাথর জায়গাটা ঘিরে আছে বলেই এ জায়গার নাম ত্রিদাঙ। বহুদিন থেকেই এ অঞ্চলের মূল শিবিরের জায়গা এটা। তবে আজকাল এখান থেকে জলের ধারা সরে গেছে বলে এখানে আর মূল শিবির হয় না। একদিকের একটা পাথর না থাকলে চমৎকার হেলিপ্যাড করা যেত।

আমরা দক্ষিণদিকে এগুচ্ছিলাম। সামনেই মৃগথুনীর বিশাল চেহারা। সামনে ত্রিশূল-হিমবাহ ডানদিকে ঘুরেছে। এই মোড় ঘোরার কাছে মৃগথুনীর বরফের স্রোত এসে ত্রিশূল-হিমবাহে মিশেছে।

মৃগথুনীর দিকে যেতে হলে আমাদের জায়গাতেই মূল শিবির করা যেতে পারে। এ পর্যন্ত একই রাস্তায় এসে ত্রিশূল-হিমবাহকে পার হতে হবে, তারপর মৃগথুনীর ১ নম্বর শিবির করা যেতে পারে। সম্ভাব্য ১ নম্বরের জায়গাও দেখা যায় এখান থেকে। তারপর মৃগথুনীর বিশাল গা ধরে দক্ষিণ দিকে কোনাকুনি উঠে ২ নম্বর শিবির করা যেতে পারে। তবে পথে ছোট্ট একটা আইস ফল (Ice fall) পড়বে যাকে ডানদিক দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব।

যেখান থেকে ত্রিশূল-হিমবাহ ডানদিকে বেঁকে গেছে আমরা প্রায় সেখানে চলে এলাম। এক ঘণ্টাও লাগল না। এ পর্যন্ত উচ্চতার বিশেষ কোন হেরফের হয়নি। এবার ডানদিকে ঘুরে দেখলাম অন্ততঃ হাজার দেড়েক ফুটের এক বিরাট চড়াই। একেবারে সোজা উঠে যেতে হবে। শুধু আলগা পাথর, নুড়ি পাথরের চড়াই। বাঁ দিকে একটা গিরিশিরার মত, যাকে ত্রিশূল-হিমবাহের প্রান্তীয় গ্রাবরেখা বলতে পারি। ডানদিকে, একেবারে সোজা, পাথরের বিশাল দেওয়াল। ঠিক একটা দুর্গের দেওয়ালের মত। এই পাথরের দেওয়ালের বাঁ দিক দিয়ে ত্রিশূলের রাস্তা আর ডান দিক দিয়ে বেথারতলীর পথ।

দেড় ঘণ্টার ওপর লেগে গেল সেই চড়াইয়ের মাথায় উঠতে। প্রচণ্ড পরিশ্রমে ঘেমে একেবারে নেয়ে গেছি। এরকম টানা চড়াই বোধহয় আর নেই। তাই বলে স্বস্তিরও কোন কারণ নেই। ক্রমাগতই উপর-নীচ করতে হচ্ছে। শুধুই পাহাড়ের দেশ। বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই পড়ে আছে অজস্র। যেন এক উপলাহত উন্মত্ত সমুদ্র, শত সহস্র ঢেউ তুলে অকস্মাৎ কার ইঙ্গিতে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

পাথরে পাথরে পা দিয়ে, পাথরের কোল ঘেঁষে, পাথরকে এড়িয়ে অনেকক্ষণ চললাম। জয় সিং কি করে যে পথ ঠিক রাখছে কে জানে!

একটু যেন সমতল। বাঁ পাশে প্রকাণ্ড বড় এক পাথর। মনে পড়ল I.T.B.P.-র হুকুম সিংএর কাছে দেখেছিলাম এই পাথরের ছবি। ওদের ত্রিশূল অভিযানে এখানে ১ নম্বর শিবির করেছিল।

কিন্তু আমরা ১ নম্বর আরো ওপরে করেছি। পাথরটাকে বাঁয়ে রেখে উঠতে লাগলাম। একটা জলধারা পড়ল। ঐ পাথরের ধারে শিবির করলে এটাই হবে জলের সূত্র। ত্রিশূল এখনও দেখতে পাইনি। তবে তারই দেহের অংশ বেথারতলীর সঙ্গে যেখানে মিশেছে সেই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে। জলধারাটা সেখান থেকেই এসেছে।

সামনে আবার চড়াই। খুব বড় নয়, ৫০০ ফুট হবে। জয় সিং জানাল এর ওপারেই ১ নম্বর।

একসময় উঠে এলাম তার মাথায়। এই প্রথম বরফের দেশ চোখে পড়ল, চোখে পড়ল ত্রিশূলের গোড়ার দিকের কিছু অংশ। বেশী ওপরে নজর চলছিল না, কারণ ঘন মেঘে আমাদের মাত্র কয়েকশো ফুট ওপর থেকে সব ঢাকা। মনে ছিল না, ১২টা প্রায় বাজে, মেঘ তো হবেই। গত তিনদিন থেকেই লক্ষ্য করছি বেলা ১২টার পর থেকে চারদিক, বিশেষ করে ত্রিশূলের দিক মেঘে ঢেকে যাবেই।

অবশেষে এক নম্বর শিবির।

১৭,৮০০ ফুট। প্রচলিত এক নম্বর থেকে প্রায় ৭০০ ফুট ওপরে করা হয়েছে।

ছোট বড় পাথরের ওপর সাদা আর সবুজ রঙের বেশ কয়েকটা তাঁবু পাতা হয়েছে। তাঁবুর ঠিক পর থেকেই বরফের দেশ শুরু হয়েছে।

জানতাম, পূর্ব প্রোগ্রাম অনুযায়ী, কেউ এক নম্বরে থাকবে না। সবারই ওপরে যাওয়ার কথা। তবু শিবির দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলাম, আর কি আশ্চর্য, আমাদের সব নৈরাশ্যকে ধূলিসাৎ করে তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল পিকে—প্রবীর ব্যানার্জী।

—এ কি—পিকে!

—তুমি এখানে?

—ওপরে যাওনি?

—শরীর খারাপ নাকি?

—আর সবার খবর কি?

ওর কাছে ছুটে যেতে যেতে আমাদের মুখ থেকে আপনিই যেন প্রশ্নগুলো পরপর বেরিয়ে এল।

পিকেও আমাদের দিকে ছুটে আসছিল। পরস্পরের মুখোমুখি হলাম আমরা। দশ কদমও ছুটিনি, তবু যেন হাঁফ ধরে যাচ্ছে। বাতাসে অক্সিজেনের স্বল্পতা মনে পড়িয়ে দিল আমরা ভাল উচ্চতায় রয়েছি।

একগাল হেসে, দু হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানাল পিকে। ওর বাড়ানো দু হাতে সাঁড়াশি আর খুন্তি। কি ব্যাপার?

—'আর বলবেন না। এই স্বর্গে এসেও ধান ভেনে দিন গেল আমার! দেখুন না সদার কাণ্ড। সকালে উঠে বলে বসল, পিকে, তোমাকে যেতে হবে না। আমি তো থাকছিই, সবাই দু'নম্বর তৈরী করে আসুক, তুমি রান্না কর, ভাল খেতে না পারলে সবার মনোবল কমে যাবে। ব্যাস আর কি, আমার নেতার আদেশ। বাবুরা চললেন পাহাড় জয় করতে, আমি শালা মরি তাদের জন্য খিচুড়ি আর আলুভাজা করে।'

পিকে হাত, চোখ, মুখ, তদুপরি হাতের সাঁড়াশি, খুন্তি নেড়ে অভিমান-অভিমান গলায় বলল বটে, কিন্তু আমি দেখলাম ওর মুখে

নির্মল হাসি আর পর্বত-অভিযানের সবচেয়ে বাজে অথচ দরকারী কাজটা করতে পারায় খুশী। ওর দায়িত্ব সম্বন্ধে ও যথেষ্ট সচেতন। সব চেয়ে বড় কথা, ওর হাতের খিচুড়ি যে শ্রান্ত-ক্লান্ত বন্ধুদের অনেক প্রেরণা যোগাবে একথা ভেবে ওর চোখ-মুখ যথেষ্ট উজ্জ্বল।

আমরাও আনন্দিত। একসঙ্গে ছুটো জিনিস পেলাম। Hot খিচুড়ি আর Hot অভ্যর্থনা। আমরা পিকেকে ধন্যবাদ জানালাম ওর ডবল Hot-এর জন্য।

পিকেও খুশী। ওর কথা বলার লোক হল। এই উচ্চতায়, এই হালকা বায়ুস্তরে, এই নির্জন প্রদেশে, এই বিচিত্র পরিবেশে একা থাকা খুবই কষ্টদায়ক। আর ও ভাবেইনি আমরা আজ আসব। কথা তো ছিল না।

হাসি, গল্প, কথায়, ভবিষ্যতের প্ল্যান প্রোগ্রামে আর খিচুড়ি আলু-ভাজায় অনেক সময় কাটল। বেলা পৌনে একটা। চারদিক মেঘে ঢাকা, সামনের দিকে ছু'শো গজের বেশী নজর চলছে না।

—ওই, ওরা নামছে!

হ্যাঁ, প্রথমে আমার চোখেই পড়ল। তাঁবুতে বসে ছিলাম। কথা বলছিলাম, গল্প করছিলাম, কিন্তু নজর ছিল সামনে বরফের ঢালটার দিকে। প্রায় একটা বাজে। হঠাৎই নজরে এল তিনটে কালো বিন্দু নড়ছে।

আমরা সবাই বাইরে বেরিয়ে এলাম। একটু পরে দেখি ছুটো পথ ধরে ওরা সবাই নামছে।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই ওরা এসে পড়ল। শ্রান্ত, কিন্তু উৎফুল্ল।

দূর থেকেই সদা হাত নেড়ে জানাল—সব ঠিক আছে। কাছে এসেই বলল, খুব সাফল্যের সঙ্গেই ওরা ১৯৫০০ ফুট উঁচুতে ২ নম্বর শিবির স্থাপন করেছে। ছু'টি তাঁবু সেখানে পাতা হয়েছে। তার মধ্যে সব রেশন ও অন্যান্য মাল রেখে তাঁবুর মুখ বন্ধ করে এসেছে।

যাক, এখন পর্যন্ত সব ঠিক ঠিকই চলছে।

এদিকে এখানে হঠাৎ তুষার পড়া শুরু হল। গতকালও এরকম সময়ে তুষারপাত হয়েছে। তবে রক্ষা এই যে হাওয়ার বেগ প্রায় নেই। ফলে খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না। নিমা জানাল এরকম মাঝারি আবহাওয়া থাকলেও প্রোগ্রাম অনুযায়ী সাফল্য সম্বন্ধে সে যথেষ্ট আশাবাদী। সদাও একই কথা বললো। বললো, ২১শে চূড়ান্ত চেষ্টা করবই।

বাইরে তুষার পড়া বাড়তে লাগল। এভাবে ক্রমাগত পড়তে থাকলে আমাদের ফেরা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। ঠিক আছে, এখানেই না হয় থেকে যাব। মূল শিবির ঠিকই বুঝতে পারবে।

প্রায় পৌনে তিনটে।

জয় সিং হাঁক দিল—সাব চলিয়ে, মৌসম সাফ হো রহা।

বাইরে এলাম। হ্যাঁ, অনেক কমে গেছে বরফ পড়া। মনে হচ্ছে একেবারেই কমে যাবে।

বাঃ, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বরফ পড়া বন্ধ হয়ে গেল। দেখতে দেখতে চারদিক পরিষ্কার হয়ে গেল। সামনে নীল আকাশ দেখা গেল। দেখা গেল তার নীচে অনেকখানি বরফের রাজ্য।

চমৎকার! দু চোখ জুড়িয়ে যায়।

১নং শিবির থেকেই চির-তুষারের দেশ শুরু হয়েছে। কয়েকটা ধাপে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে বরফের দেওয়াল। একটু বাঁদিক ঘেঁষে স্তরে স্তরে বরফের শরীর উঠে গেছে—ঐ হল আমাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু ত্রিশূল। এখান থেকে মনে হচ্ছে বিশাল এক বরফের স্তূপ, একটা ডোম বিশেষ। কারণ ত্রিশূলের শীর্ষদেশ দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে, শুধু চওড়া কাঁধাটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি।

পেছন থেকে জয় সিং তাড়া লাগালো, 'সাব, জলদি চলো, সাড়ে তিন বাজ রাহা হ্যায়, বেস ক্যাম্প যানে মে আন্ধেরা হো যায়েগা।'

হ্যাঁ, জয় সিং, চলো। চলি বন্ধুরা। তোমরা তোমাদের কাজ করে যাও, আমরাও আমাদের কাজ করি। আবার দেখা হবে চূড়ান্ত লড়াই-এর পর। ২১শে সেপ্টেম্বরের চূড়ান্ত লগ্ন পেরিয়ে।

ফিরতে লাগলাম।

সেই একই পথ। তবে এমনিতেই নীচে নামা অনেক বিপজ্জনক, তার ওপর বেশ ভালই বরফ পড়েছে। আলগা পাথরের ওপর বরফের স্তর পড়ে গিয়ে সমস্ত অঞ্চলটাই এক সাদা-কালো ধাঁধায় পরিণত হয়েছে। কোথায় পা দেব, কোথায় বরফের নীচে গর্ত আছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবু তার ভেতর দিয়েই চলতে হচ্ছে এবং চলতে হচ্ছে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি।

ক্রমে সেই প্রায় সমতল ভূমিতে এসে পড়লাম। উচ্চতা কিছু কমেছে। বরফও প্রায় শেষ। শুধু পাথরগুলো ভেজা এবং কিছুটা পিছল।

বরফ কমে গেছে, আবার দিনের আলোও কমে এসেছে—ঝড়ের বেগে নামতে লাগলাম। মনে শুধু ওপরের চিন্তা। সব ঠিকমত হবে তো? একটা দিন এদিক-ওদিক হলেই পয়সার টান পড়ে যাবে। প্রোগ্রাম অনুযায়ী চলতে পারব তো? একটু বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম সবাই। সঙ্গে সঙ্গেই মাশুল দিতে হল সেই প্রায়-সমতল ভূমিতেই। হঠাৎই হোঁচট খেল সুশান্ত। হাত দুটোতে আইস-অ্যাক্স ধরা ছিল। সাবধান হবার কোন সুযোগই পেল না ও। মাথা এগিয়ে যাওয়া অবস্থায় সোজা ধাক্কা খেল সামনের পাথরে, সজোরে।

মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনাটা। আমরা কিছুমাত্র বুঝে ওঠবার আগেই দেখি ওর মাথা, কপালের ঠিক ওপরে বেশ খানিকটা কেটে গেছে। দরদর ধারে রক্ত পড়ছে।

কি করি!

বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরলাম ক্ষতস্থান। দীনেন, হাতে পরা, যে গ্লাভস ছিল, তাই দিয়ে কপাল চোখ মুখ থেকে রক্তের ধারা মুছিয়ে দিল। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে। মিনিটখানেক চেপে রাখতেই রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল। একটু বিশ্রাম নিয়েই আবার চলা শুরু। কোন উপায় নেই, অবস্থা যাই হোক, কষ্ট যতই হোক চলতে হবেই। এখানে আর কিছু করার নেই, একটা ব্যাণ্ডেজও সঙ্গে নেই যে বাঁধব। মূল

শিবিরে পৌঁছলে ডাক্তার দেখবে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল।

সুশান্ত কিন্তু দারুণ spirited। মিনিট খানেক চুপ করে থাকার পর ও অদ্ভুত একটু হাসল। বলল, 'বোধহয় এটাই বাকী ছিল। ত্রিশূলকে রক্তের অর্ঘ্য দিলাম। এবার কি সে আমাদের ফিরিয়ে দিতে পারবে ?'

—'ইয়ে হুয়া না মরদ য্যায়সা বাত।' জয় সিং ইতিমধ্যেই প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েছে, দু হাতে সুশান্তকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে সে বলল, 'সাব, পাহাড় পর তো অ্যায়সা হোতাই হ্যায়। পাহাড়ে এরকম কত হয়। কিন্তু তাতে ভয় পেলে চলবে কেন ?' আরও বলল জয় সিং, 'আর সেরকম হলে এই জয় সিংকে আর ত্রিশূলে আসতে হতো না।'

—'কেন জয় সিং, কি হয়েছিল তোমার এখানে ?' সুশান্ত, দীনেন, আমার তিনজনের কণ্ঠেই বিস্ময়।

—'হ্যাঁ সাব, বাতাউঙ্গা, ও এক কিস্‌সা হ্যায়,' সুশান্তকে ধরে চলতে লাগল জয় সিং, বলল, 'চলো সাব, চলতে চলতে কিস্‌সা শুনো। তুমকো আভি জেরা ধীরে চলনা হ্যায়। তোমাকে একটু আস্তে চলতে হবে। চলতে চলতে আমার অভিজ্ঞতার কথা শোন।'

সে দিনটা জয় সিংএর খুব মনে পড়ে। সেবারও এসেছিল এই ত্রিশূল অঞ্চলে। মূল শিবির করেছিল একই জায়গায়, ত্রিদাঙে। সেবারের লক্ষ্য ছিল ত্রিশূলের ডানদিকের শৃঙ্গ বেথারতলী হিমল (২০৭৩০´)।

সবকিছুই ঠিক ঠিক চলছিল। শেষ শিবির ৩নং ক্যাম্পও হয়ে গেল ১৯২০০ ফুটে। বেথারতলী হিমল আর দক্ষিণ বেথারতলীর সংযোগকারী কলটা থেকে মাত্র ৬০০ ফুট নীচে। দিনটা ছিল ৪ঠা জুন, ১৯৭০।

আবহাওয়া ভালো নয়, তবু পরদিন ভোরে উঠে নীতিন প্যাটেল, আঙ কামি আর পাশাং শীর্ষ অভিযান চালালো। কষ্টসাধ্য পথ, বরফের অবস্থা খুবই খারাপ, আকাশও মুখ ভার করে এল। তবু ওরা চলল।

বিপজ্জনক বরফের ঢাল পার হতে প্রায় ৪০০ ফুট দড়ি লাগালো। প্রায় ২০ হাজার ফুটে পৌঁছেও গেল। কিন্তু ক্রমবর্ধমান তুষার-ঝড় ওদের আর এগুতে দিল না। দেহের শেষ শক্তিটুকু শেষ করে ওরা ৫নং শিবিরে ফিরতে বাধ্য হল।

সারারাত তাঁবুর খুঁটি আঁকড়ে ধরে দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে রইল। বুক বাঁধল অসীম আশায়, ভোর হবে, কেটে যাবে দুর্যোগ, আবার ওরা বেরুবে। ওরা ছাড়াও শিবিরে আরও তিনজন রয়েছে। তারা এগিয়ে যেতে পারবে, স্পর্শ করে আসবে বেথারতলী শীর্ষদেশ।

কিন্তু না, প্রকৃতি বাদ সাধল ওদের স্বপ্নে। ভোর হল, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হল না, হাওয়ার বেগ কমল না, তুষার-ঝড় বন্ধ হল না। বোঝা গেল তাড়াতাড়ি পরিবর্তনের কোন আশা নেই।

তাহলে উপায় ?

এই উচ্চতায়, এই তুষার-ঝড়ে যদি আরও এক দিন এক রাত কাটাতে হয় তবে বোধহয় এমনিতেই ওরা জমে যাবে।

আর তুষার-ঝড় যদি বাড়ে ?

বাড়বে না তারই বা নিশ্চয়তা কোথায় ?

একটা অদ্ভুত মুহূর্ত। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পর্বতারোহীর জীবনে এক সংকটময় মুহূর্ত।

স্থির মস্তিষ্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল : 'এই মুহূর্তে নিরাপত্তার প্রশ্নই সবচেয়ে প্রধান।'

অতএব প্রত্যাবর্তন।

ওরা ফিরতে লাগল। কিন্তু কোথায় ফিরছে ওরা ? কোন্ লক্ষ্যে, কোন্ পথে ? কোন্ দিকে যাবে ওরা ?

বিপুল গর্জনে মেঘের দল পার হয়ে যাচ্ছে ওদের। দশ হাত দূরের কিছু নজরে আসছে না ভালমত। পথের কোন চিহ্নই নেই। নতুন পড়া বরফে সব পথরেখাই চাপা পড়ে গেছে। পথনির্দেশক পতাকাগুলো প্রচণ্ড হাওয়ার দাপটে কোথায় উড়ে গেছে।

তবু চলতে হবে। চলতে হবেই। আর সেই একান্ত ইচ্ছাশক্তির জোরে ওরা চলতে লাগল। ওরা সাতজন। চলতে থাকল প্রতিটি পদ-ক্ষেপে যুদ্ধ করে, প্রতি ইঞ্চিতে এগুতে লাগল নিরাপত্তার দিকে, আশ্রয়ের দিকে।

গুম-গুম্-গুম-গুম্…

অকস্মাৎ এক গগনবিদারী শব্দে থমকে দাঁড়াল সবাই। মুহূর্তের জন্য বুঝি থমকে দাঁড়াল ঐ দুরন্ত হাওয়াও।

অ্যাভালাঞ্চ!

নিজের অজ্ঞাতসারেই ওদের গলা থেকে বেরিয়ে এল এক আর্তস্বর—অ্যাভালাঞ্চ!

মুহূর্তমাত্র, না, তারও কম সময়ে বেথারতলীর পূর্ব গিরিশিরার দক্ষিণ ঢাল থেকে খসে এল বিপুলায়তন বরফের চাঁই। রাশি রাশি, টন টন বরফ ভীম বেগে নেমে এল নিজের ভারসাম্য রাখতে না পেরে, ধেয়ে এল ওদের দিকে। সুবিশাল এক বরফের স্রোত ওদের ভাসিয়ে, ডুবিয়ে সম্পূর্ণরূপে চাপা দিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নেমে গেল নীচে।

অ্যাভালাঞ্চ—হিমানী সম্প্রপাত যে ঠিক কি জিনিস, কত বিশাল এর ব্যাপ্তি, কত দুর্বার এর গতি, কত অপ্রতিরোধ্য এর ক্ষমতা, কত মারাত্মক এর সংহার মূর্তি, তা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া কল্পনায় আনা একান্তই মুশকিল।

যাঁরা বড় বড় নদীতে বান দেখেছেন তাঁরা হয়তো বা এর কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন। একটা বিশাল নদীকে ৬০-৭০ ডিগ্রী খাড়াই করে দিন। তারপর নদীতে যেমন বান আসে, ভীম গর্জনে যেমন ছুটে আসে ২০/৩০ ফুট উঁচু ঢেউগুলো, কল্পনা করুন ওপর থেকে মহাগর্জনে তেমনি বরফের স্রোত, বরফের ঢেউ নামছে, সঙ্গে নিয়ে নামছে তার গতিপথে পড়া যাবতীয় পাথরের চাঁইগুলো। যত নামছে ততই তার গতিবেগ বাড়ছে, ততই তার পরিমাণ বাড়ছে। এবার কল্পনা করুন সেই

খাড়াই বরফের নদার ওপর, মাত্র কয়েকশো ফুট নীচে আপনি দাঁড়িয়ে। দৌড়ে পালাবার পথ নেই, ক্ষমতাও নেই। সময় মাত্র এক মুহূর্ত বা তারও কম। এর চেয়ে আর কতখানি অসহায় অবস্থায় পড়তে পারে মানুষ!

হ্যাঁ, চূড়ান্ত অসহায়ের মত সেই অন্তবিহীন তুষার-সমুদ্রে ডুবে গেল ওরা। ওরা সাতজন। একটা মুহূর্তও বোধহয় নয়। আত্মরক্ষা তো দূরের কথা, পরস্পরের দিকে তাকাবার সময় পর্যন্ত পেল না কেউ। দুরন্ত কালবৈশাখীর মুখে খড়-কুটোর মত উড়ে গেল ওরা।

তারপর—

কটা মুহূর্ত কেটে গেল।

কে জানে ঠিক কতক্ষণ! কোন্ ঘড়িতে করব সেই মুহূর্তগুলোর পরিমাপ!

চারদিক শান্ত। বাতাসের একটানা শোঁ-শোঁ শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই কোথাও। সমাহিত বেথারতলী। নেমে গেছে বরফের স্রোত, অপেক্ষাকৃত কম ঢালে জমা হয়ে স্থির হয়ে গেছে। কে বলবে ক্ষণমাত্র আগে গিরিরাজের প্রলয়-নৃত্যের একটা মহড়া হয়ে গেছে এখানে!

আঃ···

ধীরে ধীরে চোখ মেলল অরুণ। চেতনার স্তরে আস্তে সময় লাগল অনেক।

আমি কোথায়, ভাবতে চেষ্টা করল অরুণ। আমি কি আমার বোম্বের বাড়িতে শুয়ে? আচ্ছা, চোখের সামনে সব ঝাপসা কেন? একটু ঘাড় ফেরাতে চাইল অরুণ। চারদিক সাদা কেন? বিছানায় সাদা চাদর আমার ভাল লাগে, মা কখনো ভোলে না। কিন্তু আর শুয়ে থাকব না, এবার আমি উঠব। উঃ, এ কি, উঠতে আমার এত কষ্ট হচ্ছে কেন?

উঠে বসবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করল অরুণ। দেহে সুতীব্র যন্ত্রণা আর এই যন্ত্রণার অনুভূতি বুঝি ওকে চেতনার স্তরে আসতে সাহায্য করল।

না, বোম্বে তো নয়, আমি তো পাহাড়ে এসেছিলুম। হ্যাঁ, তাই তো, আমি তো পাহাড় জয় করতে এসেছি। আচ্ছা, আজ কত তারিখ? না, মনে করতে পারছি না। কিন্তু পাহাড়—বেথারতলী, বন্ধুরা, হ্যাঁ, সব মনে পড়ছে। দ্রুতগামী চলচ্চিত্রের মত অরুণের চোখে ভাসল পাহাড়—বেথারতলী ৩নং শিবির—সাথী নীতিন—তুষার-ঝড়—ঢাল বেয়ে নামা—একটা শব্দ—অ্যাভালাঞ্চ—

অ্যাভালাঞ্চ!

এক তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে অরুণের বিস্মৃতির পর্দাটা ফালাফালা হয়ে গেল। সব—সব মনে পড়ে গেল ওর। ওরা অ্যাভালেঞ্চের কবলে পড়েছিল, ডুবে গিয়েছিল বরফের চলমান সমুদ্রে। তারপর—

ও বেঁচে আছে!

মৃত্যুকে জয় করা জীবনের মহাউল্লম্ফনের মতই এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল অরুণ। ও বেঁচে আছে। ও মরেনি, অসহ্য ঠাণ্ডা আর তুষার-ঝড়, মহাপ্লাবনের মত বরফের স্রোত ওকে মারতে পারেনি। বিপুল বরফের স্রোতে ও ডুবতে ডুবতেও ভেসে আছে। অসহ্য আনন্দে আকাশে দু হাত তুলে অরুণের চেঁচাতে ইচ্ছে করল—'আমি বেঁচে আছি!'

কিন্তু—

আমার সাথী—নীতিন? নীতিন কোথায়? কোথায় আমার আর সব সঙ্গীরা?

উদ্‌ভ্রান্তের মত এদিক ওদিক তাকায় অরুণ।

ঐ তো, ওটা কে! হলুদ উইণ্ডপ্রুফ প্যান্টটা চেনা মনে হচ্ছে, হ্যাঁ, ওটা তো নীতিনের। কিন্তু নীতিন ওরকম করে আছে কেন?

কয়েক পা এগিয়ে নীতিনের কাছে পৌঁছয় অরুণ।

না—না—

অস্ফুট আর্তনাদে দু হাতে মুখ ঢাকে অরুণ। কী বীভৎস দৃশ্য! উলটো হয়ে পড়ে আছে নীতিন। শরীরের ওপরের অর্ধেকটা, মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত বরফের মধ্যে ঢোকানো। জীবন্ত তুষার-সমাধি হয়ে গেছে

নীতিনের !

পাগলের মত চেঁচাল অরুণ—'নীতিন, নীতিন !' বন্ধুর ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য আজ আর কেউ নেই। উন্মত্তের মত নীতিনের পা ধরে টানাটানি করতে লাগল অরুণ। জানে, নীতিন বেঁচে নেই, বহু আগেই ওর দেহ ওই তুষারের মতই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তবু—

—বাঁচাও—বাঁচাও—

থমকে দাঁড়াল অরুণ। কার একটা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে না ? ওর মাথাতে অসহ্য যন্ত্রণা, তবু অরুণ শুনতে চেষ্টা করল।

—বাঁচাও—বাঁচাও—

হ্যাঁ, ঐ তো, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কোথায় ? কোন্‌দিকে ? হাওয়ার শব্দে আর নিজের অর্ধচেতন অবস্থায় বোঝাই যাচ্ছে না ঠিক কোন্‌দিক থেকে, ঠিক কতদূর থেকে আওয়াজটা আসছে। উদ্‌ভ্রান্তের মত চারদিকে তাকায় অরুণ। ওদেরই কেউ বেঁচে আছে। কিন্তু ও বুঝতে পারছে না কেন ? এক মুহূর্ত তাড়াতাড়ি হলে হয়ত একটা প্রাণ বাঁচানো যেতে পারে।

—বাঁচাও—বাঁচাও—

এই তো, কাছেই, একেবারেই কাছে। এগিয়ে গেল অরুণ। একটা তুষার-ফাটল (crevasse)। ভেতর থেকে আসছে আওয়াজটা। ঝুঁকে দেখতে চাইল অরুণ। অতলস্পর্শী খাদ। কিছু নজরে এল না। কিন্তু খাদের কাছে মুখে একটা দড়ি চোখে পড়ল।

দড়িটা টানতে গেল অরুণ। নাড়াতে পারল না। নীচ থেকে প্রচণ্ড টান। বুঝল এই দড়িতেই বাঁধা ছিল কেউ, তুষার-ধসের ধাক্কায় পড়েছে এই খাদে।

যাই হোক না কেন, খাদে পড়া মানুষটি এখনও বেঁচে আছে—এই চিন্তাতেই দ্বিগুণ উৎসাহ পেল অরুণ। নতুন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে খাদে পড়া সঙ্গীকে উদ্ধারের কাজে লাগল ও।

সুদীর্ঘ পনেরো মিনিটের অক্লান্ত পরিশ্রমে, অবশেষে সেই হতভাগ্য

মানুষটাকে ওপরে তুলল অরুণ। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল শেরপা পাশাং তেম্বা।

ঐ শীতেও সারা গায়ে ঘাম ছুটিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিল অরুণ। পাশাং ওর সামনে দাঁড়িয়ে। ক'টা মুহূর্ত বুঝি ওরা পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল, তারপর আকুল এক আবেগে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল।

সেই মৃত্যুপুরীতে দাঁড়িয়ে অরুণের মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল। এখন, কিছু সময় পার হওয়াতে, আরও একটা প্রাণের উষ্ণ সাহচর্যে ওরা দুজনেই অনেক সুস্থ, অনেক ধাতস্থ।

নতুন করে চারদিক দেখল ওরা। ধ্বংসের পরিমাপ করতে চাইল ওরা। খুঁজে দেখতে চাইল ওদের আর আর সঙ্গীদের।

অরুণ আর পাশাং হাতড়ে ফিরতে লাগল চারপাশ, কোন আশা নেই, বুঝতে পারছে আর কাউকেই ফিরে পাবে না ওরা, তবু এক অসম্ভব আশা, যতক্ষণ ওদের শেষ দমটুকু আছে, ওদের প্রেরণা যোগাল, দেখ, দেখ—

ওটা কে!

দুজনের নজরই বোধহয় একসঙ্গে পড়েছিল। আর্ত চিৎকারে এক লাফে পৌঁছে গেল ওরা।

এই তো! এ তো পেম্বা! ওদের আর এক শেরপা! মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বরফের ওপর!

জামার ভেতরে হাত চালিয়ে দিল অরুণ।

ও তো বেঁচে আছে!

হ্যাঁ, সারা দেহে আঘাতের চিহ্নসহ অজ্ঞান অবস্থায় ওরা উদ্ধার করল শেরপা পেম্বাকে।

ধীরে ধীরে, অনেক উষ্ণতার বিনিময়ে জ্ঞান ফিরে এল পেম্বার। ঘোলাটে চোখে ও তাকিয়ে দেখল অরুণ আর পাশাং, দুটো উজ্জ্বল মুখ নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল পেম্বা। ওরা ওকে

সাহস দিল—কোন চিন্তা নেই, তিনজন যখন একসঙ্গে হয়েছি, আর আমাদের কে মারবে ?

না, অনেক চেষ্টা করেও আর তিনজন সঙ্গীর কোন হদিশই করতে পারল না ওরা। চারদিকটাই তুষার-ফাটলে ভর্তি। এখন তার অনেকগুলোই আলগা তুষারে ভরা। এর কোন্‌টার কত ভেতরে চাপা পড়েছে সেই হতভাগ্যরা কে জানে ! সব জেনেও, সব বুঝেও ওরা পাগলের মত ওদের খুঁজল, চিৎকার করে ওদের সঙ্গী তিনজনকে ডাকল। সাড়া দিল প্রতিধ্বনি। খাড়া পর্বতের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল আওয়াজ, এক হাহাকারের মত ওদের কানে বাজতে লাগল—আঙ কামি···জাপ্পা····ছেয়াং ফিজো···আঙ কামি····জাপ্পা···ফিজো····

তারপর একসময় ওরা থামল। বুঝল, যা গেছে তা আর ফিরবে না। কিন্তু যা আছে, তাকে বাঁচাতে হবে। পেম্বা মারাত্মক ভাবে আহত, ওরা তু'জনও সুস্থ নয়। এদিকে বেলা পড়ে আসছে। আশ্রয়—একটা তাঁবু—কিছু খাদ্য—কিছু উষ্ণতা আর অন্য সঙ্গীদের সাহচর্য এখনও অনেক দূর। ওরা জানে আজ ২নং শিবিরে কেউ থাকবে না। অনেক পথ পার হয়ে ওদের পৌঁছতে হবে এক নম্বর শিবিরে।

পুরো ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে ওদের মনে হল—এ অসম্ভব। এই তুর্বল শরীর আর মন নিয়ে, আহত পেম্বাকে নিয়ে কি করে এই তুর্লঙ্ঘ্য পর্বতগাত্র বেয়ে ওরা ১নং শিবিরে পৌঁছবে ? তার চেয়ে থাক। কোথাও গিয়ে কাজ নেই। অনেক পরিশ্রম আমরা করেছি। দলের জন্য, উদ্দেশ্য-সাধনের মহৎ সংকল্পে আমরা আমাদের শেষ নিঃশ্বাসটুকুও ব্যয় করেছি। আর না। এবার বিশ্রাম। একসঙ্গে পাহাড়ে এসেছি। সঙ্গীদের ফেলে রেখে আমরাও আর ফিরতে চাই না। নগাধিরাজের কোলে, চিরশান্তির দেশে আমাদের চোখেও ঘুম আসুক।

বোবা চাউনিতে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। মনের গভীরে জীবনের যে অনুরণন, কবরের শান্তি থেকে জীবনের যে গতিময়তা, বিদ্যুতের ঝিলিকের মত তা ওদের চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে আনল।

ওরা আর একবার পরস্পরের কাছাকাছি হল, হাতে হাত রাখল। জীবনের প্রতি প্রেম, বাঁচার অদম্য আকাঙ্ক্ষা চোখের জলে গলে ওদের অভিষিক্ত করল। নিঃশব্দ উচ্চারণ একই কথা ওদের তিনজনের মনে অনুরণিত হল, মৃত্যুর পারাবার পেরিয়ে জীবনের আলোকিত পথে আমাদের যাত্রা, চলো—যাই।

—'সাহাব!'

চমক ভাঙল জয় সিং-এর ডাকে। এক রোমাঞ্চকর বিষাদময় ঘটনার নিখুঁত স্মৃতিচারণে ডুবে ছিলাম আমরা তিনজন। খেয়ালই হয়নি কখন পেরিয়ে এসেছি পুরো পথটা। সারা রাস্তায় একটাও কথা বলিনি আমরা। চোখ ছিল পথের ওপর, শুধুমাত্র চোখের নির্দেশেই এক পা এক পা করে এগিয়ে গেছি মূল শিবিরের দিকে, কান ছিল জয় সিংএর কথায়। তাকিয়ে দেখি মূল শিবিরের একেবারেই কাছে চলে এসেছি। তাকালাম জয় সিংএর দিকে। ও বুঝি এখনও আমাদের মধ্যে নেই। সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার এত কাছে ও ছিল যে তার সর্বাত্মক প্রভাব আজও ওর ওপর থেকে যায়নি। সেই একই আবেগের সঙ্গে ও বলে চলল, 'সাহাব, ইয়াদ আ জানে সে আজভি মেরা নিদ টুট যাতা। ফিরভি দেখো, পাহাড় পর আনা বন্ধ্ নেহি হুয়া।' সুশান্তকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে আরও বলল জয় সিং, 'সাহাব, মরনা তো একদিন হ্যাঁয়, পর জব তক জিনা, ঢঙসে জিনা হ্যাঁয়। কি? ঠিক কিনা বল? মরতে তো একদিন হবেই, কিন্তু যতদিন বাঁচব বাঁচার মত বাঁচব।'

চোখের সামনে মূল শিবির। পৌঁছে গেছি মূল শিবিরের সদস্যরা হৈ হৈ করে বেরিয়ে এল। সামনের দিকে দু হাত বাড়িয়ে চেঁচাল সবাই, 'আ গিয়া, আ গিয়া! আজব সিং জলদি চা লাগাও।'

মেঘ কেটে গেছে। হিমলয়ের শেষ বিকেলের অপূর্ব রঙবাহারী আকাশ মাথার ওপর। সামনে বন্ধুদের চোখে মুখে জীবনের আহ্বান!

মনে হল, বেঁচে থাকাটা কত আনন্দের!

ষোল

কালীর চিঠি :

Camp-1
19.9.74
9.30 A.M.

Leader Saheb,

Programme মতো সদানন্দর নেতৃত্বে 1st party Camp-II চলে গেছে। ওরা সকাল নটার সময় এখান থেকে start করেছে।

কেদার সিং ও কিতারে ওদের সঙ্গে গেছে, মাল ফেরী করে নেমে আসবে।

তোমার party-র মেহেরবান সিং অসুস্থ হয়ে পড়েছে, এখনও বিছানা থেকে উঠতে পারেনি। ওষুধও দেওয়া হয়েছে।

প্রথম দলকে যথাসম্ভব শক্তিশালী করে আমরা পাঠিয়েছি। আবহাওয়া এখন পর্যন্ত ভালোই। কাল সকালে আমরা রওনা দিচ্ছি। 21/9 আর 22/9 summit হবেই হবে।

তোমাদের খবর আশা করি ভালো। শম্ভুদার নির্দেশমতো ছবি তোলা হচ্ছে। ডাক্তারের নির্দেশমতো ওষুধ খাওয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত সবাই সুস্থ আছি।

আজ আর কোন কাজ নেই। শুধু এই এলাকাটা ঘুরে ঘুরে দেখছি। P. K.র supply মতো খেয়ে চলেছি। একটু পরে মাংস ভাত খাবার ডাক পড়বে। গরম জলে মাংসর টিন ফুটছে। তোমরা গন্ধ নিশ্চয়ই পাচ্ছে।

আজ এই পর্যন্ত থাকলো। শুভ সংবাদের অপেক্ষায় দিন ক্ষণ গুণে যাও।

ভালবাসা সহ
কালী ব্যানার্জী

পুন : এই মাত্র সাড়ে ১১টা বাজল। তোমার পাঠানো কুলী খেম সিং আর বীর সিং এসে পৌছল। Tent ও Ration ঠিকমতো এসেছে।

কালী

আবার পুন : Qr. Master, যে পরিমাণে খেয়ে চলেছি, মনে হয় দু'দিনেই সব শেষ করে ফেলবো। ····Ration পাঠাও।

কালী

প্রবীরের চিঠি :

Camp-I, 17,800'
19. 9. 74/বেলা ১২টা

D/Bijoyda,

সব ঠিকমতো চলছে। আজ 1st party সকাল ৯টায় start করেছে। সঙ্গে কিছু Ration ও দুটো Two men tent নিয়ে গেছে। গতকাল যে tent এসেছিল তা কোন কাজে লাগবে না তাই নীচে পাঠাচ্ছি। Jam, Jelly আর দরকার নেই। সুশান্তকে বলবেন যেন আর না পাঠায়। Pineapple Juice বা Slice আনবারও দরকার নেই।

আগামীকাল আসবার সময় সুশান্তকে বলবেন যেন (1) Rice—2 packet, (2) Meat—2 tin, (3) Tin cutter, (4) চিঁড়ে—One packet, (5) Sugar ½ packet, (6) কাঁচালঙ্কা—অল্প, (7) Atta—1 packet, (8) চা–1 packet নিয়ে আসে।

মেহেরবান অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওকে Base-এ ফেরত পাঠালাম। একটা ভাঙা Ice-axe নীচে পাঠালাম।

আবহাওয়া ঠিক বেলা ১১টার পর থেকে খারাপ হতে শুরু করে, ঠিক হয় রাত ৮টা নাগাদ। আমাদের মনোবল অটুট আছে। 1st partyর জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত।

মেহেরবান সুস্থ হলে ওকে C-I-এ পাঠান। আগামীকাল খেম সিংকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন কারণ দরকার হলে ও আপনাদের সঙ্গে C-II যেতে পারবে। ও নাকি আগে একবার অন্য দলের সঙ্গে C-II গিয়েছিল।

আমার মনে হয় মেহেরবান Base-এ একদিন ডাক্তারের proper treatment-এ থাকলেই ভালো হয়ে যাবে। ওরও তাই মত।

Base-এর সকলের জন্য রইল Camp-I-এর প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

প্রবীর

প্রবীরের চিঠি :

C-I

19. 9. 74/১২.১৫ মি.

Dear Doctor,

তোমার বেকারত্ব ঘোচালাম। পেসেন্ট পাঠাচ্ছি—মেহেরবান সিং। ওকে এখুনি fit কর। কারণ ওকে আমাদের ভীষণ দরকার। বিশেষ করে 3rd party-র। আমার মনে হয় ও Altitude effect-এ পড়েছে।

Qrt. Master-কে বলবে স্যুপ যেন সবাইকে খাওয়ায়।

শুভেচ্ছান্তে

প্রবীর

জিতু মিত্রের চিঠি :

Camp-II, 19,500´

19. 9. 74/11. 45 A. M.

To Camp-I,

Dear Prabirda,

আমরা সকলেই ভালমত ১১টার একটু পরে C-II তে এসে পৌঁছেছি। এখন প্রায় ১২টা। এখানে রোদও আছে আবার অল্প বরফও পড়ছে। কেদার সিংকে প্রয়োজনীয় মালপত্র সম্বন্ধে সব বলে দিলাম। ওর সঙ্গে আলোচনা করে কাল তোমরা প্রয়োজনীয় সব কিছু নিয়ে আসবে। Base Camp-এ পারলে খবর দিও।

শুভেচ্ছান্তে

জিতু

প্রবীরের চিঠি :

C-I

বেলা ১টা ১৫ মিঃ

D/Bijoyda,

এই মাত্র Camp-II থেকে কেদার সিং ও কিতারে ফিরে এল। সবাই ঠিকমত পৌঁছিয়েছে।

Quarter-কে বলবেন সঙ্গে করে যেন এক টিন ঘি, মধু এক কৌটো আর এক শিশি Horlicks নিয়ে আসে।

C-II থেকে আসা জিতুর চিঠি এই সঙ্গে দিলাম।

প্রবীর

শম্ভুনাথ দাসের চিঠি :

১৯।৯।৭৪—বৃহস্পতিবার

মূলশিবির

স্থ/তিন নম্বর শিবিরের শিখরযাত্রী বন্ধুগণ,

আমরা দিন গুনছি, ক্ষণ গুনছি। অপেক্ষা করে আছি সেই শুভ মুহূর্তের জন্য যখন প্রথম দল বাঙালীর বিজয়কেতন স্থাপন করবে ত্রিশূল-শীর্ষে। তোমাদের সাফল্যই দলের সাফল্য। আশা করবো শান্ত চিত্তে কর্তব্যকর্মে দৃঢ়পদে এগিয়ে যাবে। নন্দা-ভগবতীর আশীর্বাদ তোমাদের ওপর বর্ষিত হোক। জয় থেকে বিজয়ের পথে সার্থকতার অমৃতসন্ধানে তোমরা বিজয়ী বীরের মত ফিরে এসো। আমরা তোমাদের উত্তপ্ত আবেশে উদ্দীপ্ত করবো। পশ্চিম বাংলা তথা ভারতবাসী তোমাদের সাদর অভিনন্দন জানাবার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

তোমাদের ওপর দায়িত্ব কত গুরুত্বপূর্ণ সেটা ভেবে অগ্রসর হবে। বিজয় আমরা চাই, কিন্তু যেকোন মূল্যে নয়। সাফল্যের পূর্ণ ডালি হাতে ফিরে যেতে চাই। তাই সবদিক চিন্তা করে সঠিক পদক্ষেপে অগ্রসর হবে। জয় সুনিশ্চিত। প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ

শম্ভুদা

—'চিনতে পারছ ?'

সুশান্ত এক পলক তাকাল, একটু হাসল, আস্তে আস্তে হাত বোলাল পাথরটায়, তারপর হাত ছোঁয়াল মাথায়। ওর মাথায় এখনও স্টিকিং প্লাস্টার দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আবার একটু হাসল সুশান্ত, 'একটু বসি।'

কাঁধ থেকে রুকস্যাকটা খুলে মুখোমুখি দু'টো পাথরে আমরা বসলাম। খেম সিং বসল পাশের একটা পাথরে।

—'নিন, পপিন্স খান।' খোলা প্যাকেট বাড়িয়ে ধরল সুশান্ত।

খেম সিংও হাত বাড়িয়ে পপিন্স নিল। ও বোধহয় একটু অবাক। লিডার সাব, কোয়ার্টার-মাস্টার সাব এখানে বসে পড়ল কেন ?

এ জায়গাটা প্রায় সমতল। এর কিছুটা আগেই এক বিরাট পাথুরে চড়াই উঠে আসা হয়েছে। সাধারণ ভাবে চড়াইএর মাঝে বা তার মাথায় উঠে সবাই একটু বসে, একটু দম নেয়। কিন্তু তা না করে এই প্রায়-সমতল ক্ষেত্রের মাঝামাঝি এসে হঠাৎই বসে পড়ার কারণ কি ? অবাক হওয়ারই কথা।

আর যদিবা বসা হল, সব চুপ করে আছ কেন ? কৌতূহল ক্রমেই বেড়ে গেল খেম সিংএর, 'কিউ লিডার সাব, ইহা কিউ বৈঠ গয়ে।'

একটু হাসলাম আমি, একবার তাকালাম সুশান্তর দিকে, 'জানতে হো, কোয়ার্টার-মাস্টার সাবকো ইয়ে জগহ বহুত পসন্দ্ হ্যায়।'

খেম সিংএর চোখে অপার কৌতূহল, 'কিউ সাহাব ? কোই খাশ বাত হ্যায় ?'

—'নশিব পর ইয়ে নিশান দেখতে হো—' 'সুশান্তর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কপাল দেখালাম আমি, 'ইয়ে হি ও জগহ, ইয়ে হ্যায় ও পত্থর, জিসসে সাবকা থোড়া প্যার মহব্বত হুয়া থা।'

—'আচ্ছা ! ইয়েহি ও পথর !' এক উদ্বেগমিশ্রিত উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল খেম। ক্রমান্বয়ে তাকাতে লাগল সামনের পাথরটা আর সুশান্তর ব্যাণ্ডেজবাঁধা কপালের দিকে।

সুশান্ত যেন একটু লজ্জা পেল। কারো মনোযোগ আকর্ষণ করতে ওর পরম অনাগ্রহ। একটা অপ্রতিভ হাসি দিয়ে তাড়াতাড়ি বলতে চাইল, 'আঃ ছাড়ুন তো ওসব। চলুন চলুন, কত বেলা হয়ে গেল।'

সত্যিই আজ আমাদের বড্ড দেরী হয়েছে। আসলে ঘুম থেকে ওঠাই হয়েছে দেরীতে।

গতকাল রাতে ঠাণ্ডা যেন আরও বেড়েছিল। সারাদিন মূল শিবিরেই ছিলাম। দিনের বেলাটা একরকম। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে—ওঃ, ঠাণ্ডার সে কি দাপট ! তাঁবুর ভেতরে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকেও হাড়ে হাড়ে ঠকাঠকি বন্ধ করা দায় হল। সন্ধ্যাকালীন আবহাওয়া ঘোষণায় জানা গেল তাপমাত্রা হিমাঙ্কের বেশ কিছু নীচে।

শুধু তাই নয়, আবহাওয়া-অফিসের ভদ্রলোক অতিশয় শান্ত গলায় আরও জানিয়ে দিলেন 'আগামী চব্বিশ ঘন্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে আকাশ প্রধানত মেঘাচ্ছন্ন থাকবে, বজ্রপাত সহ ঝড়ের সম্ভাবনা আছে, বাতাস বইবে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে।'

তা, আবহাওয়া দপ্তরের মর্মবাণী হাড়ে হাড়ে টের পেলুম পরদিন মানে ২০শে সকালে।

মূল শিবির পুরো সাদা। বেশ কয়েক ইঞ্চি গভীর এক তুষারের পলেস্তরা পড়েছে মূল শিবিরাঞ্চলে। এর আগের রাতেও পড়েছিল, কিন্তু আজ যেন তার থেকেও বেশী। এখানেই যদি এই অবস্থা হয় ওপরের অবস্থা না জানি কিরকম।

আজ, ২০শে, তৃতীয় দলের ওপরে যাওয়ার দিন। মোটামুটি প্রস্তুত হয়ে শেষ মুহূর্তের ছাড়পত্রের জন্য ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি দীনেন শুকনো মুখে বসে।

—'কি ব্যাপার ?'

—'Sorry Leader। দীনেনের ওপরে যাওয়া বাতিল করতে হবে।' জবাব দিল ডাক্তার।

—'কেন কি হয়েছে? কি ব্যাপার দীনেন?'

—'দেখুন না ডাক্তারের কাণ্ড। কাল রাতে বোধহয় কয়েকবার কেশেছি। কিছুই নয়। তা ডাক্তার বলে আমার নাকি—'

—'Finenzitice হয়েছে,' দীনেনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল ডাক্তার, 'Yes, Dinen had a mild attack of Finenzitice. ও ওপরে না গেলে দলের নিশ্চয়ই একটু শক্তি কমে যাবে কিন্তু একবার ওপরে গিয়ে যদি relapse করে, যার সম্ভাবনা খুবই প্রবল, তাহলে শুধু নিজের নয়, গোটা দলের সর্বনাশ ডেকে আনবে ও। তাই আমি বলছিলাম—'

—'No hesitation. Dinen will stay back. এতে দ্বিধা বা লজ্জা পাওয়ার তো কিছু নেই। সবটাই তো দলের স্বার্থে। এই যে ডাক্তার, Quite fit, ইচ্ছে করলেই ওপরে যেতে পারে। কিন্তু না, দলের স্বার্থেই ওকে মূল শিবিরে থাকতে হবে।' দীনেনের মুখোমুখি হলাম আমি, 'কি রে, কি ভাবছিস?'

—'নো ভাবাভাবি,' দীনেন স্পষ্ট গলায় উত্তর দিল, 'আমি তো একজন সৈনিক, আমি শুধু জানি: There's not to reason why, there's but to do and die.'

—'Bravo দীনেন, bravo!' ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠল।

হাসলাম আমিও। 'তাহলে আর কোন কথা নেই। ডাক্তার ও তোমার হেপাজতে রইল। ২৪ তারিখে ফিরে Complete fit দেখতে চাই।'

সুশান্ত হেসে বলল, 'ডাক্তারের তিন নম্বর পেসেন্ট।'

—'কি রকম?'

—'কেন? এক নম্বর আমি, দু নম্বর মেহেরাবান সিং, আর তিন নম্বর দীনেন,' সুশান্ত ব্যাখ্যা করল।

—'তোমার হাসপাতালের ওয়ার্ডে বেড খালি আছে তো?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—'বেড? What do you mean! দীনেন থাকবে সাধারণ বেডে? ও থাকবে special cabin-এ। ডাক্তারের cabin-এ।' সবার সম্মিলিত হাসির মাঝে শেষ করল ডাক্তার।

মনেই ছিল না দীনেন ডাক্তারের টেণ্ট পার্টনার।

মূল শিবিরের দায়িত্ব আমি বুঝিয়ে দিলাম ৪নং দলের নেতা শম্ভুদাকে। দীনেনকে ক'দিনের জন্য কোয়ার্টার-মাস্টারের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল সুশান্ত।

এইসব অনেক কারণেই দেরী হল আমাদের। দলে মোটে তিনজন। সুশান্ত, আমি আর খেম সিং। তিনজন কুলী অবশ্য আগেই বেরিয়ে পড়েছে। ওরা ১ নম্বরে ফেরী করে ফিরে আসবে।

৯টা বেজে গেল। মূল শিবিরের বন্ধুরা বিদায় জানাল আমাদের। আবার ওদের সঙ্গে দেখা হবে জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত ফয়সালার পর।

আমরা এগোতে লাগলাম।

*   *   *

২০শে সকাল।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সত্ত্বেও ১নং শিবিরে ব্যস্ততার অন্ত নেই।

প্রবীর আগের দিনই ওর একান্ত নিজস্ব ভঙ্গীতে সামনে বসা দ্বিজেনের মুখের সামনে হাত নেড়ে হুকুম জারী করেছিল, 'কাল সকালে ৮টার মধ্যে start করতে হবে, এই জানিয়ে দিলুম সবাইকে।'

দলের সবাই প্রবীরের চলন-বলন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। কেউ প্রতিবাদ করল না। জানে, এখন মুখের ওপর কিছু বললে একেবারে তুবড়ী ছোটাবে প্রবীর। সামনে কাউকেই দাঁড়াতে দেবে না।

অতএব?

অতএব, নিপাট ভালো মানুষের মত মুখ করে সবাই ঘাড় নাড়ল। তবু কিন্তু পরদিন সকালে ওদের বার হতে ৯টা বেজে গেল।

একে তো প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তার ওপর এই এক নম্বর শিবিরে রোদ আসে বেশ কিছুক্ষণ পর। তার আগে বুটে পা গলায় কার সাধ্য। তার ওপর এতগুলো লোকের সারাদিনের খাবার তৈরী করা।

অবশ্য এ কাজটা প্রবীর যেচেই নিজের হাতে নিয়েছে। আসলে যেখানেই যাক, যে অবস্থাতেই থাক ডান হাতের ব্যাপারটা অন্য কারো হাতে দিতে প্রবীর ঠিক ভরসা পায় না। শেরপা কিতারেকে সঙ্গে নিয়ে সেই ভোর থেকে লড়ে যাচ্ছে প্রবীর।

স্বভাবতই দেরী হল।

অবশ্য প্রবীর জানতো খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে কোন লাভ নেই। ওর দল ইতিমধ্যেই ২ নম্বরে ফেরী করে এসেছে। ফলে রাস্তার পরিমাণ ও রাস্তার অবস্থা সবই ওদের জানা। ও জানে পরিচিত পথ ধরে সহজেই ওরা পৌঁছে যাবে ২ নম্বরে।

৯টা বাজল।

প্রবীরের নেতৃত্বে ২নং দল ১ নম্বর থেকে ২ নম্বর শিবিরের পথে যাত্রা করল।

*　　　*　　　*

২ নম্বর শিবির।

২০শে সেপ্টেম্বর। সকাল।

তাঁবুর ভেতরে তখনও অন্ধকার। নিজের অজান্তেই হাতের ঘড়িটা দেখল সদানন্দ। অন্ধকারের মধ্যে রেডিয়াম-ডায়াল জানায় সকাল হয়ে গেছে। সূর্য উঠে পড়েছে। সদা ভাবে, এবার আমাদেরও ওঠা উচিত।

উঠে পড়ল ওরা। ওরা মানে ১নং দল। ১নং দল মানে সদা, কিণ্ডো, জিতু, অনিন্দ্য, নিমা দোরজী আর শের সিং।

—'কি শের সিং, একটু চা হবে না?'

—'ম্যায় বানাউঙ্গা সাহাব,' নিজে থেকেই এগিয়ে এল সদা হাস্যময় পাহাড়ী সন্তান নিমা দোরজী।

ওপাশের তাঁবু থেকে চেঁচাল অনিন্দ্য, 'কিরে সদা, বাইরে বার হবি

না ? নাকি স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে থেকেই 3rd Camp প্রতিষ্ঠা করে ফেলবি।'

—'শুধু শুধু না চেঁচিয়ে কালকের তৈরী করা পরোটা ক'টা গরম করে ফেল না।' সদার তাঁবু থেকে জবাব দিল কিগুো।

অনিন্দ্য, জিতু ততক্ষণে তাঁবুর বাইরে। সকাল হয়েছে বটে, কিন্তু রোদের আশা দূর অস্ত্। ঐ সবে ত্রিশূলের কাঁধ আর সামনের অনামী শৃঙ্গের মাথায় মুকুটের মত অল্প একটু সোনালী রোদ ঝকঝক করছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। হাত পা জমে গেছে যেন। গা গরম করার উদ্দেশ্যেই বোধহয় ওরা সদা কিগুোর তাঁবুর কাছে এসে চেঁচাল, 'কি হল ? এখনও ভেতরে কেন ? বাইরে বেরিয়ে এস। দেখে যাও বাইরে একদম ঠাণ্ডা নেই।'

ভেতর থেকে কিগুোর গলা শোনা গেল, 'আরে বেরিয়ে তো আসবই। রেডি তো হয়েই গেছি। ঝামেলা হচ্ছে জুতো নিয়ে। ক্লাইম্বিং বুট বিদ্রোহ করেছে। বলছে আর পায়ে উঠব না।'

সত্যিই, ঐ ঠাণ্ডায় বুট পায়ে গলানো রীতিমত এক যুদ্ধ।

ঐ ছোট্ট দুজনের তাঁবুর মধ্যেই সবকিছু। অবশ্য জামাকাপড় তো পরাই থাকে, মায় উইণ্ডপ্রুফ জ্যাকেট অবধি। শুধু স্লিপিং ব্যাগ থেকে পা দুখানি বার করে তিন থেকে চার প্রস্থ বিভিন্ন আকার ও প্রকারের মোজা পরা আর ঠাণ্ডায় শক্ত কাঠ হয়ে যাওয়া জুতো ম্যানেজ করা।

অবশেষে হাতে দস্তানা, মাথায় মাঙ্কিক্যাপ ও চোখে রঙিন চশমা এঁটে হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর বাইরে বার হওয়া। এ ছাড়া উপায়ও নেই। তাঁবুর সর্বোচ্চ উচ্চতা চার ফুট।

—'হেল্প, হেল্প !' তাঁবুর ২ ফুট ব্যাসের গোলাকার দরজা দিয়ে হাত বাড়িয়ে চেঁচাল সদা আর কিগুো।

সাহায্যের হাত বাড়াল অনিন্দ্য আর জিতু। 'মার হো জোয়ান—হেইয়ো—'একটানে বেরিয়ে এল সদা। 'আউর থোড়া, হেইয়ো—' পরের টানে কিগুো। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে শব্দ করে হাসল ওরা। পরস্পরের পিঠে চাপড় মেরে জানাল অভিনন্দন।

পাঠক হয়তো ভাবছেন এ বড় ছেলেমানুষি হচ্ছে। এই যে কথায় কথায় উচ্ছ্বাস, চেঁচামেচি, অর্থহীন হাসি—এর না আছে দরকার না আছে যুক্তি। কোন মানে হয় না।

সহৃদয় পাঠক, একটু ভাবুন জায়গাটা কোথায়। একটু বুঝতে চেষ্টা করুন পরিবেশটা। আমাদের রোজকার পরিচিত উষ্ণ পবন প্রবাহিত বাধাহীন দিগন্তে প্রসারিত সুন্দর শ্যামল ধরণী তো এ নয়!

পাহাড়ে, এই উচ্চ পর্বতগাত্রে, যেখানে বায়ুস্তর অতি ক্ষীণ, বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ সমতল ভূমির তুলনায় অর্ধেক, তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নীচে, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে দশগুণ শক্তি ব্যয় করতে হয়, যেখানে প্রতিবার নিঃশ্বাস নিতে হয় বাঁচার অদম্য প্রেরণা থেকে, যেখানে নয়নসুখ সবুজের চিহ্নমাত্র নেই, যেখানে রুক্ষ কর্কশ পাথর আর হিমশীতল তুষার সৃষ্টি করে এক দিগভ্রান্তকারী সাদা-কালোর গোলক-ধাধা—যার প্রতিটি গহ্বর, প্রতিটি দেওয়াল, প্রতিটি উঁচুনীচু ভাঁজ প্রতি-মুহূর্তে মৃত্যুর ফাঁদ তৈরী করে রেখেছে, যেখানে উচ্চতাজনিত বিচিত্র কতকগুলি প্রতিক্রিয়া শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্যকে প্রবলভাবে নাড়া দেয় সেখানে, সেই অস্বাভাবিক অমানবিক অবস্থাতে স্বাভাবিক সুস্থতা ও মানসিকতা রাখতে যে কিছুটা আরোপিত উচ্ছ্বাস, খুশী, প্রাণময়তা রাখতেই হয়। সেই উলঙ্গ প্রকৃতির মাঝে রোজকার চেনা দুনিয়াটা যে একান্ত ভাবেই অনুপস্থিত।

আঠারো

—'বাপরে! এ তো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার!' অজান্তেই কথা ক'টা কিগোর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

—'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?' শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে জবাব দিল সদা।

কিগো বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, সদা সুযোগ দিল না ওকে।

একটানে রুকস্যাকটা কাঁধে গলিয়ে হুকুম দিল, 'নিমা, start কর।'

কেউ কোন কথা বলল না। পরপর ছ'জন রওনা হল। প্রথমে নিমা, সবার শেষে শের সিং। ১নং দল ২ নম্বর শিবির থেকে ৩ নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। ২০শে সকাল ৭টা বেজে ৫০ মিনিট।

২ নম্বর শিবিরের এলাকাটাই অত্যন্ত ভাঙাচোরা। বলা যায় ত্রিশূলের 'আপার আইস ফল'-এর একটা অংশ এটা।

অল্প একটু যেতে না যেতেই হাঁপিয়ে পড়ল ওরা। অস্বাভাবিক মালপত্র চাপানো হয়েছে কাঁধে। রুকস্যাকগুলোর ওজন যা দাঁড়িয়েছে তা আর কহতব্য নয়।

স্বাভাবিক অবস্থায়, অর্থাৎ আবহাওয়া ভাল থাকলে এক একটি শিবির প্রতিষ্ঠা করতে অন্তত ২ দিন লাগে। একটা দিন লাগে শিবির স্থাপনের সাধারণ মালপত্রগুলি—যেমন তাঁবু খাবারদাবার, রান্নার বাসন-পত্র, স্টোভ, তেল আর পর্বতারোহণের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম—মানে দড়ি, বরফ সরাবার বেলচা, পিটন, ক্যারাবিনার ইত্যাদি—সব-কিছু বয়ে নিয়ে গিয়ে পরিকল্পিত শিবিরের জায়গায় রেখে আসতে। এই সমস্ত জিনিসপত্র যদি একদিনে ঠিক ঠিক পৌঁছে দেওয়া যায় তবেই দ্বিতীয় দিন আরোহীরা, যাঁরা ঐ শিবিরে রাত কাটাবেন, নিজেদের প্রয়োজনীয় সবকিছু নিয়ে সেখানে পৌঁছতে পারেন। এ ভাবে ত্ব'দিনেই যদি একটি শিবির স্থাপিত হয়ে যায় তবেই তাকে পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে 'সবচেয়ে তাড়াতাড়ি হল' বলা হয়।

কিন্তু আমাদের সবটাই যেন জোর করে। আমাদের টাকা নেই—অতএব বেশী রেশন নেই, অতএব কুলীদের আরও একদিনের মজুরী দেবার সামর্থ্য নেই, অতএব সময় নেই, অতএব—

না, অতএব পারলাম না—এই সাধারণ কথাটা বলা চলবে না; অতএব অভিযান সংগঠিত করা গেল না—এই স্বাভাবিক সিদ্ধান্তটি মেনে নেওয়া চলবে না, অতএব—

হ্যাঁ, সব জেনে বুঝেও আমরা বলব, পাহাড়ে আমাদের আসতেই

হবে—অতএব আমরা চলব, অজানা প্রকৃতির সব বাধাকে জয় করব—অতএব আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব, পয়সা আমাদের কম—অতএব আমরা ডবল মাল কাঁধে তুলব। অভিযান সাফল্যমণ্ডিত করবই, অতএব—

অতএব ওরা চলল। পিঠের রুকস্যাকের গন্ধমাদন চাপিয়ে ওরা চলল। হাতে মাত্র একদিন সময়। আগামীকাল ২১শে। শীর্ষারোহণের নির্ধারিত দিন। আরও বড় কথা—সবকিছু সেরে ২৪শের মধ্যে সাবাইকে মূল শিবিরে পৌঁছতেই হবে। তাই, কোন উপায় নেই, আজকেই ৩ নম্বর তথা সর্বোচ্চ শিবির স্থাপন করতে হবে এবং সেখানেই থাকতে হবে। কোন সাহায্যকারী দলও নেই। তাই সব মালই কাঁধে চাপাতে হল। নিজেদের জামাকাপড়, শীতবস্ত্র ইত্যাদি—নিতেই হবে, তাঁবু—তাও নিতে হবে, খাবারদাবার, স্টোভ বাসন সবই নিতে হবে, তাছাড়া রয়েছে দড়ি-দড়া সতেরোটা জিনিস। রুকস্যাক উপচে উঠল। ওপরে রেখে কাঁধের সঙ্গে বেঁধে নেওয়া গেল কিছু। প্রতিটি পদক্ষেপে কাঁধে পড়তে লাগল প্রচণ্ড চাপ। প্রতিটি মুহূর্তে মনে হতে লাগল—অসম্ভব, আর এক পা এগোতে পারা যাচ্ছে না।

আর রাস্তার কথা!

না, গোড়াতেই ভুল হল। কথাটা রাস্তা নয়। রাস্তা শব্দটা এখানে হাস্যকর। বড় জোর বলতে পারি পথ। দুরন্ত পর্বতগাত্রে একটি বিশেষ অংশ থেকে আর একটি বিশেষ অংশে পৌঁছবার পথ।

তা, সেই পথ করে নিতেই প্রাণান্ত।

২ নম্বর শিবিরের পর থেকেই ক্রমাগত বরফের ফাটল পার হতে হচ্ছে। কোথাও খুব সরু ফাটল, একটু বড় পদক্ষেপে পার হওয়া যাচ্ছে, কোথাও খুব বড় ফাটল, একদিক দিয়ে নেমে আর একদিক দিয়ে উঠে বা পুরো ফাটলটাকে এড়িয়ে ঘুরে যেতে হচ্ছে। কোথাও বা ফাটলের ওপরে তৈরী হয়ে রয়েছে বরফেরই ছোট্ট সেতু (snow bridge)। সাবধানে, সেতুগুলোর সহন-ক্ষমতাকে সঠিকভাবে বিচার করে ওপর

দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে ওরা।

তবু তো এ অঞ্চলটা 'আপার আইস ফলে'র মূল অংশ নয়। বলা যায় বাঁ ধার ঘেঁষে শেষটুকু। ধ্বংসস্তূপের মত মূল আইস ফলটা ওদের ডান দিকে, একটু পেছনে।

ওরা পশ্চিমদিকে এগোচ্ছিল। একেবারে সামনে অনামী শৃঙ্গ (২১,২২০´)। ভারী সুন্দর দেখতে। ঠিক যেন সাদা রঙের এক পিরামিড।

এখনও পর্যন্ত ওরা খুব একটা উঁচুতে ওঠেনি। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক চলা হল, কিন্তু ওঠা হয়েছে খুব বেশী হলে তিনশো ফুট। কিন্তু এতেই ওরা অত্যন্ত হাঁপিয়ে যাচ্ছে। কাঁধে প্রচণ্ড ওজনের রুকস্যাক ক্রমাগত ওদের পিছনে টানতে লাগল। পা যেন আর ওঠে না। তার ওপর বরফের এই ভাঙাচোরা আতঙ্কময় চেহারা।

নিমা রয়েছে সামনে। বারেবারেই সে দিক পরিবর্তন করছে। প্রত্যেকবার পা ফেলবার আগে ভাবতে হচ্ছে, বুঝতে হচ্ছে যেখানটায় পা রাখছি, বরফ টিকবে তো? নিচে চোরা ফাটল নেই তো? ফুট দশেক করে এগোয় আর পিছন ফিরে নির্দেশ দিতে থাকে, 'সাব, সামালকে, নেহি, নেহি, উধার প্যার নেহি রাখনা, জেরা বাঁয়ে চলো।'

বার বার বলতে লাগল নিমা, 'সাহাব, রশ্মি বাঁধ লো।' সদস্যরা অত গুরুত্ব দিল না ওর কথায়। বিশেষ করে বরফের সেতুগুলো পার হবার সময় নিমা ওদের রাজী করাতে চাইল, 'সাহাব, রস্‌সি বাঁধো। অ্যায়সা যানা ঠিক নেহি হ্যায়।'

ওরা একটু অবাক হল। কই, এমন কিছু বিপজ্জনক মনে হচ্ছে না তো! নিমা এত ভয় পাচ্ছে কেন? 'আরে ছোড়ো নিমা, সবকুছ তো দিখাই যা রহা হ্যায়। ঔর বরফকি চেহারা সেভি পতা চলতা হ্যায় কি ইয়ে মজবুত হ্যায়। ইহা রস্‌সি বাঁধনেকা কোই জরুরত নেহি।'

নিমা কিন্তু, কেন জানি না, শঙ্কিত। বার বার বোঝাল, প্রায় জিদ ধরল, 'নেহি সাহাব, মেরা বাত মানো, অ্যায়সা বরফকো বিশোয়াস মত

করো। কৌন জানে কিস্ ওক্ত কিধার সে খতরা আ যায়ে। মেরা বাত মানো সাহাব, রস্সি বাঁধ লো।'

এ তো আচ্ছা ঝামেলা হল! ওরা যে জায়গা, যে বরফের সেতু অনায়াসে পার হচ্ছে, ভয় পাওয়ার কোন যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছে না, এত দিনের অভিজ্ঞ শেরপা নিমা দোরজী সেখানে এত নার্ভাস হচ্ছে কেন?

তাছাড়া, এখন নাইলন দড়ি বার করে পরস্পরকে সংযুক্ত করতে হলে অনেক সময় লেগে যাবে। আর আরোহীরা এক সূত্রে বাঁধা থাকলে অকস্মাৎ পতনজনিত দুর্ঘটনার সম্ভাবনাকে অনেক পরিমাণে এড়ানো যায় বটে, কিন্তু চলতে বেশ অসুবিধে হয়, গতিও যায় কমে।

সদা একটু দাঁড়াল। ভাবল একবার। বরফের ফাটল, সেতু সবই আছে বটে, তবে খুব risky চেহারার কিছু নেই। মনে হচ্ছে, ভাল ভাবেই পার হয়ে যাওয়া যাবে। এদিকে ওদের দেরী হয়েছে যথেষ্ট। অত্যধিক বোঝার ভারে এমনিতেই ওদের চলার গতি আজ অনেক শ্লথ। তৎসত্ত্বেও বারে বারেই দাঁড়াতে হচ্ছে, বিশ্রাম নিতে হচ্ছে। দশটা বেজে গেল, পথ এখনও অনেক বাকী। আকাশ এখনও মোটামুটি পরিষ্কার, কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, ১২টার মধ্যেই চারদিক মেঘে ঢেকে যাবে, আবহাওয়া দ্রুত খারাপ হয়ে যাবে। একান্তই বিপদে পড়ে যেতে হবে তখন।

সবার দিকে তাকিয়ে সদা বলল, 'যা দেখছি তাতে আমার বিশ্বাস এ অঞ্চলটা আমরা এমনিই পার হয়ে যেতে পারব। যাই হোক, অনেক দেরী হয়ে গেছে। আর ইতস্তত নয়, নিমা, আগে বাড়ো।'

নেতার নির্দেশ। মুখের কোন পরিবর্তন হল না নিমার। চুপচাপ এগোতে শুরু করল সে। কিন্তু বোঝা গেল নেতার নির্দেশ হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারল না নিমা।

ধীরে ধীরে সেই প্রায়-সমতল ভূমির শেষে পৌছুল ওরা। সামনে চড়াই। চড়াই মানে একেবারে সদা দেওয়াল। এটা ধরে উঠতে হবে। উঠতে হবে অন্তত হাজার ফুট, উঠতে হবে ত্রিশূলের কাঁধ আর অনামী

শৃঙ্গের সংযোকারী গিরিশিরাটির কাছাকাছি।

একটু দাঁড়াল ওরা। তাকাল চারপাশে। ঠাণ্ডা একটু কম। রোদ এসে পড়েছে গায়ে। সামনের দিকে সাদা বরফের দেওয়াল পেরিয়ে অনামী শৃঙ্গ ও ত্রিশূলের কাঁধ আর নজরে আসছে না। বাঁ দিকে মৃগথুনীর শীর্ষদেশ মনে হচ্ছে প্রায় নজরের সমতলে। ডানদিকে মানে উত্তরদিকে বেথারতলী অংশত দৃশ্যমান, ওপরদিকটা মেঘে ঢাকা। পিছন ফিরে তাকাতেই নজর আটকায় দেবীস্থান শৃঙ্গদ্বয়ের বিশাল দেওয়াল। আর নীচের দিকে চোখ নামালে দেখা যাচ্ছে ২ নম্বর শিবির অঞ্চল। সেই ভাঙাচোরা বরফের ধ্বংসস্তূপ—এখান থেকে মনে হচ্ছে ঠিক যেন একটা এবড়োখেবড়ো সাদা রঙের মাঠ।

নিরাপদেই ওরা পেরিয়ে এসেছে। কারও কোন বিপদ ঘটেনি। ঘটবার মত কোন অবস্থাও ওদের চোখে পড়েনি। এই এখানে এসে সদস্যরা সবাই পরস্পর চোখাচোখি করে নিমার দিকে দেখল, একটু হাসলও বুঝি। কিন্তু, কেন জানি না, দেখা গেল নিমা আগের মতই সিরিয়াস, কিন্তু শান্ত।

আবার ওঠা শুরু। এবারের পথে বিপদ প্রায় নেই বললেই হয়। কিন্তু পরিশ্রম হচ্ছে অত্যধিক। নরম বরফের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণেই পা হাঁটু পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছে, আর তখন, ঐ বিশাল ক্লাইম্বিং বুট পরা পা টেনে তোলাই দুষ্কর। গত রাতের নতুন-পড়া তুষারের জন্য অসুবিধে হচ্ছে আরও বেশী।

এই নরম বরফে প্রথম যিনি চলেন তাঁর পরিশ্রম আবার সবচেয়ে বেশী। কারণ তিনি যেখানেই পা দিচ্ছেন, ঢুকে যাচ্ছে পুরো। ফলে প্রথম জন যাওয়ার পর সেখানে প্রায় একটা চ্যানেলের মত গর্ত হয়ে যাচ্ছে এবং পরবর্তী লোকেদের পরিশ্রম তুলনামূলক ভাবে কম হচ্ছে।

ওরা ঘুরে ঘুরে একজন একজন করে আগে গিয়ে পথ করার দায়িত্ব নিল।

কিন্তু ক্রমশ বেলা বাড়ছে, উচ্চতা বাড়ছে, পরিশ্রম বাড়ছে, ক্ষিদে

বাড়ছে আর সহ্যশক্তি কমে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে লড়াই করার ক্ষমতা।

দেখতে দেখতে ১২টা বেজে গেল। একেবারে যেন নিয়ম মেনে, আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেল, মেঘেরা নেমে এল চারপাশে, সূর্যদেব দুপুর না হতে হতেই 'ফ্রেঞ্চ লীভ' পেয়ে গেলেন।

কিন্তু কোথায় সেই গিরিশিরা? ৩ নম্বর শিবির তো ওর ঠিক নীচেই করার কথা।

আর তো পা চলে না! অমানুষিক পরিশ্রমে, ক্লান্তিতে, শ্বাসকষ্টে আর এক পা চলাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

তবু ওরা এগোতে চেষ্টা করল। এক পা এক পা করে, গুণে গুণে। একে খাড়াই পথ, তায় পিঠে পর্বত-প্রমাণ বোঝা, মেরুদণ্ড এমনিতেই বেঁকে গেছে, নজর কেন্দ্রীভূত হয়েছে পায়ের দিকে।

কিছুক্ষণ আগেও ওরা এক-একবারে পঁচিশ-তিরিশ পা এগিয়ে একটু করে থামছিল, কিন্তু এখন দম কমতে কমতে প্রতিবারের চলা আট থেকে দশ পা-এ এসে ঠেকেছে।

চারদিকে মেঘ, নজর চলে না ৫০ গজ দূরের কিছু, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে তবু কিন্তু ওরা ঘামছে। সহ্যশক্তির প্রায় শেষ বিন্দুতে এসে গেছে ওরা। কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছে না, কথা বলার তো প্রশ্নই ওঠে না, দৈহিক শক্তির লেশমাত্র নেই, শুধুমাত্র অদম্য ইচ্ছাশক্তির জোরেই ওরা উঠতে লাগল। এক থেকে দশ গোনা—একটু দাঁড়ানো—আবার এক থেকে দশ—একটু দাঁড়ানো—তৃতীয় বারে দশ পর্যন্তও পৌঁছনো গেল না, আট, ঠিক আছে আটেই দাঁড়ানো যাক একটু। কিন্তু এভাবে আর কতক্ষণ চলবে, আর যে সত্যিই পারা যায় না!

—'That's all. We have done our best. Let us call it a day.'

সদার গলার আওয়াজে থমকে দাঁড়াল সবাই। শরীর-মনের যা অবস্থা, কথাটা বুঝতে বোধহয় একটু সময় লেগে গেল, তারপর এক ঝটকায় কাঁধ থেকে রুকস্যাক খুলে ফেলল সবাই। ক্লান্ত মুখের একগাল

হাসিতে অভিনন্দিত করল নেতার সিদ্ধান্তকে।

কিন্তু এ কোথায় দাঁড়াল ওরা? চারদিকে তাকিয়ে সেই গিরিশিরার কোন আভাস পাওয়া গেল না।

সদা জানাল, আরও অন্তত তিনশো ফুট ওঠার কথা ছিল। কিন্তু আজ আর সম্ভব নয়। এই ২০,২০০ ফুটেই ৩ নম্বর শিবির করা হোক।

তা না হয় হল, কিন্তু এখানে তাঁবুটা পাতা হবে কোথায়? এক ফুটও সমতল জায়গা নেই। একটি বরফে ঢাকা পর্বতের ঢালু গা বিশেষ। বৃথাই এদিক ওদিক তাকাতে লাগল সবাই।

—'আরে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? পা যে জমে গেল, বেলচাটা বার কর্ না!' কিঙো চেঁচাল, 'Ice-axe নিকালো ভাইলোগ, বরফ কাটো।'

হাওয়ার গতি বুঝে তাঁবু কোন্‌দিকে মুখ করে পাতা হবে ঠিক করা হল, হাতে হাতে তুষার-গাঁইতি উঠল আর পড়ল, বেলচা দিয়ে বরফ সরিয়ে জায়গা সমান করা হল, দেখতে দেখতে ছুটি তাঁবু লাগানো হল।

এই দুই তাঁবুর মধ্যে ছ'জনের থাকা, সব জিনিস রাখা, স্টোভ ধরানো, খাওয়া-দাওয়া সব-কিছু।

আবার নিমা খেল্ দেখাল। সদস্যরা সবে ক্লাইম্বিং বুট-মুক্ত হয়ে, এয়ার ম্যাট্রেস ফুলিয়ে, স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে, প্রায় জমে যাওয়া হাত পা ক্রমশ উষ্ণ করে তুলেছে, দেবদূতের মত কেটলী হাতে মৃত-সঞ্জীবনী সুধা নিয়ে তাঁবুতে ঢুকল নিমা, 'সাহাব, চা রেডি।'

সবাই হৈ হৈ করে উঠল।

জিতু হিন্দি গানে স্বাগত জানালো ওকে:

'হর বার হাম ছুঁয়া মাঙ্গে
বার বার নিমা চা লায়ে
ইয়ে মেরা আরজু—'

একটা হাসির ছররা উঠল ২০,২০০ ফুট উঁচুতে।

সবার মগে চা দিল নিমা। ছু হাতের ঠাণ্ডা তালুতে গরম চায়ের মগ

ধরে সবটুকু উষ্ণতা গ্রহণ করতে করতে সবাই কাছাকাছি ঘন হয়ে বসল। সান্নিধ্যের উত্তাপে পরিবেশের সব কষ্টকে দূরে হটিয়ে দিল ওরা।

নিমা সবার মাঝখানে পলিথিনে মোড়া এক প্যাকেট বিস্কুট রাখল। হাতে হাতে বিস্কুট উঠতে লাগল।

চা দিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে যাচ্ছিল নিমা, সদা ডাকল, 'নিমা, যেও না, এখানে বসে পড়। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

নিমা নিজের মগে চা ঢালল, আর কারো চা লাগবে কিনা জানতে চাইল, তারপর তাঁবুর দরজার কাছে বসে লিডারের দিকে তাকাল।

আগামীকাল চূড়ান্ত লড়াইয়ের দিন, সদা নিশ্চয়ই সে সম্বন্ধে আলোচনা করবে। আগামী কালের লড়াইয়ের ব্যবহারিক ও মানসিক প্রস্তুতির এই তো শেষ সুযোগ। সবাই নড়েচড়ে বসল।

কিন্তু সদা সম্পূর্ণ নতুন এক প্রসঙ্গ তুলল, 'আচ্ছা নিমা, আজ ঐ crevasse areaটা পার হতে তুমি এত ইতস্তত করছিলে কেন? জায়গাটা তো এমন কিছু নয়। মনে হচ্ছিল তুমি অত্যন্ত নার্ভাস। কি ব্যাপার?'

নিমা কিছু বলার আগেই সবাই হৈ হৈ করে উঠল।

কিণ্ডো বলল, 'আরে কোন্ মানুষ কখন down হয়ে যায় কিছু বলা যায়? নিমা হয়ত ঘাবড়ে গিয়েছিল। তাতে হয়েছেটা কি?'

—'যাই বল, নিমা কিন্তু আজ আমাকে খুব নার্ভাস করে দিয়েছিল। কিছুর মধ্যে কিছু নেই, অতবার দড়ি লাগাও দড়ি লাগাও করলে কারও মাথার ঠিক থাকে? তারপর থেকে আমার তো খালি মনে হচ্ছিল এই বুঝি crevasse-এ পড়লাম!' হালকা গলায় বলল জিতু।

নিমা সবার দিকে একবার তাকাল, কোন কথা বলল না।

—'না না, এটা অত হাল্কা ভাবে নিও না তোমরা,' অনিন্দ্যর গলা যথেষ্ট সিরিয়াস, 'মনে হয় crevasse-এ পড়ে এমন করুণ মৃত্যু নিমা দেখেছে যে crevasse দেখলেই ও শঙ্কিত হয়ে ওঠে। হয়ত এরকম কোন দুর্ঘটনার ও এক অসহায় সাক্ষী। সেই কারণেই হয়তো এরকম

nervous breakdown।' কথা শেষ করে সহানুভূতির চোখে নিমার তাকাল অনিন্দ্য।

—'নেহি সাহাব, মৌত নেহি, ম্যায়নে নয়ী জিন্দগী দেখা হ্যায়।' নিমার গলার গমগমে আওয়াজে চমকে উঠল সবাই। তাকাল ওর মুখের দিকে। দেখল, কি এক উত্তেজনায় কাঁপছে নিমা। ফর্সা মুখের রঙ হয়ে গেছে লাল, চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক প্রখর। এত উত্তেজিত হতে নিমাকে কেউ কখনও দেখেনি।

একই আবেগের সঙ্গে বলে চলল নিমা, 'সাহাব, পাহাড় পর হামসব কিঁউ আতে? আপলোক কিঁউ আতা? মরনে কে লিয়ে? নেহি। মরবার জন্য কেউ এখানে আসে না, আসে জীবনের জন্য, আরও বড় করে জীবনকে পেতে এখানে আসে মানুষ। তবু মানুষ মরে। জীবনের অন্বেষণে এসে পর্বতারোহীকে মরতেই হয়। সাহাব, ইয়ে দেখো মেরা হাত। আমার এই হাত দেখছ সাহেব! আমার শেরপা জীবন কি করে সার্থক হয়েছে জান? এই দুই হাত, এই দুই হাত দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে আমি এক পর্বতারোহীকে ফিরিয়ে এনেছি। সাহাব, ম্যায় শেরপা হুঁ, পাহাড় পর চলতা হুঁ; সাহাব, মুঝে গলত মত সমঝো, ম্যায় মৌত সে ডরতা নেহি, পর, মুঝে জিন্দেগীসে প্যার হ্যায়। আমি পর্বতারোহী, আমি শেরপা, আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না, কিন্তু আমি জীবনকে ভালবাসি।'

নিমা থামল। বোধহয় একটু লজ্জিত বোধ করল। ও কি অনেক বেশী বলে ফেলেছে? নিজেকে সামলাতে গিয়ে চোখ নামাল নিমা।

ওরা হতবাক্। নিমার এ মূর্তি তো কোনদিন দেখেনি! একটু সময় চুপ করে রইল সবাই। আস্তে আস্তে সদা মুখ খুলল, 'নিমা, বাতাও সবকুছ্। বল আমাদের সবকিছু। তোমার বলা দরকার, আমাদের শোনা দরকার। বল নিমা, বল।'

ততক্ষণে সামলে নিয়েছে নিমা। ওর সেই স্বভাবসিদ্ধ লাজুক-লাজুক গলায় বলল, 'নেহি সাহাব, ম্যায় নেহি, রস্‌সি—জিসকো আপলোগ life-

line বোলতে হ্যায়, সেই দড়ি বাঁচিয়ে ছিল এক বিখ্যাত পর্বতারোহীকে। অ্যায়সা কোই বাত নেহি, crevasse কা এরিয়া থা। হাম দোনো এক রস্‌সি সে বন্ধে হয়ে থে। আমরা দু'জন একই দড়িতে বাঁধা ছিলাম। হঠাৎই সে পড়ে যায় crevasse-এ। আমার হাতে দড়ি ছিল। বেঁচে গেলেন।'

নিমা থামল। কিন্তু ওরা চুপ করতে পারল না।

—'আরে ভাই, details-এ বল। যাচ্ছিলাম, পড়ে গেল, দড়ি ধরে টানলাম—বেঁচে গেল।' জিতু দু হাতের তালু উলটিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করল, 'আচ্ছা, এরকম বললে কিছু বোঝা যায়?'

—'Story telling—sherpa style.' জনান্তিকে বলল কিংশুক।

অনিন্দ্য বুঝল, নিমার কাছ থেকে বেশ গল্পের আকারে কিছু বার করা মুশকিল হবে। প্রশ্ন করে করে যা জানবার জানতে হবে।

সেই পথই ধরল অনিন্দ্য। প্রায় ঘন্টাখানেকের প্রশ্নোত্তরে যে কাহিনী উদ্ধার হল তা এই রকম:

বেশীদিনের কথা নয়, এই তো সেদিন, মাস চারেকও হয়নি, নিমা এসেছিল অভিযানে। দলের নাম 'দি মাউন্টেনিয়ার্স'। বম্বের এই দলে ছিল ছ'জন পর্বতারোহী, নেতৃত্বের দায়িত্বে ছিলেন অভিজ্ঞ আরোহী শ্রীহরিশ কাপাডিয়া।

এই অঞ্চলেই এলেন ওঁরা। বলা যায়, আরও ভেতরে ঢুকলেন, নন্দাদেবী অভয়ারণ্যের (sanctuary) অন্তঃপ্রাচীরের (Inner wall) মধ্যে। ওদের লক্ষ্য একটি অপরাজিত (virgin) অনামী শৃঙ্গ (২২,২৭০´) যা নন্দাদেবীর অন্তঃপ্রাচীরের একেবারে দক্ষিণতম বিন্দুতে অবস্থিত। মৃগথুনী ২২,৪৯০´ আর মাইকতোলী ২২,৩২০´ শৃঙ্গদ্বয়ের মিলন-বিন্দুতে অবস্থিত এই শৃঙ্গটি, যার নামকরণ ওঁরা করলেন, দেবতোলি।

এই ত্রিশূল অভিযানের পথেই ওরা অগ্রসর হলেন। পথে হাই অল্টিচ্যুড পোর্টার হয়ে দলে যোগ দিল কেদার সিং—যে এই ত্রিশূলেও

আছে, ভীম সিং ও জগৎ সিং আর যোগ দিল শেরপা নিমা দোরজী।

মূল শিবির স্থাপিত হ'ল ৩রা জুন। ১২ই জুনের মধ্যে অগ্রবর্তী মূল শিবির (Advance Base Camp), ১ নম্বর ২ নম্বর স্থাপিত হয়ে গেল। সবচেয়ে অসুবিধা করল ১ এবং ২ নম্বর শিবিরের মাঝে ফাটল (crevasse) ভর্তি অঞ্চলটা। প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করতে হল। তবে, কপাল ভাল, অনেক বার যাতায়াত করার পরেও কোন বিপদ ঘটল না।

১৩ই জুন, নির্মল আকাশ নিয়ে সৌভাগ্যের দূতের মত দেখা দিল। আনন্দঘন অনুভূতির সঙ্গে ওরা দেখল দেবতোলির শুভ্র শীর্ষ ওদের পায়ের তলায়। তখন বেলা নটা।

সবার মনে তৃপ্তির ছোঁয়া, সার্থক নেতা হরিশ কাপাডিয়ার মন প্রাপ্তিযোগে ভরপুর।

এবার নামার পালা। নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের পরই অভিযান সর্বাঙ্গ-সুন্দর হয়। ওরা নামতে লাগল। পায়ের নীচে বরফ অনেক নরম হয়ে গেছে। বিকেল ৪টে নাগাদ ওরা পৌঁছে গেল ২ নম্বর শিবিরে।

সাহায্যকারী দল সাদরে অভ্যর্থনা জানাল সফল আরোহীদের। উষ্ণ পানীয় দিয়ে সঞ্জীবিত করল, সামান্য আহার্যে শক্তি ফিরিয়ে দিল দ্বিগুণ। ঠিক হল ২ নম্বর শিবিরের দল আগামীকাল মাইকতালীতে অভিযান চালাবে।

বিকেল ৫টা। শ্রান্ত কিন্তু সন্তুষ্ট চিত্তে হরিশ কাপাডিয়া তার সহযোগীদের নিয়ে ১ নম্বর শিবিরের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।

সামনে অনেকবার যাতায়াতের পরিচিত পথ। ওরা নিশ্চিন্ত মনে কিন্তু সাবধানে নামতে লাগল। প্রায় শ তিনেক ফুট নেমে এক বিরাট ফাটলের মুখোমুখি হল ওরা।

ফাটলের ওপর বেশ বড় একটা বরফের সেতু রয়েছে। এটার ওপর দিয়ে অনেকবার যাতায়াত করা হয়েছে এর আগে। তবু ওরা কোন সুযোগ নিল না। বলা হয়, পর্বতারোহণে সুযোগের কোন ভূমিকা নেই।

অনেকবারের পরিচিত পথ তবু ওরা পরস্পরের মধ্যে দড়ি বাঁধল। সামনে ছিল জগৎ সিং—চারিদিক দেখে হালকা গতিতে পার হয়ে গেল সেতুটি। এবার হরিশের পালা। হরিশ দেখল সেতুটি প্রায় ১৫ ফুট চওড়া আর অন্ততঃ ১০ ফুট বরফের স্তরে গঠিত। ও খুব নিশ্চিন্ত মনেই এগোতে যাচ্ছিল কিন্তু বাধা দিল নিমা। বলল, 'সাহাব দাঁড়াও, বিলে (Belay) করি, তারপর এগোও। মুহূর্তের ভাবনায় সম্মত হয় হরিশ, দাঁড়াল একটু। দু'দিক থেকে দু'জন বিলে ধরে তৈরী হল, হরিশ সেতুর ওপর পা বাড়াল।

একটা ছোট্ট শব্দ!

পরমুহূর্তেই গোটা সেতুটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল আর তার সঙ্গে সেই অন্তহীন খাদে তলিয়ে গেল হরিশ কাপাডিয়া, সার্থক দেবতোলি অভিযানের নেতা।

অন্তত সেই মুহূর্তে হরিশের তাই মনে হল। বিদ্যুৎচমকের মত ওর সারাটা জীবন যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই খণ্ড মুহূর্ত, সারাটা জীবনের এক সার্থকতম মুহূর্ত, হরিশ দাঁড়িয়ে অপরাজিত দেবতোলীর শীর্ষে। তারপর তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা পার হয়েছে, এর মধ্যেই সব শেষ? এত সাধের জীবনের শেষ পরিণতি এই হিমশীতল গহ্বরে? এই এক মুহূর্তের মধ্যে?

না, হরিশ কাপাডিয়া মরল না।

সেই তুষার-গহ্বরের মধ্যে প্রায় ৩০ ফুট নেমে গিয়েও মুখব্যাদানকারী মৃত্যুর অমোঘ টানকে উপেক্ষা করে জীবনের প্রান্তে ঝুলে রইল হরিশ কাপাডিয়া একগাছা নাইলন দড়ির কল্যাণে।

বেশ কিছু সময় লাগল প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিতে। প্রথমেই যে চিন্তাটা হরিশের মাথায় এল তা হল যদি দড়ি বাঁধা না হত, যদি বিলে করা না হত!

—'হরিশ—হরিশ, তুমি ঠিক আছ?'

আস্তে আস্তে হরিশ চোখ মেলে তাকাল, সামনে দেওয়াল—বরফের

হাল্কা সবুজ আভা বার হচ্ছে সেই কঠিন তুষার থেকে।

—'হরিশ—শুনতে পাচ্ছো? কোন চিন্তা নেই, আমরা তোমাকে ধরে আছি।'

কার গলা? মহেশের না?

ওপরে দু'পাশ থেকে 'বিলে'তে হরিশকে ঝুলিয়ে রেখেছিল জগৎ আর নিমা। এবার নিমা আর মহেশ ওকে টেনে তোলার চেষ্টা করল। কিন্তু ফাটলের মুখে প্রচণ্ড টানে দড়ি প্রায় ৫ ফুট বরফ কেটে বসে গেছে। টেনে তোলার চেষ্টাই বৃথা। ওরা সাহায্যের জন্য ২ নম্বর শিবিরের দিকে তাকিয়ে চেঁচাতে শুরু করল। মাত্র ৩০০ ফুট দূরে, নিশ্চয় শোনা যাবে।

কিন্তু হরিশ এখন কি করে?

টানের চোটে কোমরে বাঁধা দড়ি বুকের কাছে উঠে এসেছে। নিজের ৭০ কিলো আর রুকস্যাকের ২০ কিলো মিলে যে ওজন দাঁড়িয়েছে তার বিপুল টানে নাইলন দড়ি ক্রমশঃই বুকের পাঁজরার ওপর বসে যেতে লাগল। হরিশ সেই মসৃণ বরফের দেওয়ালের দিকে চাইল, কিন্তু কোথাও একটা ধরবার বা পা রাখার খাঁজ পেল না যাতে সে নিজের ওজন কিছুটা রাখতে পারে, দড়ির টান কিছুটা কমাতে পারে।

বাঁচার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষায় হরিশ উপরে নীচে চারপাশে তাকাল। ফাটলটা বিরাট। ওপর থেকে প্রায় ৩০ ফুট নীচে সে ঝুলে আছে। আরও ৪০ ফুট নীচে দেখা যাচ্ছে ফাটলের তলা—শক্ত নিরেট বরফের চাঁই, যার ওপর ভাঙা তুষার-সেতুর কিছু আলগা বরফ পড়ে আছে।

কিন্তু দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে, আর এভাবে থাকা সম্ভব নয়।

হরিশ সিদ্ধান্ত নিল।

এভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় দমবন্ধ হয়ে মরার চেয়ে ৪০ ফুট লাফিয়ে পড়া অনেক ভাল। হাতের তুষার-গাঁইতিটা দূরে ছুঁড়ে ফেলল হরিশ যাতে ওটার ওপরেই না লাফাতে হয়। অনেক কষ্টে—বাঁ কাধ থেকে রুকস্যাকের বাঁধনটা খুলল, কিন্তু আর পারল না, ডান কাঁধে ওটা বিশ্রী-

ভাবে ঝুলে রইল। শার্টের পকেটে একটা ছোট ছুরি ছিল, বার করে আনল হরিশ। তারপর একটা মুহূর্ত। ওপরের বন্ধুদের চিৎকার করে ওর সিদ্ধান্তের কথা জানাল আর কেটে দিল টানপড়া দড়ি।

দড়াম করে ৪০ ফুট নীচে পড়ল হরিশ। যতখানি পারল চেষ্টা করল নিরাপদ ভাবে পড়ার, কিন্তু সমগ্র ওজনটা পড়ল বাঁদিকে, সমস্ত ঝাঁকুনিটা পড়ল কোমরের ওপর।

এক তীব্র ব্যথার অনুভূতি ওর সারা দেহে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ বইয়ে দিল। কিন্তু অচেতন হল না হরিশ। সেই তীব্র অনুভূতি ওর ইন্দ্রিয়-গুলিকে আরও তীক্ষ্ণ করে তুলল। ও বুঝল কোমর আর বাঁ পাটা ভেঙেছে। তবুও আগের অবস্থা থেকে, এ অনেক ভাল।

ইতিমধ্যে ২ নম্বর শিবির থেকে সবাই চলে এসেছে। বিকেল প্রায় ছ'টা। কিন্তু সূর্যের কিরণ তখনও অম্লান। যন্ত্রণাকাতর হরিশ প্রতিমুহূর্তে সাহায্যের আশা করতে থাকল।

হ্যাঁ, আর দেরী হল না। সাহায্যকারী দল দড়ির সাহায্য নিয়ে নেমে এল সেই শীতল গহ্বরে। প্রথমেই হরিশের মুখে গুঁজে দিল কিছু চকোলেট আর গায়ে জড়িয়ে দিল একটা কেদার জ্যাকেট। আঃ, অনেক উষ্ণ আর সুস্থ বোধ করল হরিশ।

ঘণ্টাদেড়েক যুদ্ধের পর ওরা হরিশকে ওপরে তুলতে পারল। ফাটলের ওপারে যারা ছিল তারা ১ নম্বর শিবিরের দিকে যাত্রা করল। আগামীকাল ভোরেই সাহায্যকারী দলের প্রত্যাশা দিয়ে। এদিকে সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। ২ নম্বর শিবিরের তাঁবু উঠিয়ে নিয়ে এসে ফাটলের পাশেই লাগানো হল আর কোনও রকমে হরিশকে তুলে ধরে শুইয়ে দেওয়া হল তার ভেতর।

কিন্তু চিকিৎসা, নিরাপত্তা আর সুস্থতা এখনও অনেক দূর।

পরদিন সকাল থেকেই পুরো অভিযান এক mountain rescue team-এ পরিণত হল। ভোর হতে না হতেই সুভাষ দেশাই আর কেদার সিং উঠে এল ওপরে। একটা তাঁবুর কাপড় আর পোল (pole) গুলি

দিয়ে স্লেজগাড়ি তৈরী করা হল, দু পাশে লাগানো হল দড়ি। হরিশকে শুইয়ে দেওয়া হল তার ওপর। দড়ির বাঁধন দিয়ে তাকে এঁটে দেওয়া হল স্লেজের সঙ্গে। ভাঙা বাঁ পাটিকে উঁচুকরে রাখা হল। তারপর সেই বিচিত্র স্লেজ টেনে নামানো শুরু হল ১ নম্বর শিবিরের দিকে।

কিন্তু রাস্তা, যদি একে রাস্তা বলা হয়, অতি বিপজ্জনক। প্রত্যেকটি ফাটলের কাছে এসে দুজন লাফিয়ে অন্য পাড়ে যায়, স্লেজের এক মাথা একটু তুলে ধরে, অন্য মাথা তুলে ধরে আর দু'জন, এক হ্যাচ্কা টানে স্লেজটা গিয়ে পড়ে ফাটলের অন্য পাড়ে। প্রত্যেক বারের ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে হরিশ অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে, কিন্তু এ ছাড়া তো কোন উপায় নেই।

তার ওপর নরম বরফ, যার ওপর দিয়ে ঐ স্লেজ টেনে নিয়ে যাওয়া এক অসম্ভব পরিশ্রম-সাপেক্ষ ব্যাপার।

পুরো দলের অপরিমেয় পরিশ্রম আর মনোযোগের বিনিময়ে ওরা হরিশকে নিয়ে ১ নম্বরের কাছের বিরাট এক ফাটলের কাছে যখন পৌঁছল তখন ভরা দুপুর।

প্রখর রোদে বরফ গলছে। ফাটলগুলো এ অবস্থায় অত্যন্ত অনিশ্চিত। কোন রকম সুযোগ না নিয়ে ওরা ঐখানেই শিবির করার সিদ্ধান্ত নিল।

ইতিমধ্যে দলের ডাক্তার অগ্রবর্তী মূল শিবির থেকে ১ নম্বরে পৌঁছলেও হরিশের কাছে পৌঁছতে পারল না। কিন্তু ঘুমের ওষুধ ফাটলের এ পারে পৌঁছে দেওয়া হল।

পরদিন ভোরেই সেই বিপজ্জনক এলাকা পার হয়ে ১ নম্বরে পেঁছিনো হ'ল। ডাক্তারের প্রাথমিক চিকিৎসার পর হরিশ অনেক সুস্থ বোধ করল। কিন্তু সত্যিকারের চিকিৎসা করতে হলে প্রথমেই ওকে নীচে নামাতে হবে, সমতল ভূমিতে নিয়ে যেতে হবে।

আরও নীচে নেমে এল সবাই। চিরতুষারের দেশ শেষ হয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল স্লেজে চলা। হরিশের ভাঙা পা যতদূর সম্ভব

না নাড়িয়ে দড়ির স্লিং (sling) দিয়ে বেঁধে, আর একটা দড়ি দিয়ে ক্যারাবিনার (carabiner)-এর সাহায্যে কোমর কাঁধ বিশেষ উপায়ে বাঁধন দিয়ে ওকে এক কুলীর পিঠে তোলা হল। একজন তার পা ত্ব'টো ধরে রইল, আরও ত্ব'জন তার কোমরের তলায় হাত দিয়ে কিছুটা ওজন বইতে লাগল। বরফের দেশ শেষ হতে আলগা পাথরের স্তূপ পেরিয়ে চলতে লাগল দল। প্রতি ৪০ কদমের পরই দাঁড়াতে হচ্ছিল, বহনকারী কুলী বদলের জন্য, একটু দম নেবার জন্য। তবু অসীম ধৈর্যের সঙ্গে, ধীরে ধীরে ওরা পৌঁছল অগ্রবর্তী মূল শিবিরে, পৌঁছল নিরাপদে।

ইতিমধ্যে স্থভাষ একজন কুলিকে সঙ্গে নিয়ে যোশীমঠের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে। উদয়াস্ত চলে, বলা উচিত দৌড়ে, আসার সময় যে পথ পার হতে ৯ দিন লেগেছিল সে পথ ওরা ত্ব'দিনে পার হল। বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য আর কর্তব্যনিষ্ঠার এক চরম উদাহরণ।

যোশীমঠে পৌঁছে স্থানীয় মিলিটারী কর্তৃপক্ষের সাহায্যে স্থভাষ যোগাযোগ করল দিল্লীর ইণ্ডিয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ফাউণ্ডেশনের সঙ্গে যাঁরা ওর ডাকে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন এবং উদ্ধারের জন্য একটি মিলিটারী হেলিকপ্টারের বন্দোবস্ত করা হ'ল।

এদিকে অগ্রবর্তী মূল শিবিরে বিশ্রামের কোন অবকাশ ছিল না। একটি নতুন ধরনের স্ট্রেচার (stretcher) বানানো হলো যাতে হরিশ বসতে পারবে এবং চারজন বাহক তাকে টেনে নিয়ে যাবে। কিন্তু সেই উঁচুনীচু পথে প্রত্যেক ঝাঁকুনিতে হরিশের মনে হচ্ছিল প্রাণটা বুঝি এখনই বেরিয়ে যাবে। তাতেও হল না, খুব খাড়াই আর উৎরাইয়ে, অনেক জায়গাতেই, আবার কুলির পিঠে তোলা হল হরিশকে। যন্ত্রণায় কাতর চিৎকার করতে থাকল হরিশ, কিন্তু কুলিরা, সদস্য বন্ধুরা কর্ণপাত করল না, তারা এগুতেই থাকল।

অবশেষে, ১৮ই জুন, মোট ৬ দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে হরিশকে নামালো মূল শিবিরে। সতীর্থ বন্ধুদের, শেরপা আর কুলিদের স্বতঃপ্রণোদিত উদ্যমে পাহাড়ে উদ্ধারকার্যের এক ইতিহাস তৈরী হল—

নন্দাদেবী অভয়ারণ্যের এক দুর্গম অঞ্চলে ২০,০০০ ফুট থেকে আহত পর্বতারোহী হরিশ কাপাদিয়াকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে নামিয়ে আনা হল ১৪৮০০ ফুটে। যারা পরিবেশের সঙ্গে সামান্যতম পরিচিত তারা বুঝবে কত কঠিন, কত বীরত্বব্যঞ্জক, কত ঐতিহাসিক এই উদ্ধারকার্য।

২০ তারিখে আকাশপথে নেমে এল মুক্তি। হেলিকপ্টার উঠিয়ে নিয়ে গেল আহত হরিশকে। মাত্র ২০ মিনিটেই ওরা পৌছল যোশীমঠ, সেখান থেকে বেরিলী মিলিটারী হাসপাতাল। তারপর এক শুভ দিনে সুস্থ দেহ মনে হরিশ কাপাদিয়া ফিরল বম্বে, তার নিজের ঘরে।'

—'সব ভাল তার, শেষ ভাল যার,' আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে মন্তব্য করল কিশো।

কাহিনী শেষ হয়েছে। কিন্তু তার রেশ চলে যায়নি তাঁবু থেকে। সবাই ভাবছিল এক সতীর্থ পর্বতারোহীর কথা, একটি ঐক্যবদ্ধ দলের কথা, ভাবছিল শেরপা নিমা দোরজীর কথা।

অনিন্দ্য বলল, 'শেষের ভালটির জন্য শুরুর ভাল সিদ্ধান্তটির কথা ভুলে যেও না।'

সদা নিমার দিকে তাকাল, 'নিমা, ধন্যবাদ তোমার এই কাহিনীর জন্য। অনেক কিছু জানতে পারলাম আমরা। আর এখন বুঝছি, তখন কেন তুমি এত বিচলিত হয়েছিলে, কেন তুমি কোন রকম সুযোগ নিতে চাইছিলে না। আমি বলছি, এই দলের নেতা হিসেবেই স্বীকার করছি —দেরী হয়ত হত, তবু ঐ ফাটল অঞ্চলে তোমার সিদ্ধান্তই সবচেয়ে নিরাপদ আর সঠিক ছিল।'

সদার এই সময়োচিত বলিষ্ঠ স্বীকারোক্তিতে সবাই চমৎকৃত হল আর নিমা পেল লজ্জা। ও কোনরকমে, মুখ না তুলেই বলল, 'সাব, ম্যায় যাঁউ? শের সিং সায়েদ খানা বনা দিয়া।'

নিমা উঠতে যাচ্ছিল, সদা ওকে বসাল, 'বস নিমা, কথা আছে! কথা আছে সবার সঙ্গেই। কাল ২১শে। আমাদের চূড়ান্ত পরীক্ষার দিন। সমস্ত দল আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের প্রত্যেকের

সাহায্যে, বলা যায় তাদের কাঁধে ভর দিয়ে আজ আমরা সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে। কালকের দিন সার্থক করে তুলতেই হবে। আর, ভালই হল, আরোহণের এই চূড়ান্ত পর্বে নিমার সতর্কবাণী আমাদের আরও সাবধান হতে, নিরাপত্তার দিকে নজর দিতে সাহায্য করবে। সন্ধ্যে হয়ে এল, এক্ষুনি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়তে হবে। যতখানি পারা যায় শক্তি সংগ্রহ করতে হবে রাতের এই বিশ্রামে। তাই, এস, শেষ যুদ্ধের কলা-কৌশল আমরা ঠিক করে ফেলি। কাল ক'টায় বার হতে হবে, খাবার কি কি সঙ্গে যাবে, সরঞ্জাম কি কি লাগবে, সমস্ত খুঁটিনাটি এখনই ঠিক করে ফেলতে হবে। আলোচনার শুরুতে শুধু একটা কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে অনেক মানুষের অনেক পরিশ্রমের মূল্যে আমরা এখানে পৌঁছেছি, আমরা যেন তার সম্মান রাখতে পারি।' একটু দম নিল সদা, উইণ্ডপ্রুফ জ্যাকেটের পকেট থেকে কিছু কাগজপত্র বার করল, বলল, 'তাহলে ২১শে সেপ্টেম্বরের ত্রিশূল-শীর্ষ অভিযানের আলোচনা শুরু করছি—'

সবাই একটু ঘন হয়ে বসল।

* * *

প্রবীরের দল ২ নম্বরে পৌঁছে গেল বেলা ১২টার আগেই।

আবহাওয়া তখনও ভাল। পথে পোঁতা পথনির্দেশক লাল পতাকাগুলো ওদের অনেক সাহায্য করল। তাছাড়া গতকালও ওরা এ পথে মাল পৌঁছে দিতে এসেছিল।

কিন্তু দু'নম্বরে পৌঁছে, ওখানকার স্টক মেলাতে বসে প্রবীরের আক্কেল গুড়ুম। রেশন যে একেবারেই কম। দু'দিন চলবে কিনা সন্দেহ। ওরই মধ্যে যে সব জিনিস বেশী আছে সেগুলি এই উচ্চতায় কোন কাজে লাগবে না। যেমন আটা, নুন, পেঁয়াজ, ডালডা। কে খাবে এসব? বিশ হাজার ফুটে পৌঁছে কারোর মুখেই পেঁয়াজ বা ডালডা দিয়ে তৈরী কোন জিনিস রুচিকর মনে হচ্ছে না। মুখে দিলেই উল্টে বেরিয়ে আসতে চায়। আটার রুটি যদিবা চলে, করা এক হাঙ্গামা। প্রথম কথা

রুটি করতে হলে বেলুন চাকী ইত্যাদি অনেক জিনিস চাই, তার উপর স্টোভে রুটি সেঁকার বিরাট অসুবিধা। সর্বোপরি, একটু দেরী করলেই রুটি ঠাণ্ডা হয়ে একেবারে কাঠ হয়ে যাচ্ছে, চিবুনো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সত্যি কথা বলতে কি, এই উচ্চতায় বা এর চেয়ে বেশী উচ্চতায় মানুষের রুচিবোধের আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। কোন জিনিষই বেশী খাওয়া যায় না আর একমাত্র মিষ্টি জিনিস ছাড়া কোন কিছুই ভাল লাগে না। অথচ খেতে হবেই এবং অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য শরীরের যে বিপুল ক্ষতি হয় তা পূরণ করতে ভিটামিন যুক্ত জিনিস খাওয়া খুবই উচিত। যেমন চকোলেট, কাজু, কিসমিস, পাইনঅ্যাপেল স্লাইস, পাইন-অ্যাপেল জুস, বোর্নভিটা, পায়েস ইত্যাদি। চা কফি তো আছেই।

পাহাড়ে চলাফেরায় যে প্রচুর পরিশ্রম হয় তাতে দেহের জলীয় ভাগের একটা বিরাট অংশ ঘাম হয়ে বেরিয়ে যায়। ফলে শরীরে জলের অংশ কমে যায় (Dehydration)। এর ফলে শরীরে বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতা দেখা দেয়। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হল ফুসফুসের এক রোগ, চিকিৎসাশাস্ত্রে যার নাম Pulmonary odeama. এই রোগে আক্রান্ত হলে পর্বতারোহীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কম উচ্চতায় নামিয়ে আনা ছাড়া কোন চিকিৎসাই সম্ভব নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সে সময়টুকুও পাওয়া যায় না, তার আগেই রোগী আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। এ রোগকে আটকানোর একমাত্র উপায় শরীরে জলের ভাগ ঠিক রাখা। তাই পর্বতারোহীকে প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণে পানীয় গ্রহণ করতেই হয়। যেহেতু অঞ্চলটি হিমাঙ্কের নীচে জল খাওয়া প্রায় অসম্ভব, তাই চা, কফি, ওভালটিন, ফ্রুট জুস্, স্যুপ ইত্যাদি যে কোন উষ্ণ পানীয় প্রচুর পরিমাণে পান করতে হয়।

বেশী উচ্চতায় মিষ্টি জিনিস বেশী খাওয়ার আর একটি কারণ হল মিষ্টি জিনিস বা চিনি শরীরে কিছু তাৎক্ষণিক উষ্ণতার সৃষ্টি করে। ঐ শীতল প্রদেশে যার মূল্য অপরিসীম।

যাই হোক্, রেশন-এর অবস্থা দেখে প্রবীরের মাথা গরম। নিজের মনেই গজগজ করতে লাগলো। 'এখন কি হবে? এই রেশনে কি করে চলবে? যদি কম পড়ে, তোমাদের না খেয়ে থাকতে হবে, এই বলে দিলাম,' কালী আর শোভনের দিকে তাকিয়ে শেষ করল প্রবীর।

—'কেন?'

—'কেন কি? তোমরাই মাল ফেরী করেছ। আমি তো আর আসিনি। রেশন কম আসার দায়িত্ব তোমাদের, ফল ভোগ তোমাদেরই করতে হবে।'

—'চটলে কি হবে?' দ্বিজেন বোঝাতে চেষ্টা করল, 'এত বড় অভিযানে higher camp-এর জন্য মাত্র ৩ জন পোর্টার, তাও একজন প্রথম থেকেই অসুস্থ। মেম্বাররা যথাসাধ্য করেছে।'

—'তাহলে কি ৩ নম্বর দলকে এখানে আসতে বারণ করে দেব? এসে না খেয়ে থাকার চেয়ে না আসা ভাল।'

—'কি ভাবে বারণ করবে আর কখন করবে?' কালী মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল।

—'কেন?'

—'একটু দেরি হয়ে গেল না?'

—'দেরি? মানে?'

—'মানে কাল তো ৩ নম্বর দল এখানে এসেই পড়ছে। আজ আর কিভাবে খবর পাঠাবে? তার চেয়ে এক কাজ কর, কাল এখানে এলে হাতে হাতেই না হয় চিঠিটা দিয়ে দেওয়া যাবে যা'তে লেখা থাকবে তোমরা এখানে আসিও না।' কালী শেষ করতেই সবাই হাসতে লাগল।

প্রবীর কিন্তু দমল না, বলল, 'দরকার হয় তাই করব। রেশন সম্বন্ধে সাবধান করা আমার ডিউটি এবং আমি তা করব। ব্যাস্ সিধে কথা।'

—'সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।' পিছন থেকে ফুট কাটল শোভন।

সবাই আবার হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে দ্বিজেন বলল, 'আচ্ছা সে হবে'খন, এবার বাইরে এস তো। শেষ বিকেলে আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। চারদিকের পিক্‌গুলি সম্বন্ধে একটা লেকচার দাও দেখি।'

ওরা তাঁবুর বাইরে বার হ'ল।

* * *

বেলা সাড়ে ১২টা।

তিন নম্বর দলের আমরা এক নম্বর শিবিরে পৌঁছুলাম।

কেউ নেই এক নম্বরে। থাকার কথাও নয়। আজ ২০শে, প্রবীরের দলের ২ নম্বরে যাওয়ার কথা। যাক, তাহলে এখনও সব খবর শুভ।

তিনটে তাঁবু রয়েছে এক নম্বরে। আমরা এক এক করে সব ক'টার মধ্যেই উঁকি দিলাম।

একটা তাঁবুতে রুকস্যাক দু'টো রেখে আমি আর সুশান্ত বাইরে একটা পাথরের ওধারে বসলাম।

কুলিরা আমাদের আগেই পৌঁছেছে। মালপত্র রেখে একধারে বসে গেছে তিনজন। বিড়িতে সুখটান দিয়ে অবসর বিনোদনে ওরা মগ্ন।

একটা তাঁবুকে রান্নাঘর বা কিচেন টেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। খেম সিং ইতিমধ্যেই তার মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে এবং কি আশ্চর্য, মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যেই ধোঁয়া-ওঠা চায়ের মগ নিয়ে বেরিয়ে এল সে।

১টা বেজে গেল। আবহাওয়া খারাপ হয়ে এল বলে। বেশী বিশ্রাম না করে কুলীরা নিচে যাওয়ার জন্য তৈরী হল। আমি সর্বশেষ পরিস্থিতি জানিয়ে মূল শিবিরকে চিঠি লিখলাম।

কুলীরা চলে গেল। রইলাম আমরা তিনজন। আমি, সুশান্ত আর খেম সিং।

একটু পরেই দেখি খেম সিং আবার হাজির, হাতে গরম খিচুড়ির প্লেট। জানা গেল দু'নম্বর দলের তৈরী খিচুড়ি অনেকটা রয়ে গেছে প্রেসার কুকারের মধ্যে। ভালই হল, আজ আর রান্নার জন্য বেশী

ঝামেলা পোয়াতে হবে না।

খিচুড়ি শেষ হতে না হতেই মেঘ নেমে এল চারদিক থেকে। বাইরে আর বসা গেল না, আমরা তাঁবুর মধ্যে ঢুকলাম।

এয়ার ম্যাট্রেস ফুলিয়ে, স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে বেশ জুত করে বসা গেল। বসা ঠিক নয়, আধশোয়া বলা যায়। তাঁবুর উচ্চতা এত কম, সোজা হয়ে বসাই মুশকিল।

—'কি রকম বুঝছেন ? কাল ঠিকমত সব হবে তো ?' প্রায় আচমকাই জিজ্ঞেস করল সুশান্ত।

—'কি করে বলব বল ? তবে এখন অবধি যে ভাবে চলছে তাতে নিশ্চয়ই আশা করতে পারি।'

—'২৪শের মধ্যে কি বেস ক্যাম্পে পৌঁছতেই হবে ?'

—'কোন উপায় নেই। কাল ২১শে। কাল, পরশু, তরশু এবং তার পরের দিন, এই চার দিনের মধ্যে আমাদের শীর্ষ অভিযান, ওপরের সব ক্যাম্প গোটানো, সমস্ত জিনিস গুছিয়ে নেওয়া ইত্যাদি সব কাজ সেরে বেস-এ পৌঁছতেই হবে।' আমি হিসেব দিলাম সুশান্তকে, '২৫শে যদি আমরা বেস থেকে ফেরার মার্চ শুরু করি তবে হয়ত ৩০শে বা বড়জোর ২৯শে যোশীমঠে পৌঁছতে পারব। ক্যাশ টাকা যা আছে তাতে ৩০শের থেকে একদিনও বেশী হলে কুলীদের মাইনে দেওয়া যাবে না। অতএব বুঝতেই পারছ।'

—'3rd Party-র attempt হবে ২৩শে,' নিজের মনেই বলতে লাগল সুশান্ত, এবং ২৪শের মধ্যেই নেমে যেতে হবে। তার মানে, কোন কারণে প্রথম ত্থ'দলের একদল যদি একটা দিন আটকে যায় তাহলে 3rd Party-র কোন আশা নেই। হঠাৎই থেমে গেল সুশান্ত।

আমিও চুপ করে রইলাম। এ আর নতুন কথা কি! অথচ আমাদের দলে এখনও পর্যন্ত অন্তত ১০ জন আরোহী শীর্ষারোহণের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। যদি আর কিছু টাকা থাকত, ২/৩ হাজার অন্তত, তাহলেই আরো কটা দিন থাকা যেত এবং আরো ভাল ভাবে সবকিছু

হতে পারত। ভাবতেও কষ্ট হয়—এত কষ্ট করে, এত বাধা পেরিয়ে এতদূর পর্যন্ত এগনো হল, হয়ত একটা দিনের জন্য সব ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কয়েক মিনিট আমরা দু'জনেই চুপ করে রইলাম। স্তব্ধতা ভঙ্গ করল সুশান্ত, বলল, 'ভেবে কি হবে, চলুন বাইরে যাই, শেষ বিকেল, বোধহয় weather ভাল হয়েছে, চারপাশটা একটু দেখি।'

আমরা বাইরে এলাম। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তবু ভাল লাগছে কারণ আকাশ পরিষ্কার। অল্প সময়ের জন্য হলেও হিমালয়ে শেষ বিকেলের এই রঙবাহারী প্রকৃতি এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে পশ্চিমদিকে মুখ করে দাঁড়ালে সামনে দেখা যায় অনামী শৃঙ্গটি। একটু ডান দিকে মানে উত্তর দিক ঘেঁষে বেথারতলীর কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। আর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রয়েছে ত্রিশূল। না, ঠিক ত্রিশূল নয়, বরং বলি ত্রিশূলের কাঁধ। ওদিকটা এখন সাদা। মাঝে মধ্যে কালোর ছোপ-ধরা এক শান্ত-সমাহিত শ্বেতশুভ্র গিরিশ্রেণী।

এবার দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব আর পূর্ব দিকে চোখ ফেরাই। আহা, চোখজুড়ানো রঙের খেলা। পশ্চিম প্রান্তে অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিগুলি পড়েছে নন্দাদেবী অভয়ারণ্যের অন্তঃপ্রাচীরের গায়ে। সাত রঙে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে মৃগথুনী, দেবীস্থান শিখরদ্বয় এবং আরো কত জানা-অজানা তুষার শিখর।

মৃগথুনীর বিশাল চেহারার দিকে তাকাও, রজতশুভ্র তুষারের বুকে ঠিকরে পড়া পড়ন্ত রোদে কত না রঙ। মুহূর্তে মুহূর্তে আবার তা বদলে যাচ্ছে। এই সোনালী তো এই কমলা, আবার পরক্ষণেই তাকিয়ে দেখি রঙ হয়ে গেছে গোলাপী।

দেবীস্থান যুগল শিখরের সাদা মাথা দু'টি এখন উজ্জ্বল কমলা। এদিকে তার গায়ের নিরেট পাথরের খাড়া দেওয়ালগুলি দেখ, কোথাও বেগুনি, কোথাও খয়েরি কোথাও বা ম্যাজেন্টা।

মৃগথুনীর শীর্ষভাগে কিছু মেঘ জমেছে। ঘনত্ব অনুসারে তাদেরই বা

কত রঙ! কেউ কালো, কেউ ছাই-ছাই, আবার কেউ বা চূড়ান্ত গোলাপী।

এক নম্বর শিবিরের তাঁবুর বাইরে একটা বড় পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা। ভাবছিলাম সেই সব সৌভাগ্যবান আরোহীদের কথা যারা এই সব অনিন্দ্যসুন্দর পর্ব্বতের কাছে এসেছেন। এসেছেন দেবীস্থানে, মৃগথুনীতে—

—'মৃগথুনীতে প্রথম assault তো গুরুদয়াল সিং-এর, তাই না?' দু'জনেই বোধ হয় একসুরে ভাবছিলাম, আমার ভাবনাটা সুশান্তর মুখে কথা হয়ে বার হল, 'কোন সালে যেন?'

—'১৯৫৮, ১৯শে জুন।'

—'একটা মহিলা দলও তো চলেছেন। যতদূর মনে পড়ছে ১৯৬৪-তে। সেবার নাকি বেশ কয়েকজন চড়েছিলেন।

—'হ্যাঁ, মিসেস জয়েস ডানসীথের নেতৃত্বে তিনজন মহিলা সদস্য এবং চারজন শেরপা মৃগথুনী আরোহণ করেন '৬৪ সালের অক্টোবরে।

—'আসাম মাউণ্টেনিয়ারিং ক্লাবের অতনুপ্রসাদ বড়ুয়ার দলও মৃগথুনা ক্লাইম্ব করেছে '৭০ সালের ৪ঠা অক্টোবর।'

আমি ভারছিলাম গুরুদয়াল সিংএর কথা, দুন স্কুলের এই শিক্ষক ভারতীয় পর্বতারোহণের জন্য যা করেছেন তার তুলনা মেলা ভার। এ অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেকটি পর্বতশৃঙ্গে তিনি এসেছেন, বার বার অভিযান চালিয়েছেন। সামনে এই যে উন্নতশির দেবীস্থান(১) এতেও প্রথম সফল নেতৃত্ব দেন গুরুদয়াল। ১৯৬১ সালের ১৬ই জুন দেবীস্থান(১)-এর শীর্ষারোহণ করেন গুরুদয়াল সিং, জন ডায়াস, সুমন দুবে, হরিদাং, এন শর্মা ও দু'জন শেরপা।

দেবীস্থান(২) অবশ্য ক্লাইম্ব হয় ১৯৬৪ সালে। নরেন্দ্রকুমারের নেতৃত্ব সফল আরোহণ হয় ২৪শে জুন। শীর্ষারোহী মোট ৪ জন।

—'আরে দেখুন, দেখুন,' সুশান্ত চমক ভাঙায় আমার, 'নন্দাদেবীকে দেখুন।'

সত্যি সত্যি চমকে উঠে তাকাই নন্দাদেবীর দিকে। তারপর শুধু অবাক হওয়ার পালা। ইতিমধ্যে কখন যেন সূর্য পশ্চিম দিগন্তে, ত্রিশূলের কাঁধের আড়ালে বিশ্রামের সন্ধানে চলে গেছেন, চারপাশের পাহাড়-গুলোতে শেষ হয়েছে রঙের খেলা, এক মলিন পাণ্ডুরতা গ্রাস করছে বিশ্বচরাচর। শুধু দূর পূর্ব দিগন্তে দেবীস্থানের শীর্ষ অতিক্রম করে গর্বিতা নন্দাদেবী। তার শীর্ষদেশ জ্বলজ্বল করছে, প্রায় অন্ধকার নীচের জগতের মাঝে মাণিক্য-খচিত কিরিটিনী নন্দাদেবী সম্রাজ্ঞীর মহিমায় এক এবং অনন্য।

আমার অতি-সীমিত এই নশ্বর চোখ দুটো দিয়ে কি এই অপার্থিব লোকের, এই অনিন্দ্যলোকের, এই অবিনশ্বর রূপের পরিমাপ করতে পারব! আমি, সুশান্ত শুধু নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম।

—'সাব, খানা খা লো।'

খেম সিং-এর ডাকে ঘোর কাটল। আস্তে আস্তে কিচেন টেণ্টে গিয়ে ঢুকলাম। খারাপ খাওয়া হল না। তৃতীয়বার গরম করা দু'নম্বর দলের সেই খিচুড়ি আর একটা মাংসের টিন। শেষে উষ্ণ পানীয় রূপে পাওয়া গেল Drinking chocolate.

সবে অন্ধকার হয়েছে। এরই মধ্যে তাঁবুতে শুয়ে পড়েছি। বাইরে অন্ধকার হতে না হতেই তুষার পড়া আরম্ভ হয়ে গেছে। আবহাওয়া আবার খারাপ হয়ে গেল।

শুয়ে তো পড়েছি, কিন্তু এয়ার ম্যাট্রেসের এ কি হাল! দু'জনের ম্যাট্রেসই ফুটো। বসে আবার হাওয়া দেওয়া শুরু হল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অন্তত ১০ ডিগ্রী নীচে। আর এই ঠাণ্ডার মোকাবিলা করার জন্য আমাদের সম্বল অতি অখাদ্য এক স্লিপিং ব্যাগ। আর যাইহোক উষ্ণতাদানের ক্ষমতা সেই ব্যাগের একান্তই কম।

ঠাণ্ডায়, অভিযানের চিন্তায় ঘুমও আসছে না। ঠাণ্ডায় কাঁপছি, কেঁপে উঠছি বাইরের হাওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দে, কাঁপিয়ে দিচ্ছে ত্রিশূল হিমবাহের ওপরের অংশ থেকে নেমে-আসা তুষার-ধ্বসের ঘন ঘন শব্দ।

দীর্ঘ রাতটা কাটাতে হবে। কোন কাজ নেই—শুধু একটা ছাড়া। কিছুক্ষণ বাদে বাদেই হাঁপ-ধরা বুকের পাঁজরটা সজোরে ওঠা-নামা করিয়ে হাওয়া ভরতে হচ্ছে শতচ্ছিদ্র এয়ার ম্যাট্রেসে। ১৭,৮০০ ফুট উঁচুতে মাইনাস ১০ ডিগ্রীতে এই তৃতীয় শ্রেণীর স্লিপিং ব্যাগ আর ফুটো এয়ার ম্যাট্রেস নিয়ে জানি না রাত কিভাবে কাটবে, আদৌ কাটবে কিনা!

বুঝছি, অতিরিক্ত ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে। সারা রাত হয়ত কেঁপে কেঁপে আর বসেই কাটাতে হবে। হয়ত শুধু অমূল্য জীবনের টানেই প্রাণটাকে ধরে রাখতে হবে। সান্ত্বনা এই, আশা এই, আমরা জানি, যতই দীর্ঘ হোক এ বিনিদ্র রজনী—শেষে এর প্রভাত আছেই।

আর, আগামীকালের প্রভাত, আমার জীবনে এক স্মরণীয় প্রভাত হোক। আমার সব কষ্ট, সব ধৈর্য, সব আশা, সব অধীরতার অবসান করুক আগামীকালের প্রভাত।

এস, আমরা প্রার্থনা করি, আগামীকালের প্রভাত আলোকিত করুক আমাদের জীবন, সব তমিস্রার অবসান ঘটিয়ে সুন্দর সার্থক হোক আমাদের জীবন, বাধার পাহাড় পেরিয়ে তীব্রতম অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়ে খাঁটি সোনা হয়েছে যে হৃদয়, চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে জীবনের জয়গানে হোক সে মুখরিত।

আগাকীকালের প্রভাত ২১শে সেপ্টেম্বরের প্রভাত।

উনিশ

এ যে ৪টে বাজে!

তবে কি, তবে কি—

—'ঐ যে, ঐ যে—'

অকস্মাৎ তাঁবুর বাইরে থেকে সুশান্তর প্রাণ-ফাটা চিৎকার 'ঐ যে, ঐ যে, একজন নামছে।'

বুলেটের মত তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলাম, 'কই. কই?'

'হ্যাঁ, ঐ তো?' অনামী শৃঙ্গ আর ত্রিশূলকে সংযুক্তকারী গিরিশিরাটি থেকে একটু নীচে একটা কালো বিন্দু। চলমান বিন্দু। একটু একটু করে নামছে।

আশ্চর্য, ত্বপুর থেকে মেঘে ঢেকে রইল পুরো অঞ্চলটা আর এই একেবারে বিকেলবেলা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। মেঘ অনেকটা ওপরে উঠে গেছে, ত্রিশূল আর তার শীর্ষপথের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে।

ঐ তো আরেকজন। প্রথম বিন্দুটা থেকে একটু পিছনে। খুব দ্রুত নামছে ওরা। এখান থেকে অবশ্য খুবই আস্তে মনে হচ্ছে ওদের নড়াচড়া। তবু হিসেব করলে বোঝা যায় ত্বরন্ত বরফের ঢালকে অগ্রাহ্য করে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি নামছে ওরা।

ঐ তো, আরও তুজন। মনে হচ্ছে কালো বিন্দুগুলি যেন মেঘের ঘন আস্তরণ থেকে টুপ টুপ করে খসে পড়ছে। মোট চারজন হল, আর তু'জন কোথায়? অনেকটা নেমে এসেছে ওরা। হ্যাঁ, ঐ তো, বেশ কিছুটা পিছনে শেষ বিন্দু তুটিও নামছে দেখা গেল।

আঃ, কি নিশ্চিন্ত, কি আরাম লাগছে! এক অবিশ্বাস্য মানসিক যন্ত্রণা আর স্নায়ুর চাপে কাটছিল সময়। এক অনন্তকাল অপেক্ষার পর শীর্ষাভিযাত্রী ৬ জনকেই ঠিক ঠিক নামতে দেখে আমার ওপর চেপে বসা অসহনীয় দায়িত্বের বোঝা নেমে গেল। বহু সময় বাদে আমার শ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল।

তিন নম্বর শিবির থেকে ক'টা কালো বিন্দু এগোচ্ছে ওপরের দিকে। ওরা তু'নম্বর দল। ওরা এগোচ্ছে প্রথম দলকে স্বাগত জানাতে। ওদের হাতে নিশ্চয়ই গরম চায়ের কেটলী, মগ আর নিশ্চয়ই কিছু উপযুক্ত খাদ্য। শুধু এগুলিই নয়, আরো আছে, ওদের মুখে আছে অনাবিল হাসি, চোখে আছে আনন্দাশ্রু, ওদের বাড়ানো তু'হাতে আছে এক হৃদয়-ভরা উষ্ণতা।

আমরা এই ক্ষণ-মুহূর্তে অনেক দূরে, ১৯৫০০ ফুট উঁচুতে তু'নম্বর শিবিরে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করছি এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য।

৪টে বেজে ১৫ মিনিট। তু'নম্বর দলের একজনের সঙ্গে ওদের প্রথম জনের মিলন হল। ঠিক পিছনেই অনামী শৃঙ্গ ছায়া ফেলেছে। কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র, তু'নম্বর দলের সবার সঙ্গেই প্রথম দলের সবার মিলন হল। সাদা একটা পর্দার বুকে কয়েকটা কালো বিন্দু কি এক ইতিহাস তৈরী করে চলছে। নিশ্চয়ই ওরা পরস্পরকে দৃঢ় ভাবে জড়িয়ে ধরেছে। আঃ, এতদূর থেকেও ওদের হৃদয়ের স্পন্দন আর উত্তাপ আমি পাচ্ছি।

হঠাৎ মনে হল ওরা কিছু নাড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে কিছু একটা মাথার ওপর তুলে ধরে বাতাসে আন্দোলিত করছে। নিশ্চয়ই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। ওরা জানে তু'নম্বর শিবির থেকে ওদের দেখা যাবে এবং নিশ্চয়ই আমরা ওদের পথ চেয়ে শুভ-সংবাদের আশায় দাঁড়িয়ে আছি। ঠিক বুঝতে পারছি না. ওটা পতাকা, না কারো উইণ্ড-প্রুফ জ্যাকেট। যাইহোক, বুঝেছি বন্ধু, যা বলতে চাইছ, যা জানতে চাইছ, বুঝেছি আমরা।

আর বুঝেছি বলেই তো আমাদের মুখ দিয়ে কোন কথা সরল না, শুধু পরস্পরের দিকে তাকালাম আমরা।

কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইল সুশান্ত, তারপর এক কদম এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে, বলল, 'Let me have the previlege to congratulate you first', আমার হাত চেপে ধরল সুশান্ত। 'Leader, take hearty congratulations from your Quarter-Master.'

এক ঝটকায় পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম আমরা। এদিকে খেম সিং একা একাই নাচছে আর চেঁচাচ্ছে, 'কাম ফতে হো গিয়া, পিক সে লিয়া, কাম ফতে হো গিয়া—'

সুশান্তর বাহুপাশে অসহ্য আনন্দে আমার বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল, চোখ ভরে উঠল জলে।

৪টে বেজে ৩৫ মিনিট, সুশান্ত জানাল, ওরা তিন নম্বর শিবির

থেকে নীচে নামতে শুরু করল। সুশান্ত তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছে সব running commentary-র মত। আমাকে আবার ভেতরে ঢুকতে হয়েছে। ওদের চোখের আড়াল করতে মন চাইছে না, ইচ্ছে করছে দৌড়ে এগিয়ে যাই ওদের কাছে, সাহচর্য দিয়ে যতটুকু সম্ভব ওদের শ্রান্তি দূর করি কিন্তু নেতৃত্বের অনেক জ্বালা, অনেক দায়িত্ব।

অনেক কাজ এখন আমার। যথাসম্ভব কাগজপত্র তৈরী করে রাখছি, ওরা এখানে পৌছলেই কয়েকটি তথ্য নিয়ে সম্পূর্ণ সংবাদ তৈরী করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই সংবাদ নিয়ে খেম সিং নেমে যাবে এক নম্বর শিবিরে। ওর যেতে নিশ্চয়ই অন্ধকার হয়ে আসবে। এক নম্বর শিবিরে ওর জন্য মূল শিবির থেকে আসা লোক অপেক্ষা করছে। খেম পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদ নিয়ে সে রওনা দেবে মূল শিবিরের দিকে। রাত হয়ে যাবে জানি, তবু যে ভাবেই হোক একই দিনে মূল শিবির পর্যন্ত খবর পৌছানো চাই। অভিযানের প্রত্যেকটি সদস্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে এই সংবাদটির জন্য। তাছাড়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুভ সংবাদটি পাঠাতে চাই সমতল ভূমিতে, আমাদের অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীর কাছে, যাঁরা দিন গুনছেন, যাঁরা এই অভিযানের প্রাণস্বরূপ।

সুশান্ত ধারাবিবরণী দিয়ে যাচ্ছে। এই ওরা তিন নম্বরের নীচে খাড়া দেওয়ালটার নীচে নেমে গেছে। আশা করা যাচ্ছে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ওরা সবাই দু নম্বর শিবিরে পৌছে যেতে পারবে। খেম সিং, চা কফি যা হয় কিছু রেডি কর। খাবারও কিছু রেখো। কোই চিন্তা নেহি সাব, খেম সিং কা সব কুছ রেডি হ্যায়, কড়া ইয়া নরম, ঠাণ্ডা ইয়া গরম। বা বা খেম সিং, ও ছড়া কাটছে—সবাই মুডে এসে গেছে। সুশান্তর ধারাবিবরণী বন্ধ হয়নি একটুও। এই ওরা নীচে ফাটল এলাকাটা ধরেছে। এবার আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত। কি এত লিখছেন বলুন তো ? বেরিয়ে আসুন, পরে হবে ওসব। হ্যাঁ, যাই সুশান্ত, আর এক মিনিট, ক' লাইনের রিপোর্টটা লিখেই যাচ্ছি। আরে ওরা যে এসে

গেল আর আমরা এখনও তাঁবু আঁকড়ে রয়েছি ? আপনি যাবেন তো চলুন, নইলে আমি এগোচ্ছি। ঐ তো ওরা হাত নাড়ছে। যাই রে সদা, কিণ্ডো, অনিন্দ্য, জিতু—Congratulations—ত্রিশূল-অভিযান জিন্দাবাদ—

সুশান্তর চিৎকার দূরে মিলিয়ে গেল।

নাঃ, আর পারি না। ওদের গলা পাচ্ছি। পড়ে থাক সব কাজ। পড়ে থাক নেতৃত্বের ঝুটা বাঁধন। আগে ওদের বুকের মাঝে টেনে নিই। এমন মুহূর্ত কি আর আসবে ?

কুড়ি

অবশেষে তিন নম্বর শিবিরে প্রভাত হল—২১শে সেপ্টেম্বরের প্রভাত।

না, ভুল হল। প্রভাতে বলি কেমন করে ? সদার ঘুম ভাঙল রাত তিনটেতে।

আবার ভুল হল। ঘুম হল আর কই যে ভাঙবে ! ওরা আছে এখন ২০,২০০ ফুট উঁচুতে। সমতলভূমিতে বাতাসে যে পরিমাণ অক্সিজেন থাকে এখানে, এই উচ্চতায়, তা রয়েছে অর্ধেকেরও কম। প্রতিবারই শ্বাস নিতে ফুসফুসে প্রচণ্ড চাপ পড়ছে, আর তার ফলে গোটা শরীরটাই যেন অকেজো হয়ে যাচ্ছে। শরীর নামক যন্ত্রের সমস্ত অংশগুলোই যেন বিগড়ে গেছে, রক্তচাপ বেড়ে গেছে, পরিশ্রম করার শক্তি একেবারে কমে গেছে, মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে অসহ্য যন্ত্রণায়। খিদে নেই, সব সময় একটা বমি-বমি ভাব। ঘুম আসে না, কিন্তু সর্বক্ষণ কেমন ঝিমঝিম করছে শরীর, অনুভূতি-শক্তিটাই যেন ভোঁতা হয়ে গেছে—শুধু তাজা আছে মন। সর্বদা সজাগ মন বার বার জানিয়ে দিচ্ছে আর মাত্র কিছুক্ষণ, তারপরই তোমার শেষ লড়াই। সারা রাত এভাবেই কাটাল সবাই। একদিকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর শারীরিক কষ্টের সঙ্গে লড়াই, অন্যদিকে উত্তেজিত মন, অস্থির হৃদয়। ঘুমোতে ওরা আর পারল কই ! অবশেষে

যখন সদার রেডিয়াম ডায়ালের ছোট কাঁটাটা তিনটের ঘর পার হয়ে গেল ও আর থাকতে পারল না, স্লিপিং ব্যাগ সহ উঠে বসল, আস্তে আস্তে ডাকল, 'এই কিণ্ডো, ঘুমোচ্ছিস ?'

অন্য পাশ থেকে সাড়া দিল জিতু, 'কি ব্যাপার ? আমাকে বল না, ও বেচারা ঘুমোচ্ছে—একটু ঘুমোতে দাও।'

—'হ্যাঁ ঘুমোচ্ছে !' বলতে বলতে উঠে বসল কিণ্ডো, 'ঘুম হলে তো! তখন থেকেই ভাবছি, তোদের ডাকি, আবার ভাবছি ঘুমোচ্ছে ঘুমোক।'

মনে মনেই হাসল জিতু। ও নিজেও যে একই কথা ভাবছিল, তা আর প্রকাশ করল না।

সদা বলল, 'তিনটে বেজে গেছে, আস্তে আস্তে তৈরী হওয়া দরকার।'

কিণ্ডো অন্ধকারের মধ্যেই এদিক ওদিক চাইল, 'একটু চা না হলে তো নড়াচড়াই অসম্ভব।'

সদা কিছু বলার আগেই জিতু বলল, 'এই অন্ধকারে কি চা বানানো যাবে ? আর, ওদের বলতেই কেমন লাগছে।'

—'কিন্তু তৈরী হতে হবে, যেতে হবে, আর সেজন্য চা একান্ত দরকার। দেখি শের সিংকে ডেকে,' সদা পাশের তাঁবুর উদ্দেশ্যে গলা তুলল, 'শের সিং—ও শের সিং, সুবা হো গয়া, উঠো ভাই, জেরা চা বানাও।'

—'জি সাহাব,' পাশের তাঁবু থেকে জবাব দিল নিমা, 'ম্যায় বানায়ুঙ্গা সাহাব, আভি বানায়ুঙ্গা।'

নিমার তাঁবুতে অনিন্দ্য আর শের সিংও উঠে পড়েছে। বেশী কথা বলার পরিশ্রম ওরা করতে চাইল না। চুপচাপ নিজের নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল।

চা হতে হতে প্রায় ঘন্টাদেড়েক লাগল। এর চেয়ে কম সময়ে সম্ভবও নয়। নিমাকে প্রথমে সমস্ত জামাকাপড় পরতে হল। তারপর আইস-অ্যাক্স আর কেটলিটা নিয়ে বার হল তাঁবুর বাইরে। একটা পরিষ্কার

জায়গা দেখে বরফ সংগ্রহ করল কেটলিতে। তাঁবুতে ঢুকে একমাত্র প্রেসার স্টোভটি ধরাতে হল। সে স্টোভ কি আর ধরতে চায়! অনেক কায়দা-কানুনের পর স্টোভ ধরল এবং তার ওপর সেই বরফ ভরতি কেটলি চাপানো হল। এবার এই বরফ গলে জল হবে এবং সেই জল ফুটবে। এবং তারপর তাতে চা তৈরী হবে। প্রায় অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের ব্যাপার।

স্বভাবতই সাড়ে চারটে পৌনে পাঁচটা নাগাদ যখন নিমা সদার তাঁবুতে কেটলি নিয়ে ঢুকে বলল, 'সাব গরম চা' ওরা যারপর নাই আহ্লাদিত হয়ে মগ বাড়িয়ে ধরল। তারপরই প্রায় জমে আসা দুহাতের তালুতে গরম মগটা চেপে ধরে সোজা মুখে। আঃ, এক উষ্ণ চুমুক—এ কি! চমকে উঠল সবাই, এ তো drinking chocolate, এ তো চা নয়।

—'এ হে হে—ইয়ে কেয়া বানায়া নিমা,' সবার মুখেই এক কথা। এমনিতে drinking chocolate খেতে ভাল, কিন্তু এই ভোরবেলা ওর গন্ধটা বড় উগ্র লাগে, আর তাছাড়া, দিনের প্রথম পানীয় হিসেবে একমাত্র চা-ই চলে।

নিমার একেবারে কাঁচুমাচু মুখ, 'সাব, আন্ধেরা থা, ভুল হো গয়া। ঠিক হ্যায় সাব, ম্যায় ফির বানায়ুঙ্গা।'

—'না নিমা। তার সময় হবে না, আর তার দরকারও নেই,' সদা সহজ জবাব দিল, 'যা পেয়েছ এই খাও আর চটপট তৈরী হয়ে নাও, সময় বেশী নেই।'

অতএব তৈরী হও, তৈরী হও।

ভোর সাড়ে পাঁচটার মধ্যে সবাই তৈরী হয়ে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল। শেষবারের মত দেখে নিল সব-কিছু। সব নেওয়া হয়েছে তো?

সদার হাতে আজ সেই আইস-অ্যাক্স, যাতে জড়ানো আছে পতাকা। এই পতাকাই ওদের আদর্শ, এই পতাকাকে সামনে রেখেই ওরা চলবে।

সদার নির্দেশ অনুযায়ী ওরা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে দাঁড়াল। আজ

চূড়ান্ত লড়াই, কোন রকম সুযোগ নেওয়া নেই। এক-একটি ভাগ এক-একটি ১২০ ফুটের দড়িতে নিজেদের সংযুক্ত করল। প্রথম দড়িতে রইল নিমা, জিতু আর অনিন্দ্য আর দ্বিতীয় দড়িতে রইল শের সিং, কিপ্তো ও সদা।

ছ'টা বাজতে চলল। আর দেরী নয়। শেষ মুহূর্তে সদা সবাইকে এক জায়গায় দাঁড় করাল। সবার দিকে তাকিয়ে অটল আস্থার সঙ্গে বলল, 'বন্ধুরা, ২১শে সেপ্টেম্বরকে সার্থক করে তুলতে আমরা যাচ্ছি, অনেক মানুষ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা অযথা সুযোগ নেব না এবং শেষ নিঃশ্বাসটুকু পর্যন্ত চলব। জয় আমাদের হবেই।' বলিষ্ঠ হাতে পতাকা ওড়ানো আইস-অ্যাক্স তুলে সদা নির্দেশ দিল, 'চলো।'

ওরা চলল।

ওদের প্রথম লক্ষ্য ত্রিশূল আর অনামী শৃঙ্গের সংযোগকারী গিরিশিরা। রোদ এখনও ওঠেনি, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, যদিও হাড়কাঁপানো হাওয়া এখন নেই। বরফের চেহারাও ভাল। নরম বরফ কিন্তু খুব ভসভসে নয়। সারা রাতে জমে জমে কিছুটা স্থায়িত্ব পেয়েছে। এই রকম বরফের ওপর দিয়ে চলতে খুব অসুবিধে হয় না। পা পুরো ঢুকছে না, আবার পিছলেও যাচ্ছে না। ওরা বেশ তাড়াতাড়ি এগলো।

প্রায় এক ঘণ্টাতে ওরা সেই গিরিশিরার কাছে চলে এল। এখানেই তিন নম্বর শিবির করার কথা ছিল। তাহলে এই সময়টা ও অনেকটা পরিশ্রম বেঁচে যেত।

যাইহোক, বলা যায়, অল্প আয়াসেই গিরিশিরার ওপরে উঠল সবাই। উঠেই দুটো জিনিসের মুখোমুখি হল ওরা। সকালের প্রথম রোদ ওদের গায়ে পড়ল, ওরা একটু উষ্ণ, একটু সঞ্জীবিত বোধ করল, কিন্তু পরক্ষণেই পশ্চিম উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ধেয়ে-আসা ঠাণ্ডা হাওয়া ওদের আঘাত হানল।

গিরিশিরাটি পার হতে গিয়েই ওরা এক তুষার ফাটলের (crevasse) সম্মুখীন হল। নিমা একটু এগিয়ে সমস্ত ফাটলটা পরখ

করল এবং ওর উপদেশ অনুযায়ী অভিযাত্রীরা বাঁ দিকে বেঁকে গিয়ে ফাটলটিকে এড়িয়ে গেল, অনেকটা ঘুরে ফাটলের ওপাশে পৌঁছল।

আগে যেমন ঠিক করা ছিল, সেই অনুযায়ী ওরা এখন পুরোপুরি ডানদিকে ঘুরে এগোতে লাগল। ওদের উদ্দেশ্য ত্রিশূল আর অনামী শৃঙ্গের সংযোগ-বিন্দুতে পৌঁছনো। পথ বেশী নয়, প্রায়-সমতলও বটে, কিন্তু বরফ অত্যন্ত নরম। এক এক পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কোমর পর্যন্ত ঢুকে যেতে লাগল। সেই পাকে তুলে অন্য পা ফেলা অশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ফলে সেই সামান্য দূরত্ব পার হতে ওদের অনেক সময় লেগে গেল, খরচ হয়ে গেল অনেক পরিশ্রমের ক্ষমতা।

কিন্তু যেই ওরা দুই শৃঙ্গের মিলন বিন্দুতে পৌঁছল দেখা গেল বরফ অত্যন্ত শক্ত। অকস্মাৎ বরফের এই চরিত্রগত পরিবর্তনে ওদের দাঁড়িয়ে পড়তে হল, চলার ভঙ্গীকে নতুন কায়দায় রপ্ত করতে একটু সময়ও লাগল। কয়েক পা এভাবে যেতেই বরফ এত শক্ত মনে হল যে ওরা ভাবল ক্লাইম্বিং বুটের তলায় ক্র্যাম্পন (crampon) লাগাবে। কিন্তু ক্র্যাম্পন লাগালে চলার গতি যায় অনেক কমে তাই শেষ চেষ্টা হিসেবে ওরা বুটের সামনের অংশ দিয়ে লাথি মেরে বরফের গায়ে ছোট ছোট ধাপ তৈরী করতে লাগল। পরিশ্রম একটু বেশী হল বটে তবে ক্র্যাম্পন লাগাতে হল না, ওদের চলাও বন্ধ হল না।

ঠিক ছিল দুই শৃঙ্গের সংযোগ-বিন্দু থেকে ত্রিশূলের গিরিশিরাটি ধরে ওঠা হবে, কিন্তু চারপাশ দেখে নিমা পূর্ব সিদ্ধান্তে আপত্তি করল। নিমা তার রোপ-মেট (Rope mate) সহনেতা জিতুর সঙ্গে একটু আলোচনা করল এবং দু'জনেই একমত হল যে গিরিশিরা ধরে গেলে ভুল পথের সম্ভাবনা থাকবে। বরং কিছুটা বাঁদিকে সরে গিয়ে সরাসরি ত্রিশূলের কাঁধ লক্ষ্য করে এগনোই ঠিক হবে।

সে অনুযায়ী ওরা আবার বাঁয়ে মানে দক্ষিণ দিকে সরে এল কিছুটা এবং যেখান থেকে ত্রিশূলের কাঁধ, যাকে ওদের ওখান থেকে শীর্ষদেশের মতই মনে হচ্ছিল, লক্ষ্য করে এগলো। বেশ খাড়াই, পরিশ্রমও যথেষ্ট

হচ্ছে, কিন্তু বরফের অবস্থা বেশ ভাল। সবাই যথেষ্ট গতির সঙ্গে উঠে যেতে চাইল, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ধেয়ে-আসা হাওয়া এক কঠিন অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। বেলা বাড়ছিল, প্রতি পদক্ষেপে হাওয়ার গতিও বাড়ছিল।

ওদের কারোরই দেহের প্রায় কোন অংশই খোলা নেই। পায়ে তিন-চার প্রস্থ উলের মোজার ওপর ক্লাইম্বিং বুট। বুট আর মোজার ফাঁকে যাতে বরফ না ঢোকে তার জন্য আছে গেইটার (Gaiter)। পরনে উলের ড্রয়ার (Drawer)-এর ওপরে ক্লাইম্বিং ট্রাউজার এবং তারও ওপরে পরনে রয়েছে উইণ্ডপ্রুফ ট্রাউজার। গায়ে উলিকটের ফুল গেঞ্জি ; শার্ট, হাফ ও ফুল সোয়েটার ও তার ওপরে উইণ্ডপ্রুফ জ্যাকেট। হাতে সুতি ও উলের দস্তানা। চোখে স্নো গগলস্ এবং মাথায় উলের বালাক্লাভা। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল হাওয়া যেন চামড়ায় কেটে বসে যাচ্ছে, মুখের যেটুকু অংশ খোলা রাখতেই হয়েছে তাতে যেন হাজারো ছুঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে।

তবু ধীরে ধীরে ওরা এগলো। ধীরে ধীরে, কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে, সংযত চিত্তে। বিশ পদক্ষেপ চলা, একটু দাঁড়ানো, আবার বিশ পদ-ক্ষেপ। মিনিটের পর মিনিট অতিক্রান্ত হল, বেলা বাড়ল, প্রায় ১২টা বাজতে চলল, কিন্তু কোথায়, এ পথের শেষ কোথায়? কোথায় সেই ঈপ্সিত লক্ষ্য! ওদের মনে হতে লাগল, এ যেন সেই আলেয়ার মায়া, তিন ঘণ্টা আগে যত দূর মনে হয়েছিল, ত্রিশূল-শীর্ষ এখনও মনে হচ্ছে ঠিক ততখানিই দূর।

এই অবসরে আবহাওয়া আসরে নামল। চারদিক থেকে ঘন কালো মেঘ উঠে আসতে লাগল, বিশেষ করে ত্রিশূল-হিমবাহের দিক থেকে। হাওয়ার তীব্রতা বেড়ে গেছে। শোঁ শোঁ শব্দে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে আসছে। সূর্য ঢাকা পড়ে গেল প্রায়। অবস্থা দেখে মনে হতে লাগল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তুষারপাত আরম্ভ হবে। আর এই তীব্র হাওয়ার সঙ্গে তুষারপাত আরম্ভ হলে মুহূর্তে তা তুষার-ঝড়ে Blizzard)-

পরিণত হবে।

তুষার-ঝড়ের চিন্তায় ওরা কেঁপে উঠল। তাহলে এখন কি করা কর্তব্য ? ছ' ঘন্টার বেশী মার্চ হয়ে গেছে, কিন্তু শীর্ষদেশের কোন হদিশই ওরা করতে পারেনি। শিবির অঞ্চল থেকে ত্রিশূলের যে কাঁধ দেখা যাচ্ছিল, তার ওপর উঠে দেখা গেল সামনে আবার একটা ওইরকম কাঁধ বা ডোম (Dome)। অতিকষ্টে তার ওপর ওঠা হল, তো দেখা গেল, তারপর আরেকটা ডোম দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকটাকেই দেখে মনে হচ্ছে এটাই শীর্ষ (Peak Point), কিন্তু ওপরে ওঠার পর বোঝা যাচ্ছে এটা একটা কাঁধ মাত্র, শীর্ষ সামনে কোথাও আছে। এভাবে একটার পর একটা ডোম, যেগুলির নাম দেওয়া হল false peak, পার হতে হতে ওদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে লাগল।

এমনই একটা মুহূর্তে নিমা জানাল, ওদের বোধহয় ফেরা উচিত।

ফেরা উচিত !

তুষার-ঝড় নয়, আচমকা ওদের মাথায় যেন বজ্রপাত হল। ফিরে যেতে হবে ? এত কষ্টের পর, এই একেবারে দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে যেতে হবে ! এতদূর এসেও সাফল্য থেকে যাবে অধরা ! এরই মধ্যে পরাজয় মেনে নিতে হবে ! ওদের সবার অন্তরাত্মা একযোগে আর্তনাদ করে উঠল, না—না—

বাস্তব অবস্থা কিন্তু নিমার মতের অনুকূলে। সাড়ে ছ'ঘন্টা চলা হয়ে গেছে, ত্রিশূল-শীর্ষের কোন হদিশই করতে পারেনি ওরা। খুব তাড়াতাড়ি কিছু করতে পারবে সে ভরসাও অত্যন্ত কম। সকালের দিক আবহাওয়া ভাল ছিল, অনেকদূর দেখা যাচ্ছিল, এখন আব-হাওয়ার অবস্থা যথেষ্ট খারাপ, যে কোন মুহূর্তে তা প্রলয়ঙ্করী চেহারা নিতে পারে। তাছাড়া শরীরে শক্তি বলে আর কিছু নেই, অথচ এই ছ'ঘন্টার পথ ওদের ফিরে যেতেই হবে।

নিমার ব্যবহারিক যুক্তি অকাট্য। আজ এই আবহাওয়ায় এগোতে গিয়ে যদি একটা কিছু বিপদ ঘটে যায়, তবে তা সারা দলের পক্ষেই

অত্যন্ত ক্ষতিকারক হবে, শৃঙ্গ এবারের মতন হাতের বাইরে চলে যাবে। পক্ষান্তরে ওরা ব্যর্থ হলেও, যদি ঠিক ঠিক মতন ফিরতে পারে তবে আগামীকাল আবার শীর্ষাভিযান হতে পারবে। আবহাওয়াও হয়ত আরও ভালো পাওয়া যেতে পারে এবং ওদের দল না হোক দু'নম্বর দল গোটা দলের সাফল্য-এনে দিতে পারে।

বুঝেছি, বুঝেছি, এত ব্যাখ্যা না করলেও চলবে আবেগ দিয়ে মনের আকাশে জমা হওয়া অকাট্য যুক্তির কালো মেঘগুলি সরাতে চাইল সবাই। সবই বুঝলাম—কিন্তু ফিরে যেতে হবে? কই, এখনও তো কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েনি। ক্লান্ত নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু কারো মুখ দিয়ে একবারের জন্যও 'পারছি না' শব্দটা বার হয়নি, আবহাওয়া খারাপ হয়েছে বটে কিন্তু ওদের মনোবল রয়েছে অটুট্। শীর্ষদেশকে এখনও নির্দিষ্ট করতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু এখনও ওদের চোখে স্বপ্ন, ওদের সমস্ত ইচ্ছাশক্তি একই লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত।

সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

অথচ জায়গাটা বা পরিবেশটা আদৌ এমন নয় যে একটু বসে সবাই মিলে আলোচনা করে ঠাণ্ডা মাথায় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। সবাই মিলে বসা তো দূরের কথা একজায়গায় কাছাকাছি দাঁড়াতেই পারছে না ওরা।

সেই বিশাল পর্বতের প্রায় শীর্ষভাগে অন্তত সাড়ে বাইশ হাজার ফুট উঁচুতে, প্রতিটি মুহূর্তে বাঁচার জন্য লড়াই করতে করতে, তীব্র হিমেল ঝড়ো হাওয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক মুহূর্তের বেশী সময় না নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে, একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত।

এরকম অসহায় মুহূর্ত সদার জীবনে আর আসেনি। ও জানে পর্বতা-রোহণ পরিচালিত হয় কঠোর সৈনিক-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে এবং অভিযান চলে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির তুলনীয় ব্যস্ততায়। আজ এই যুদ্ধের তুমি সেনাপতি। তোমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে সদা। সময় নিলে চলবে না, অন্যপক্ষের অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণের মধ্যেই মুহূর্ত মাত্র দ্বিধা না করে

তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে—তোমার লড়ায়ের স্ট্রাটেজি কি হবে। কোন্ সিদ্ধান্ত নিলে তুমি ও তোমার সৈন্যবাহিনী সবচেয়ে বেশী লাভবান হবে? তুমি কি অবিশ্রাম গোলাবর্ষণের বাধাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাবে? এগিয়ে যেতে পারবে? না, নতুন সৈন্যদল নিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে আক্রমণের জন্য আপাতত পশ্চাদপসরণকেই তোমার রণকৌশল হিসেবে নেবে? তাড়াতাড়ি কর সদা, দেরী করলে পরিস্থিতি তোমার হাতের বাইরে চলে যেতে পারে এবং তার জন্যে দায়ী হবে তুমি। তাড়াতাড়ি কর এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নাও। মনে রেখো তোমার সিদ্ধান্তের ওপর অনেকগুলি প্রাণ যেমন নির্ভর করছে, একটা গোটা যুদ্ধ জয়ের প্রশ্নও নির্ভর করছে তোমার একটি নির্দেশের ওপর, বহু মানুষের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষার সার্থকতা নির্ভর করছে তোমার অঙ্গুলি হেলনের ওপর।

সদার সারা শরীরে মনে একটা চূড়ান্ত তোলপাড় উঠল। সমস্ত চিন্তাশক্তি, শারীরিক শক্তি আর ইচ্ছাশক্তিকে একই কেন্দ্রাভিমুখী করার এক প্রচণ্ড প্রয়াস নিল সদা। আস্তে আস্তে সারা দেহ থিতিয়ে এল, একটা শান্ত-সমাহিত ভাব সদাকে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করল।

একবার চারপাশ দেখল সদা, কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যেতে হবে পরিমাপ করল যেন। একবার তাকাল সতীর্থদের দিকে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। স্নো গগ্‌ল্‌সের ভেতর দিয়েও সদা অনুভব করল, সবাই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখ নামাল সদা। বাঁ হাতের কব্জিতে বাঁধা দড়িটা দেখল, তারপর ধীরে ধীরে তাকাল হাতের তুষার-গাঁইতিটার দিকে, গাঁইতিটার গায়ে জড়ানো পতাকার দিকে। তাকিয়ে রইল একটুখানি সময়। গোটা ব্যাপারটা লিখতে যে সময় লাগল বাস্তবে কিন্তু লেগেছিল তার অনেক কম। সব মিলিয়ে হয়তো দু' মিনিট। সদা ধীরে ধীরে মাথা তুলল, শান্ত দৃঢ় গলায় বলল, 'নিমা, আমরা এখন ডানদিকে ঘুরে ঐ উত্তর উত্তর-পূর্ব গিরিশিরাটা ধরব এবং ঠিক এক ঘণ্টা চলব। তার মধ্যে যদি peak point খুঁজে না পাই তবে

আমরা ফিরব।'

একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলল সবাই। ওরা সৈনিক। নির্দেশ দাও, শেষ নিশ্বাসটুকু ব্যয় করতে রাজী আছি। যদি বল, 'পিছে হটো', পাষাণ দিয়ে হৃদয় বাঁধবো, নির্দেশ পালন করব বিনা দ্বিধায়। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্তের অভাব বা দীর্ঘসূত্রতা সৈনিকের পক্ষে অকালমৃত্যুর সমান। সেনাপতি, নির্দেশ দিয়েছ আমরা কদম মিলিয়ে এগোব: প্রতিধ্বনিত করেছ আমাদের প্রাণের কথা—আমরা জোর কদমে এগোব।

ওরা আবার চলল।

পুরোপুরি ডানদিকে ঘুরল না ওরা, কোনাকুনি এগিয়ে গিরিশিরা ধরার চেষ্টা করল। বরফের অবস্থা একটু ভাল, কিন্তু ঐ উত্তর-পশ্চিমে হাওয়াটা ওদের নাকানি-চোবানি খাওয়াতে লাগল। তবু সবাই বেশ ভাল গতিতে এগলো। খিদেতে প্রাণ যাচ্ছে, সকাল থেকেই পেট একদম খালি। পথে দু'তিনবার শুধু পাইনঅ্যাপ্‌ল জুস-এর টিন কেটে একটু একটু খেয়েছে সবাই। ওদের উইণ্ডপ্রুফ-এর পকেটে কিছু খাবার আছে বটে, যেমন কাজু, কিসমিস, আমসত্ব, চকোলেট, কিন্তু কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না।

গিরিশিরাটা দেখে মনে হচ্ছিল খুব বেশী হলে আধঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যেতে পারা যাবে, কিন্তু সময় লাগল প্রায় এক ঘন্টা। সদা দেখল এক ঘন্টা হওয়ার মাত্র দশ মিনিট আগে প্রথম রোপের নিমা গিরিশিরার ওপরে উঠল।

আর মাত্র ১০ মিনিট?

সদা নিজের মনেই প্রশ্ন করল। কি হে সেনাপতি, তোমার সব হিসেব যে ভুল হয়ে গেল। কি করে ভাবলে এক ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবে, অন্তত শীর্ষদেশ দেখতে পাবে?

এবার তাহলে ফিরতে হয়। এবার আর কি বলে আটকানো যাবে! তাছাড়া বেলা ১টা বেজে গেল। ৭ ঘন্টার ওপরে হাঁটা হয়েছে। আবহাওয়া যদি আর খারাপ নাও হয় তবু অন্তত ৩/৪ ঘন্টা তো

লাগবেই তিন নম্বর শিবিরে ফিরতে। আবার কর্মসূচী অনুযায়ী, তিন নম্বর শিবিরে এখন দু' নম্বর দল চলে এসেছে, সদাদের নেমে যেতে হবে দু' নম্বর শিবিরে। তার মানে আরও এক দেড় ঘন্টা। এখনই ফিরতে শুরু করলে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তাহলে আর এগনোর প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? আবহাওয়া, ওদের শরীরের প্রতিরোধ-ক্ষমতা সবই একযোগে নির্দেশ দিচ্ছে পশ্চাদপসরণের। সদার বিচারবুদ্ধিও প্রতি মুহূর্তে কানে কানে বলছে, যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে, তার দায়িত্ব তোমার, সারা জীবন আফসোস করলেও তার ক্ষতিপূরণ হবে না; বরং ঠিক ঠিক ফিরতে পারলে দলের সবচেয়ে কম ক্ষতি হবে। মনে রেখো সদা, তুমি এই দলের নেতৃত্ব দিচ্ছ, সবার নিরাপদ প্রত্যাবর্তন তোমার প্রাথমিক দায়িত্ব।

সদার ভেতরে একটা জ্বালা ধরে গেল। ঠিক আছে, তবে তাই হোক। জয়-পরাজয় গৌণ এখানে। আমার সান্ত্বনা আমি ঠিক ঠিক যুদ্ধ পরিচালনা করেছি। অতিরিক্ত ঝুঁকি আমি নেব না। তার মধ্যে 'হিরোইজম্' থাকতে পারে, কিন্তু পর্বতারোহণে তার স্থান নেই। আমি জানি আমার এবং আমার দলের যা যা করার ছিল আমরা করেছি এবং এই যে ফেরার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি তাও পুরো দলের বৃহত্তম স্বার্থেই। স্বার্থকতার মাপকাঠিতেই শুধু বিচার হয় না, পর্বতারোহণের মূল্যায়ন হয় অভিজ্ঞতার প্রকৃত খতিয়ানে। দুর্লভতম অভিজ্ঞতার মণিকাঞ্চনে মনের মণিকোঠা ভরা আমাদের, সদা ভাবল, কোন দুঃখ আমাদের নেই, আমরা তৃপ্ত।

পূর্ব-ঘোষিত এক ঘন্টা হতে আর মাত্র ক'টা মিনিট বাকী। সদা ঠিক করল আর ওপর দিকে তাকাবে না, থামবেও না, শুধু পায়ের দিকে নজর রেখে এগিয়ে যাবে। ঠিক যেখানে এক ঘন্টা হয়ে যাবে সেখানেই দাঁড়াবে সদা, চারদিক তাকিয়ে চিরউন্নত গিরিরাজকে প্রণাম জানাবে, সহযোদ্ধাদের নির্দেশ দেবে ফেরার।

মাত্র দু'মিনিট বাকী। কি হবে আর চলে, শরীরও প্রতি পদক্ষেপে

চাইছে বিশ্রাম, তবু সদা চলল।

এক মিনিট বাকী।

সদার দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এল। সারা শরীরে দ্রুত নেমে আসছে এক চূড়ান্ত অবসাদ। তবু সদা থামল না।

তিরিশ সেকেণ্ড!

না, থামব না। যা হবার হবে, যা সিদ্ধান্ত করেছি তাই হবে। তিরিশ সেকেণ্ডে দশ পা তো এগোতে পারব!

সদা গুণে চলল এক মন্ত্র, 'দশ—নয়—আট—চরৈবেতি—চরৈবেতি···

—'সদা—'

'সদা দাঁড়াল। কোন চঞ্চলতা নেই। শান্ত, স্থির চোখে তাকাল সামনের দিকে। সবাই গিরিশিরার বিভিন্ন অংশে দাঁড়িয়ে। সবার আগে নিমা আর অনিন্দ্য। দশ মিনিট আগে থাকার সুযোগে ওরা বেশ খানিকটা উঠে গেছে।

—'সদা, peak পেয়ে গেছি—'

Peak পেয়ে গেছে! মুহূর্তে সব অবসাদ গেল দূর হয়ে। চলো—চলো—

কয়েকটা মিনিট। সবাই একজায়গায় হলো। নিমা আর অনিন্দ্যর কাছে পৌঁছে ওরা দেখল—ঐ যে গিরিশিরা উঠে গেছে, ঐ ত্রিশূল-শীর্ষ এবং তার পরই গিরিশিরাটি বিপরীত দিকে নেমে গেছে, নেমে গেছে অনেকখানি আর তারপরই ঐ গিরিশিরাতেই দেখা যাচ্ছে ত্রিশূল—২, ২১৯৫০ ফুট। সকলেই বিনা দ্বিধায় বুঝল ঐ সামনে চির-আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য—ত্রিশূল-শীর্ষ।

অতএব—

সবাই সদার দিকে তাকাল, সদা সবার দিকে। কেউ কোন কথা বলল না। শুধু চোখ থেকে চোখে বিদ্যুতের গতিতে এক বার্তা ঝিলিক মেরে গেল। সবার শুকিয়ে-আসা মুখে হাসি ফুটল, আশায় আশায় ফুসফুস হল স্ফীত। সদা তার পতাকা জড়ানো তুষার-গাঁইতিটা তুলে

দিক নির্দেশ করলো—চলো—

তারপর কত পল অনুপল সেকেণ্ড মিনিট পার হয়ে গেল। ওরা থামল না। কতবার নরম বরফে হাঁটু থেকে কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল, ওরা দাঁড়াল না, ভীম গর্জনে হিমশীতল তীক্ষ্ণ হাওয়া ওদের রুখে দিতে চাইল, ওরা মানল না। ওরা চলল।

সমস্ত শক্তিকে, সমস্ত মানসিকতাকে করল একমুখী। চোখের দৃষ্টিকে বেঁধে রাখল পায়ের দিকে, এক পা এক পা করে উঠতে হবে যতক্ষণ পায়ের তলায় চড়াই আছে; মনে শুধু এক চিন্তা আর দেরী নয়, পৌঁছে গেছি চূড়ান্ত লক্ষ্যে।

তারপর একসময়—

একসময় ওরা দেখল আর ওঠার জায়গা নেই। যেদিকেই পা বাড়াই নেমে যেতে হচ্ছে।

তাহলে?

পৌঁছে গিয়েছি লক্ষ্য?

পৌঁছে গিয়েছি ত্রিশূল-শীর্ষে? ২৩৩৬০ ফুট উঁচুতে?

ক'টা বাজে?

সদা এক পলক তাকাল হাতের ঘড়ির দিকে। বেলা ঠিক দু'টো।

হ্যাঁ, ১৯৭৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর বেলা ২টোয় ত্রিশূল-শীর্ষে আরোহণ করল ৬ জন অভিযাত্রী—সদানন্দ দাস, জিতু মিত্র, অনিন্দ্য সেন, ডি. এম. কিণ্ডো, নিমা দোরজী ও শের সিং।

ঠিক সেই মুহূর্তে ওদের মনের ভাব কি হয়েছিল বলা মুশকিল তবে প্রথমেই বুক হাল্কা করে এক বিরাট নিশ্বাস বেরিয়ে এলো। তার পরই অনুভব করল দেহের সবটুকু শক্তি ওরা ব্যয় করেছে—ওরা বড় ক্লান্ত। কোন কথা যোগাল না ওদের মুখে, অসম্ভব শ্রান্তিতে কেউ বসে পড়ল, কেউ শুয়ে পড়ল ২৩৩৬০ ফুট উঁচু ত্রিশূল-শীর্ষে। দু চোখ ভেঙে আসতে চাইল ঘুমে। বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ-ক্ষমতা আর নেই, প্রতিরোধ করার ইচ্ছেও নেই। আসুক, ঘুম আসুক। কঠিন কর্তব্যের সফল সমাপনে

এক উচ্চতর দুনিয়ায় চোখে যদি ঘুম আসে তো আসুক। অনেক করেছি আমরা। এবার বিশ্রাম। নগাধিরাজের কোলে শান্তিতে আমাদের ঘুমোতে দাও।

কিন্তু সদার দায়িত্ব এখনও যে শেষ হয়নি। ও উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াল একে একে সবাই। তাকাল একবার চারপাশে। জাগতিক দুঃখ-কষ্টের ওপরে উঠে গেছে ওরা। কোন কিছুতেই আর ওরা বিচলিত নয়। প্রাপ্তিযোগে ওদের দেহমন ভরপুর, হৃদয় প্রশান্ত।

সদার আহ্বানে শীর্ষবিন্দুতে সবাই একজোট হয়ে দাঁড়াল। সদার হাতের পতাকা-জড়ানো তুষার-গাঁইতি প্রোথিত হল ত্রিশূল-শীর্ষে। দুরন্ত হাওয়ায় পত পত করে উড়ল পতাকা, হাজারো মানুষের ইচ্ছের প্রতীক পতাকা, ঘোষিত হল মানুষের জয়বার্তা।

সবাই পারিপার্শ্বিক ভুলে তাকিয়ে রইল পতাকার দিকে। কত-শত মুহূর্তের কথা মনে ভিড় করে এল। মনে হল কত নীল স্বপ্ন, কত সবুজ প্রাণময়তা, কত রক্তিম প্রতিজ্ঞা, কত ধূসর কঠিন অভিজ্ঞতা আর স্মৃতির উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ মিলে-মিশে জমাট হয়ে রয়েছে ঐ পতাকার রঙে। সেই পতাকা আজ বিজয়-গর্বে ত্রিশূল-শীর্ষে উড্ডীন। আনন্দাশ্রুতে ওদের চোখ ভরে এল।

কিন্তু কর্তব্যের কথা ভুললে তো চলবে না। সদা জোর করে নিজেকে কঠিন বাস্তবে নিয়ে এল। সোয়া দুটো বাজে। আর বেশী দেরী করা চলবে না।

ছবি তোলা শুরু হল। শীর্ষের ছবি তোলা হল, তোলা হল শীর্ষা-রোহণকারী সবার ছবি। কিন্তু তার চেয়েও যা দরকারী তা হল চার-পাশের ছবি তোলা।

কিন্তু ছবি তোলে কার সাধ্য ! ঐ অসম্ভব ঠাণ্ডায়, বিশেষ করে ঐ প্রচণ্ড হাওয়ার মধ্যে হাতের গ্লাভস খুলে ক্যামেরার সাটার টেপা এক অসম্ভব কাজ। তবু ওরা চারদিকে চাইল। ছবি নিতেই হবে।

ওরা দেখল, বেশীর ভাগ শিখরই মেঘে ঢাকা। শুধু দেবীস্থান

শিখরদ্বয় দেখা যাচ্ছে আর তার পেছনে গরীয়সী নন্দাদেবী। এ পাশের মৃগথুনীর বিশাল চেহারাকে মনে হচ্ছে যেন এক সমতল রাস্তা। অন্য-পাশে বেথারতলী ঢাকা পড়েছে অনামী শৃঙ্গের আড়ালে। পশ্চিম দিকে মানে কুঁমায়ুন অঞ্চলের সবটাই ঘন মেঘের পর্দায় ঢাকা। এছাড়া নন্দা-দেবী অভয়ারণ্যের গোটা অঞ্চলটাই মনে হচ্ছে মেঘের একটা হালকা পর্দার আড়ালে।

ওরা ত্রিশূল-শীর্ষকেও ভালভাবে পরখ করল। শীর্ষটি কিছুটা ডোমের মত দেখতে কিন্তু একদিকে যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে।

২টো বেজে ২৫ মিনিট।

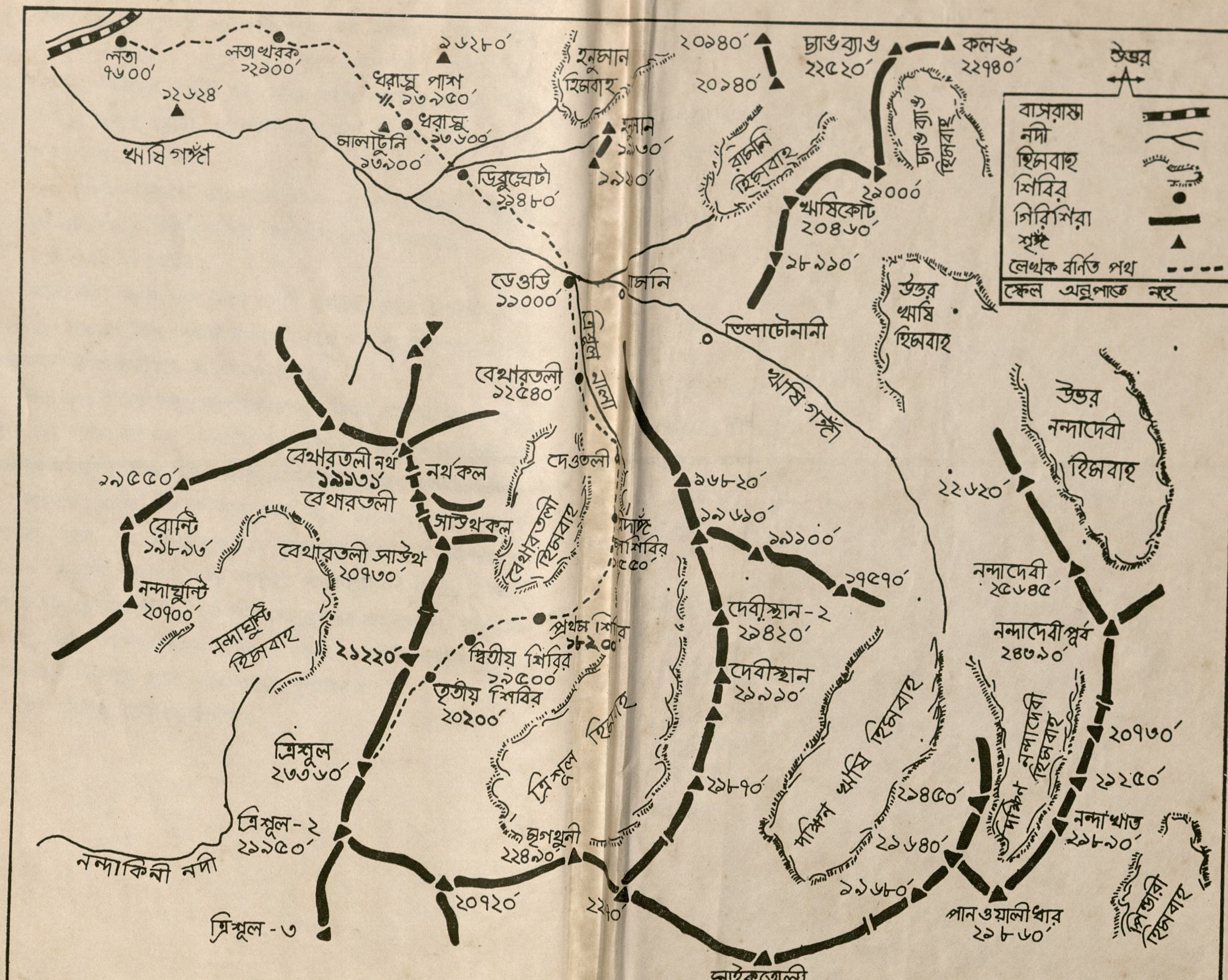
আর দেরী করা চলে না। এবার নামতে হবে। সাফল্য লাভ নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের সঙ্গে যে নিরাপত্তা ও নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের প্রশ্ন জড়িয়ে তা এখনও বহুদূর।

ওরা শেষ বারের মতো চারপাশে দেখল। এমন শ্বাসরোধকারী দৃশ্য আর তো পাওয়া যাবে না। নির্জীব ক্যামেরায় এর রূপ রস কতটুকুই বা ধরে রাখা যাবে! মনের মণিকোঠাই এমন অমূল্য স্মৃতির একমাত্র স্থান।

নামবার আগে ত্রিশূল-শীর্ষকে স্পর্শ করে প্রণাম জানাল ওরা। প্রার্থনা করল, 'হে নগাধিরাজ, হে ত্রিকালজ্ঞ ত্রিশূল, হে চিরশুভ্রতার প্রতীক হিমালয়, আবার যেন আসতে পারি তোমার কাছে, তোমার বিশালতার ছোঁয়ায় যেন দূর হয় আমাদের হৃদয়ের সব ক্ষুদ্রতা, তোমার নির্মল বায়ুর স্পর্শে দেহমন হোক পরিশুদ্ধ, তোমার কঠোর কঠিন অভিজ্ঞতার বিনিময়ে হোক জীবনের নব মূল্যায়ন।'

হে গিরিরাজ, তোমাকে প্রণাম।

–



লতা
লতা খরক
ধরাসু পাশ
ধরাসু
ঋষি গঙ্গা
ডিব্রুঘেটা
হনুমান হিমবাহ
রামনি হিমবাহ
চ্যাঙব্যাঙ
কলঙ্ক
চ্যাঙব্যাঙ হিমবাহ
ঋষিকোট
ডেওডি
রামনি
তিলাচৌনানী
উত্তর ঋষি হিমবাহ
উত্তর
বাসরাস্তা
নদী
হিমবাহ
শিবির
গিরিশিরা
শৃঙ্গ
লেখক বর্ণিত পথ
স্কেল অনুপাতে নহে
বেথারতলী
ত্রিশূল নালা
বেথারতলী নর্থ
নর্থকল
বেথারতলী
সাউথকল
বেথারতলী সাউথ
রোন্টি
নন্দাঘুন্টি
নন্দাঘুন্টি হিমবাহ
দেওতলী
বেথারতলী হিমবাহ
নন্দাকিনী নদী
প্রথম শিবির
দ্বিতীয় শিবির
তৃতীয় শিবির
ত্রিশূল
ত্রিশূল-২
ত্রিশূল-৩
ত্রিশূল হিমবাহ
মৃগথুনী
দেবীস্থান-২
দেবীস্থান
দক্ষিণ ঋষি হিমবাহ
উত্তর নন্দাদেবী হিমবাহ
নন্দাদেবী
নন্দাদেবী পূর্ব
নন্দাঘাত
পানওয়ালীধার
মাইকতোলী